অলঙ্কার-চন্দ্রিকা

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী

বঙ্গবাসী কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগের অধ্যক্ষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে

দ্বিতীয় সংস্করণের উপোদ্‌ঘাত

অলঙ্কার-চন্দ্রিকার পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত ছিল বছরচারেক আগে। বিলম্বে হ'লেও সে যে আবার নবরূপে সহৃদয়সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে পারল, এ তার পরম সৌভাগ্য।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবার শুধু পারিভাষিক অলঙ্কারেই সীমাবদ্ধ না থেকে দ্বিধারায় বিভক্ত হ'য়ে গেছে—'পূর্ব্বধারা' আর 'উত্তরধারা'। উত্তরধারাটি নূতন যোজনা। পূর্ব্বধারায় আলোচিত হয়েছে অলঙ্কার; এইটিই প্রথম প্রকাশিত অলঙ্কার-চন্দ্রিকার পরিবর্দ্ধিত এবং পরিসংস্কৃত রূপ। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি এই ধারার 'সংস্করণ' উপাধিটিকে সার্থক ক'রে তুলতে। অলঙ্কারের সংখ্যা বেড়েছে সামান্যই। আগেকার উদাহরণ প্রায় সবই আছে; তাদের পাশে বহু নূতনের হয়েছে আবির্ভাব, সেই নূতনদের বেশীর ভাগই সঙ্কলিত হয়েছে আমাদের আধুনিক গদ্য আর পদ্য দুরকমেরই সাহিত্য হ'তে। বস্তু প্রতিবস্তু বিম্ব প্রতিবিম্ব এবং এমনি আরও কয়েকটি জটিল পরিভাষাকে যথাযোগ্য উদাহরণের সাহায্যে বিশদ ক'রে তুলতে যথাশক্তি চেষ্টা করেছি। কোথাও কোথাও, যেমন 'অতিশয়োক্তি'-র ভূমিকায় সমধর্ম্মা অলঙ্কারশ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছি বিবর্ত্তনের আলোকে। প্রধান অলঙ্কার-গুলির কোনোটিই যে প্রাচীন কোনো আচার্য্যের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির ফল নয় এ বিশ্বাস আমার দৃঢ় ব'লেই বিবর্ত্তনের কথাটা না ভেবে পারি না।

'পূর্ণোপমা'কে আমি মানবসভ্যতার প্রথম দান ব'লে মনে করি। অরণ্যচারী মানুষের ঘনিষ্ঠ নিসর্গপরিচয় হ'তে উদ্ভূত এই পূর্ণোপমা—বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্যবোধ মানুষের সহজাত। এই সহজাত বোধের বশে আপনার অজ্ঞাতসারেই তুলনার পথে আপন বক্তব্যকে সে স্ফুটতর ক'রে তুলত। এই আদিম রিক্‌থের উত্তরাধিকার এসে পৌঁছেছে আমাদের কাছে। মানুষের ভাষায় ভাবপ্রকাশের ইতিহাসে যার প্রথম আবির্ভাব, সাহিত্যেও সে-ই এসেছে প্রথম অলঙ্কাররূপে—পূর্ণোপমা। মানবপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে আপন স্ফুটপ্রকাশ পূর্ণত্বের পাপড়ি একটি একটি ক'রে খসিয়ে প্রকাশকে ক'রে তুলতে চেয়েছে ইঙ্গিতময়। **'ভুজঙ্গসম কুটিল বেণী'**—পরিস্ফুট প্রকাশ। **'ভুজঙ্গসম বেণী'**—'কুটিল' খ'সে যাওয়ায় মনের হ'ল মুক্তি: কুটিল, কালো, চিকন, মাথার দিকে ফণার মতন, পিঠের দিকে ল্যাজের মতন ইত্যাদি। **বেণীভুজঙ্গ**—উপমা? না, অন্য কিছু? 'চন্দ্রালোক'-এ পীযূষবর্ষ জয়দেব

বললেন, **'আভাসরূপক'**; কি সুন্দর নাম! **'বেণীভুজঙ্গ দংশিল হিয়া মোর'**—'উপমা' নিজের নিগূঢ় শক্তিতে ক্রমবিবর্ত্তনের পথে **রূপক** হ'তে চাইছিল; হ'য়ে গেছে: গুটিপোকা প্রজাপতি হয়েছে।

'তোমার পৃষ্ঠলুণ্ঠিত ওই ভুজঙ্গ মোর বুকে
দংশিল কৌতুকে।'

উপমেয় বেণীকে গিলে ফেলেছে উপমান ভুজঙ্গ: অতিশয়োক্তি। এত বড়ো অপমান বেণী সইতে পারল না—**'তোমার পৃষ্ঠলুণ্ঠিত বেণী দংশিল মোর বুকে'** ব'লে ভুজঙ্গকে করল অপসারিত; কিন্তু তবু স্বাধীন হ'তে পারল না, 'দংশিল'-র মধ্যে ভুজঙ্গই র'য়ে গেল (সমাসোক্তি), আরশুলা আর আরশুলাত্ব ফিরে পেলে না, কাচপোকার স্বভাবটাই র'য়ে গেল তার। পূর্ণোপমার অতিশয়োক্তিতে যাত্রা—ভেদ থেকে অভেদে যাত্রা। কিন্তু পথ চলতে হয় থেমে থেমে, মর্কট ঋজুগতিতে মানুষ হয় না। **'বেণীবিভঙ্গ? না, কালভুজঙ্গ?'** —উপমেয় উপমান সংশয়ে দুইই দোদুল্যমান ('সন্দেহ')।

'কালভুজঙ্গ নয়, বেণীবিভঙ্গ'—সন্দিগ্ধ মনের স্থিতি উপমেয়ে ('নিশ্চয়')। **'বেণীবিভঙ্গ, যেন কালভুজঙ্গ'**—উৎকট সংশয়ী মনের প্রায়-স্থিতি উপমানে ('উৎপ্রেক্ষা')। **'বেণীবিভঙ্গ নয়, কালভুজঙ্গ'**—সংশয়ান্তে মনের স্থিতি উপমানে ('অপহ্নুতি')। **'পলায় সে ত্রাসে বেণীবিভঙ্গে কালভুজঙ্গ ভাবি'**—উপমেয়কে উপমান ব'লে সাংঘাতিক ভুল ('ভ্রান্তিমান্')। তার পর 'রূপক'। তারপর…। সমধর্ম্মা অলঙ্কার এমনি ক'রে রূপ থেকে রূপান্তরে যায়।

অলঙ্কারের প্রসঙ্গে 'বিবর্ত্তন' কথাটা কি অর্থে প্রয়োগ করেছি, তারই একটু পরিচয় এখানে দিলাম। পাশ্চাত্যদেশে সাদৃশ্যাত্মক Figure বলতে শুধু Simile আর Metaphor। Metaphor-দুধে জল মেশালেই Simile আর Simile জ্বাল দিয়ে জলটুকু বাষ্প ক'রে দিলেই Metaphor! Simile-কে 'concise' ক'রে Metaphor-এর কাছাকাছি কেউ যদি নিয়ে যেতে চায়, "He must aim at adding nothing but the word '*like*'" (Demetrius)।

(i) "She passed the salley gardens with the little snow-white feet." (Yeats)

(ii) "Little children lovelier than a dream." (R. Brooke)

(iii) "Rose-bosomed and rose-limbed shakes Venus." (J. Freeman)

(iv) "The rose is sweetest washed with morning dew,
And love is loveliest when embalmed in tears." (Scott)

পাশ্চাত্যবিচারে এদের কোনোটিতেই সাদৃশ্যাত্মক figure নাই; আমাদের মতে যথাক্রমে বাচকলোপের লুপ্তোপমা, ব্যতিরেক, বাচক- আর ধর্ম্ম-লোপের লুপ্তোপমা, প্রতিবস্তূপমা আর দৃষ্টান্তের অপূর্ব্ব সঙ্কর অলঙ্কার।

(v) "Eternal smiles his emptiness betray
As shallow streams run dimpling all the way." (Pope)

ওঁদের মতে স্থূল Comparison, আমাদের মতে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা। প্রকাশের স্ফুটতা আর ইঙ্গিতময়তার মাঝখানকার পথটির আলোছায়ার মধুর লীলবৈচিত্র্য আমরা মুগ্ধচক্ষে দেখেছি, আবিষ্কার করেছি মাধুর্য্যের উৎস। আমাদের অনেক আধুনিক শিক্ষিতের কি উৎকট মোহ Simile Metaphor Metonymy Synecdoche-কে নিয়ে!

'বিবর্ত্তন' আমাদের অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে মূল বক্তব্য থেকে। বলেছি, উত্তরধারাটি নূতন যোজনা। পূর্ব্বধারার সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক না হ'লেও এর স্বাতন্ত্র্যও প্রচুর। আচার্য্য এ্যারিষ্টটল শব্দের অর্থবক্রীকরণের যে চারটি উপায় সূত্রিত করেছেন, তাদেরই ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেছে অনেকগুলি পাশ্চাত্য figure; আমাদের অন্যতম শব্দবৃত্তি 'লক্ষণা'র সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে এবং আমাদের বহু শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার গঠিত হয়েছে এই লক্ষণার ভিত্তিতে। এই কারণে প্রাসঙ্গিকভাবেই উত্তরার্দ্ধে আলোচিত হয়েছে শব্দবৃত্তি —অভিধা, লক্ষণা আর ব্যঞ্জনা। সহজেই এসেছে 'ধ্বনি'-র প্রসঙ্গ, যার তাত্ত্বিক তথা রৌপিক দুদিকই আলোচিত হয়েছে সম্ভবমতো বিশদভাবে যথাযোগ্য উদাহরণসহকারে। লক্ষণামূলক 'অর্থান্তরসংক্রমিত ধ্বনি' হ'তে অভিধামূলক 'রসধ্বনি' পর্য্যন্ত ধ্বনির প্রধান প্রকারভেদগুলির সবই হয়েছে আলোচিত এবং উদাহরণগুলির প্রত্যেকটিরই করা হয়েছে ধ্বনিমুখী ব্যাখ্যা। উত্তরধারার অন্ত্য অধ্যায় 'অলঙ্কারের ইতিকথা'—ঋগ্‌বেদ থেকে যাত্রা আরম্ভ ক'রে এই ইতিকথা সমাপ্ত হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর 'রসগঙ্গাধরে'। বহুবিস্তৃত পটভূমিকায় স্বল্পরেখায় অঙ্কিত চিত্রখানি; তবু সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি চিত্রটিকে যথাসম্ভব স্পষ্ট ক'রে তুলতে। এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার কোথাও কোথাও চলেছেন স্বনির্ম্মিত পথে, প্রচলিত ইতিহাসের নির্দ্দেশ স্বীকার ক'রে নেওয়ার পথে বাধা থাকায় মূল গ্রন্থের অন্তর্নিহিত প্রমাণের নির্দ্দেশিত পথে।

বর্ত্তমান সংস্করণের কোনো কোনো উদাহরণের শেষে গ্রন্থকারের পূর্ণ নাম দেখা যাবে। গ্রন্থকারের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ বা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা হ'তে উদ্ধৃত অংশগুলির নীচে দেওয়া হয়েছে—শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী,

শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী অথবা শুধু শ্যামাপদ। 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'র জন্ম রচিত বা অন্য ভাষা হ'তে অনূদিত উদাহরণের নীচে পূর্ব্ববৎ শ. চ.-ই আছে।

পুরাতনী অলঙ্কার-চন্দ্রিকা সহৃদয় পাঠকপাঠিকার, বিশেষ ক'রে আমার চিরপ্রিয় ছাত্রছাত্রীর এবং আমার সমধর্ম্মা অধ্যাপকবন্ধুগণের স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিল; নবীনার প্রার্থনা সেই স্নেহে সে যেন বঞ্চিত না হয়।

প্রথম প্রকাশের কিছুদিন পরে তদানীন্তন রামতনু অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অলঙ্কার-চন্দ্রিকাকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছে এই সংবাদ দিয়ে আমাকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাঁর স্বতঃপ্রণোদিত এই পত্রখানি আমাকে মুগ্ধ করেছিল, বই পাঠ্য হয়েছে ব'লে নয়, অন্য কারণে। ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক গ্রন্থকারকে লিখিত পত্রে তাঁর শ্রদ্ধায় মেদুর অথচ আত্মীয়তায় মধুর যে চিত্তখানির পরিচয় পেয়েছিলাম, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করব না।

যাঁদের উৎসাহে, আগ্রহে, ঐকান্তিক যত্নে, অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং প্রীতি-স্নিগ্ধ সহযোগিতায় অলঙ্কার-চন্দ্রিকা নবতর রূপে পুনরাবির্ভাবের সৌভাগ্য লাভ করল, তাঁরা ইণ্ডিয়ান্ এ্যাসোসিয়েটেডের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও 'চন্দ্রিকা'র প্রকাশক আমার পরমস্নেহভাজন শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুহৃদ্‌বর শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং সন্তানপ্রতিম প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ পুষ্পেন্দু দাশগুপ্ত। ভগবানের কাছে তাঁদের স্বাস্থ্যসুন্দর ঋদ্ধিসমুজ্জ্বল দীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করি।

অলঙ্কার-চন্দ্রিকায় কোথাও কোথাও প্রাচীন এবং আধুনিক কারুর কারুর উক্তি সমালোচিত হয়েছে। এর মানে এমন নয় যে তাঁদের উপর দোষারোপ করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। মনে পড়ছে পীযূষবর্ষ জয়দেবের কথা—

"নাশঙ্কনীয়মেতেষাং মতম্ এতেন দূষ্যতে।
কিং তু চক্ষুর্মৃগাক্ষীণাং কজ্জলেনৈব ভূষ্যতে॥"

—'শঙ্কা ক'রো না, তাঁদের মতের এ সমালোচন নহেকো দূষণ;
চকিতহরিণীনয়নারই শুধু কজ্জল রচে আঁখির ভূষণ॥' (শ. চ.)

শম্

বঙ্গবাসী কলেজ।
ঝুলন পূর্ণিমা; ৫ই ভাদ্র, ১৩৬৩ — শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

প্রথম প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি

অলঙ্কার বাইরের থেকে এসে সাহিত্যের রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে না; মানুষের স্বভাবেই তার জন্ম। অলঙ্কারের নাম পর্য্যন্ত যে কখনো শোনে নাই এমন নিরক্ষর মানুষও নিত্যকার প্রয়োজনসাধনের ভাষায় অলঙ্কারের বহুল প্রয়োগ ক'রে থাকে। চাঁদপারা ছেলে, আমার সাতরাজার ধন সাগরছেঁচা মাণিক, মুখটি শুকিয়ে যেন আমচুর হ'য়ে গেছে, বিদ্বের সাগর—এমন শত শত উপমা অতিশয়োক্তি উৎপ্রেক্ষা রূপক চল্‌তি কথাবার্ত্তায় অহরহঃ শোনা যায়। এরাই সহজস্বচ্ছন্দ গতিতে সাহিত্যে আসে। মানুষের শিক্ষা, রুচি, প্রকাশশক্তির বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এরাও বিবর্ত্তিত হ'তে থাকে বিচিত্রভাবে। প্রাচীনেরা এদেরই বিচার ক'রে গেছেন। ভারতের আলঙ্কারিক আচার্য্যগণের সার্দ্ধ সহস্রবর্ষের সাধনার ফল আজ উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা লাভ করেছি। এদের নাম-লক্ষণ-জাতি তাঁরা যেভাবে নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, সেইভাবেই আমরা তা গ্রহণ করেছি। ভাষার বিচিত্রতার সীমানির্দ্দেশ প্রাচীনযুগেই হ'য়ে গেছে, এমন কথা বলা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয়। নূতন অলঙ্কার আবিষ্কৃত হওয়ার অবকাশ এখনও আছে, পরেও থাকবে। কিন্তু বেশীর ভাগই যে হ'য়ে গেছে একথা মনে করার কারণও যথেষ্ট। বিশেষতঃ এদেশে এ বস্তুটির এমন সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম বিচার হ'য়ে গেছে যে জগতের সাহিত্যবিচারের ইতিহাসে তার তুলনা নাই।

যাকে আজও আমরা আদিতম বাঙলাসাহিত্যের নিদর্শন ব'লে মনে করছি, হাজার বছর আগেকার সেই চর্য্যাপদের যুগ থেকেই অলঙ্কার আমাদের সাহিত্যে ব্যবহৃত হ'য়ে আসছে। তবু বাঙলায় অলঙ্কারের বই খুবই কম। লালমোহন বিদ্যানিধির কাব্যনির্ণয়ে অলঙ্কার (ছন্দের মতন) মাত্র একটি অংশ অধিকার ক'রে আছে। সিতিকণ্ঠ বাচস্পতির অলঙ্কারদর্পণকে 'সাহিত্যদর্পণে'র দশম পরিচ্ছেদের সোদাহরণ অনুবাদ বলা যেতে পারে। ইনি বিংশ শতকের লেখক হ'য়েও বাঙলাসাহিত্যের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডারের দ্বার খোলেন নাই বললেই হয়। তবু অলঙ্কারজিজ্ঞাসুর কাছে অলঙ্কারদর্পণ মূল্যবান্‌। লালমোহন এবং সিতিকণ্ঠ দুজনেরই ভাষা ঐকান্তিকভাবে সংস্কৃতানুগ। কেউ কেউ তথাকথিত বাঙলা ব্যাকরণে অলঙ্কারের একটি অধ্যায় যোজনা করেছেন। সুবলচন্দ্রের অভিধানে 'অলঙ্কার'-এর ব্যাখ্যায় কতকগুলি অলঙ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে (এই সূত্রে বিশ্বকোষের নামও উল্লেখযোগ্য)। যদুগোপালের পদ্যপাঠ তৃতীয়

ভাগের এবং দীননাথসম্পাদিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের গোড়ায় কয়েকটি অলঙ্কারের অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। শেষেরটির সমস্ত উদাহরণ 'মেঘনাদবধ' হ'তে উদ্ধৃত। আরও কোথাও কোথাও অলঙ্কার বিক্ষিপ্তভাবে সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত সকল যুগের সাহিত্য হ'তেই প্রচুর উদাহরণ আহরণ করেছি এবং বহু উদাহরণের বিশ্লেষণপন্থায় আলঙ্কারিক ব্যাখ্যা দিয়েছি। মৈথিলী, ব্রজবুলি প্রভৃতি ভাষায় লিখিত উদাহরণের কতকগুলির বাঙলা পত্নে অনুবাদ ক'রে দিয়েছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদাহরণের জন্য সংস্কৃতের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেগুলিকে বাঙলা পদ্যে অনুবাদ (কোথাও মুক্তানুবাদ, কোথাও বা মর্ম্মানুবাদ, কোথাও বা আবার ছায়ানুবাদ) ক'রে, তবে গ্রহণ করেছি। নিজের রচনাও কতকগুলি আছে। অনুবাদ যাতে সহজে চেনা যায়, তার জন্য এদের শেষে আমার নামের সঙ্কেত শ. চ. লেখা আছে। পাশ্চাত্য Figures of Speech-এর সঙ্গে আমাদের অলঙ্কারের যেখানে আংশিক বা পূর্ণ সাদৃশ্য বুঝেছি, সেখানে তাদের তুলনামূলক বিচার করেছি। যে সকল পাশ্চাত্য Figure of Speech আমাদের অলঙ্কারের পর্য্যায়ে ঠিক পড়ে না, অথচ আমাদের আধুনিক সাহিত্যে যাদের উদাহরণ পাওয়া যায়, একটি পৃথক্ অধ্যায়ে তাদের আলোচনা করেছি। উদাহরণ তুলেছি আমাদের সাহিত্য থেকে এবং প্রত্যেক Figure of Speech-এর যথাসম্ভব সুসঙ্গত ক'রে বাঙলায় নামকরণ করেছি। অলঙ্কারে অলঙ্কারে (যেমন উপমা-রূপক, রূপক-উৎপ্রেক্ষা-অতিশয়োক্তি, অপহ্নুতি-নিশ্চয়, প্রতিবস্তূপমা-দৃষ্টান্ত-নিদর্শনা প্রভৃতি) যেখানে তুলনায় আলোচনা করলে সহজে বোঝা যায়, সেখানে তুলনার পথেই চলেছি।

যাঁদের উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ লিখিত, তাঁরা এর দ্বারা আংশিকভাবে উপকৃত হ'লেও পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

বঙ্গবাসী কলেজ
মাঘ, ১৩৫৩

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

পূর্ব্বধারা

পূর্ব্বধারা

অলঙ্কার-চন্দ্রিকা

পূর্ব্বধারা

অলঙ্কার ও সাহিত্য

'উপমা কালিদাসস্য' কথাটা এদেশের কাব্যরসিকদের মুখে মুখে চ'লে আসছে শত শত বৎসর ধ'রে। এর তাৎপর্য্য এই যে সার্থক উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগে মহাকবি কালিদাস শুধু সিদ্ধহস্তই নন, অদ্বিতীয়। এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি যে উপমার অর্থ এখানে শুধু পূর্ণ বা লুপ্ত উপমা অলঙ্কার নয়, উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক ভ্রান্তিমান্ ইত্যাদি সাদৃশ্যাত্মক সকল অলঙ্কার। 'উপমা কালিদাসস্য'-তে এই নানাভাবের উপমার কথাই বলা হয়েছে।

কালিদাসের প্রতিভার এই বিশেষ দীপ্তিটি দেড় হাজার বৎসর সমুজ্জ্বল থেকে আজ কিন্তু ম্লান হ'য়ে গেছে আমাদের রবির আলোকে। আজ আমরা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারি 'উপমা শ্রীরবীন্দ্রস্য'। কয়েক বৎসর আগে 'বিশ্বভারতী' একখানি ইংরিজিতে রচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার নাম 'Similes of Kalidas'; লেখক K. Chellappan Pillai। বইখানিতে দেখলাম মহাকবি কালিদাসের কাব্যে নাটকে উপমার সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় সাড়ে বারো শ'। খণ্ডকাব্য 'মেঘদূত', স্বল্প তার পরিসর; তবু ওতেই রয়েছে পঞ্চাশটি উপমা। সমগ্র 'মেঘদূত' কাব্যে চরণ-সংখ্যা চার শ' আটষট্টি। কৌতূহল হ'ল। খুললাম রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'। দেখলাম চরণ-সংখ্যা তিন শ' আটত্রিশ, উপমা চুরাশীটি। চ'লে গেলাম 'বলাকা'-য়, 'সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি…"—চরণ-সংখ্যা পঁয়ষট্টি, উপমা চব্বিশটি। দুই মহাকবিরই উপমা প্রথম শ্রেণীর, কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপেই তাদের উদ্ভব। তবু কালিদাসের তুলনা কালিদাস, রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ।

'উপমা শ্রীরবীন্দ্রস্য' এ তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন—রবীন্দ্র-কাব্যে এই যে অসংখ্যেয় উপমাপ্রয়োগ, প্রচণ্ড বস্তুমুখ এই প্রখর বিংশ শতাব্দীতে

এ ব্যাপারটা কি অস্বাভাবিক নয়? জগতের এক বিরাট্ কবিদল কাব্য-সরস্বতীকে বন্দিনী ক'রে রাখতে চাইছেন মানুষের অন্নময় আর প্রাণময় কোশের আবেষ্টনীর মধ্যে। দেখতে ইচ্ছা হ'ল তাঁরা কি করছেন। সুকান্তর 'হে মহাজীবন' মাত্র আটটি চরণে রচিত একটি পদ্মিকা। কিন্তু এই অতিসঙ্কীর্ণ পরিসরটুকুর মধ্যে রয়েছে সমাসোক্তি অতিশয়োক্তি আর রূপক এবং অপূর্ব্ব মায়া বিস্তার করেছে শেষের চরণটির উৎপ্রেক্ষা—কবির 'আর এ কাব্য নয়', 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি' বলা সত্ত্বেও রচনাটিকে উৎকৃষ্ট কাব্যের মহিমা দান করেছে 'পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্সানো রুটি'। সুকান্তর উৎকৃষ্ট সৃষ্টির অন্যতম 'রানার' তার একান্নটি চরণ অলঙ্কৃত করেছে আঠারোটি উপমায়। মনে হ'ল, হাজার হোক, সুকান্ত ভাবপ্রবণ বাঙালীর ছেলে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার, যেখানে "In the early days it was thought that poetry could be produced cooperatively like any manufactured commodity" (Deutsch and Yarmolinsky—*Russian Poetry*), সেই সোভিয়েট রাশিয়ার Proletarian লেখকসমিতি ('Kuznitza')-র চার্টার্ড সদস্য, কম্যুনিষ্ট্, যুব-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিখ্যাত কবি Vasily Kazin-এর 'Brick-layer' কবিতাটি প'ড়ে দেখলাম ভাবপ্রবণতা ছাড়া কাব্যই হয় না। কবিতাটি উদ্ধৃত ক'রে দেওয়ার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলাম না—

"I wander homeward at evening,
Fatigue is a comrade who sticks ;
And my apron sings for the darkness
A strong red song of bricks.

It sings of my ruddy burden
That I carried so high, high
Up to the very housetop,
The roof that they call the sky.

My eyes were a carousel turning,
The wind had a foggy tone,
And morning, too, like a worker,
Carried up a red brick of its own."

দেখছি যে সত্যকার প্রতিভা যদি থাকে, তাহ'লে যে-কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে কবি কাব্যের আনন্দলোক নির্ম্মাণ করতে পারেন। রূপক সমাসোক্তি

অতিশয়োক্তি—এদের নিয়ে 'স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্যভূমি' বিহার করেছেন কবি; স্থূল বাস্তব বাড়ীর ছাদ সহজেই চ'লে গেছে আকাশে আর লাল ইটের মধ্যে লীন হ'য়ে গেছে চন্দ্র আর সূর্য্য; morning, ঐ brick-layer-এরই মতন এক মজুর, আকাশের ছাদে তুলে ধরেছে টুকটুকে লাল একখানা ইট—জবাকুসুমসঙ্কাশং দিবাকরম্। বস্তু তার আপন সত্তা হারায় নাই, কিন্তু পরমসুন্দর হ'য়ে উঠেছে জ্যোতির্ম্ময় দিব্যমূর্ত্তিতে। প্রশংসনীয় কবির ব্যঞ্জনাসৃষ্টি।

তাহ'লে অলঙ্কার কি কাব্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ? এ প্রশ্নের একটা উত্তর এই যে কাব্যজগতে হাজারকরা পাঁচটাও নিরলঙ্কার কবিতা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এ উত্তরের ভিত্তি পাঠকসমাজের অভিজ্ঞতা। কবির দিক্ থেকে এর অন্য উত্তর আছে এবং সেইটেই মূল্যবান্।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কথাই শোনা যাক। রাজপুত্র দুর্গম পথ পার হ'য়ে গেছেন রাজকন্যার কাছে। তাঁর দৃষ্টিতে এ রাজকন্যার স্থান "হৃদয়ের সেই নিত্য বসন্তলোকে যেখানে কাব্যের কল্পলতায় ফুল ধরে"। রাজকন্যা তাঁর প্রিয়া; রাজপুত্র তাকে না সাজিয়ে পারেন না। কাজেই "ঘুম থেকে উঠেই সোনা যদি নাও জোটে, অন্তত চাঁপাকুঁড়ির সন্ধানে তাঁকে বেরোতেই হবে"। পরেই কবি বলছেন, "এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়।...অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। মা শিশুর মধ্যে পান রসবোধের চরমতা—তাঁর সেই একান্ত বোধটিকে সাজে সজ্জাতেই শিশুর দেহে অনুপ্রকাশিত ক'রে দেন।...অলম্ অর্থাৎ বাস্, আর কাজ নেই। এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য"। কবি অন্যত্র বলছেন, "কাব্যের আর-একটা দিক আছে, সে তার শিল্পকলা।...'খুশি হয়েছি'...এই কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর ক'রে, মা যেমন ক'রে ছেলেকে সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, বাসরঘর যেমন সজ্জিত হয় ফুলের মালায়।...যা অত্যন্ত অনুভব করি সেটা যে অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজে"। অন্য এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের অলঙ্কারকে বলেছেন 'ছবি'—"কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়।...উপমা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়।...চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ"। অলঙ্কার-সম্বন্ধে পশ্চিমেরও আধুনিক চিন্তাধারা চলেছে

এই পথে। কড্‌ওয়েল (H. Caudwell) বলছেন, "All men under the stimulus of the feelings become poets in some very small degree... in a state of excitement they will have recourse to metaphors, similes, personifications and exaggeration....And as the effect of these emotions on the ordinary man is to make him see pictures and speak in images, so it is, with greater intensity, on the artist...these have always been poetic forms of speech"।

যে 'সঙ্গীত'কে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের 'প্রাণ' বলেছেন, শুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে তার ভেদরেখা টেনেছেন এই ব'লে যে 'বিশুদ্ধ সঙ্গীতের স্বরাজ তার আপন ক্ষেত্রেই, ভাষার সঙ্গে শরিকিয়ানা করবার তার জরুরি নেই'। সত্যই তাই। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের রসাভিব্যক্তিতে তানলয়ই মুখ্য, ভাষা অতীব গৌণ—রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় তানলয়ই সেখানে গণেশঠাকুর, কথা তার বাহন ইঁদুর-মাত্র। কাব্যে ভাষাটাই রসসৃষ্টির মুখ্য উপাদান; শুধু মুখ্য বললে ঠিক বলা হবে না, ভাষাই রসাভিব্যক্তির একমাত্র উপাদান। "ছন্দে, শব্দবিন্যাসের ও ধ্বনিঝঙ্কারের তির্য্যক্ ভঙ্গিতে, যে সঙ্গীতরস প্রকাশ পায় অর্থের কাছে অগত্যা তার জবাবদিহি আছে"—উক্তিটির তাৎপর্য্য বিশেষভাবে প্রণিধেয়। ছন্দ শুধু metre নয়, rhythm। মাত্রাক্ষরের পরিমিতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ও বিচিত্রতরঙ্গভঙ্গময় ধ্বনিপ্রবাহের হিন্দোলবিলাস রীদম্, মাত্রাক্ষরবন্ধনহীন গদ্যকেও যা কাব্যধর্ম্মা ক'রে তোলে আপন মহিমায়। এ সকলই কাব্যের শিল্পকলা। কিন্তু সব-কিছুরই একটা সীমা আছে। 'ছন্দের নেশা, ধ্বনিপ্রসাধনের নেশা' কোনো 'কবির মধ্যে মৌতাতি উগ্রতা পেয়ে' বসলে অবশ্যই তা নিন্দনীয়। তবু, মহাকবিদেরও রচনায় অনেক সময় 'শিল্পিত'কে অর্থাৎ ভাববস্তুকে অতিক্রম ক'রে শিল্পকলাটাই বড়ো হ'য়ে ওঠে। "কেননা, তার মধ্যেও আছে সৃষ্টির প্রেরণা"। শিল্পিতকে 'ডিঙিয়ে' যাওয়ার মানে অস্বীকার করা নয়; শিল্পকলার 'আপন স্বাতন্ত্র্যকে মুখ্য ক'রে' তোলার মানে শিল্পিতনিরপেক্ষ স্বৈরাচার নয়, শিল্পিতের সঙ্গে সূক্ষ্ম সম্পর্ক রেখে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হ'য়ে ওঠা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে 'লীলায়িত অলঙ্কৃত ভাষা' 'অর্থকে ছাড়িয়ে' প্রকাশ করছে 'সঙ্গীতরস'। কিন্তু তা তো নয়। এ রস কাব্যে স্বাধীন নয়, পরাধীন—কাব্যার্থের কাছে একে জবাবদিহি করতে হয়। উদাহরণস্বরূপে ধরা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিকে। একখানি ছোট কবিতায় সঙ্গীতরসকে এমন উজাড় ক'রে কবি বোধ করি আর কোথাও দেন নাই। ছন্দে, পদচয়নে, অজস্র অনুপম অনুপ্রাসের

সমাবেশে 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী' 'বর্ষামঙ্গল'। মানে না বুঝেও পড়া যায় বার বার, রবীন্দ্রনাথ যেমন পড়েছিলেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'—"I cannot tell how often I read that Gita Govinda...the sound of the words and the lilt of the metre filled my mind with pictures of wonderful beauty, which impelled me to copy out the whole of the book for my own use" (*Reminiscences*—Tagore)। বর্ষামঙ্গল আর গীতগোবিন্দের মধ্যে গঠনগত একটা সাদৃশ্য আছে। গীতগোবিন্দের গঠনবৈশিষ্ট্যের কথা তাই একটু না বললে চলে না। তাছাড়া, সংস্কৃতকাব্য হ'লেও অসামান্য বাক্‌শিল্পী জয়দেবের কাছে বাঙলাকাব্য ঋণী, আগেও ছিল, এখনও গুরুতরভাবে রয়েছে, ভাবী কালেও থাকবে। আধুনিক শিক্ষিতরা জয়দেব-সম্বন্ধে খুবই অবিচার করেন; অথবা অবিচার কথাটা না বলাই হয়তো ভালো, প'ড়ে মন্তব্য করেন যদি একজন, বই চোখে না দেখে ওই মন্তব্য শুনেই মন্তব্য করেন একশ' জন। আমাদের সাহিত্যসমালোচনা এই পথেই চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। কিন্তু যাক এ কথা। গীতগোবিন্দ নাটকীয়তাময় প্রায়গীতসর্ব্বস্ব কাব্য। রাধাহীন বাসন্তরাসে এর আরম্ভ এবং ঔৎসুক্য-উৎকণ্ঠা, অভিসারেচ্ছা-সত্বেও অক্ষমতার ফলে আপন কুঞ্জে শ্রীরাধার বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা দশার ভিতর দিয়ে পুনরায় শ্রীরাধার তিমিরাভিসার ও শ্রীকৃষ্ণ-সহ মিলনে এর পরিসমাপ্তি। **গতি** এ কাব্যের মূল সুর, এ গতি দেহের তথা মনের। এই গতিকেই মূর্ত্তি দিয়েছেন জয়দেব প্রয়োজনমত সমবিষমমাত্রায় রচিত বিচিত্রভঙ্গীময় গানে গানে। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে অনুপ্রাস সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বস্তুতঃ তা নয়। অনুপ্রাসিত অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছের ধ্বনির তরলতা-চটুলতা, যুক্তব্যঞ্জনগুচ্ছের ধ্বনির সান্দ্রতা-গম্ভীরতা লীলামুখর ছন্দঃপ্রবাহে লীন হ'য়ে চলেছে পদে পদে ওই ভাবগতির চরণে নমস্কৃতি জানাতে জানাতে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল বর্ষাপ্রশস্তি। বিরহবেদনার ঋতু বর্ষা; কিন্তু আমাদের কবির এ বর্ষা বাল্মীকির নয়, কালিদাসের—বর্ষাগমে সীতাহারা রামের ব্যর্থ হাহাকারে পর্য্যবসিত বিরহব্যথা নয়, মিলনপরিণামে মধুময়ী আবেগচঞ্চলা যৌবনবেদনা। ভারতের উজ্জয়িনীযুগের বিলাসিনী তরুণীদের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, যে-যুগের পথিকবনিতারাও বর্ষার প্রথম মেঘকে জানাত 'স্বাগতম্'। তখনকার দিনে কর্ম্মোপলক্ষে প্রবাসী তরুণদের ছুটি হ'ত বর্ষায়; এখনকার মতন গরমের ছুটি ছিল না। বর্ষামঙ্গলেরও মূল সুর গতি। গীতগোবিন্দের নাট্য-

ধর্ম্মিতা এখানে নাই। তরুণীরা ক্রিয়াশীলা নয়, ক্রিয়াশীল কবিমানস। বিচিত্র ভাবের নানা নায়িকাকে আশ্রয় ক'রে বহুমুখী লীলায় বিচিত্রসুন্দর হ'য়ে উঠেছে কবিমানসেরই গতি। এই গতিরই গীতায়ন বর্ষামঙ্গল। বর্ণধ্বনির অনুপ্রাসনে অর্থাৎ রণনে অনুরণনে, সুরে ঝঙ্কারে এই মধুচ্ছন্দা গতির ব্যঞ্জনা। অনুপ্রাস পদে পদে উৎক্ষিপ্ত করতে করতে চলেছে ভাবের স্ফুলিঙ্গ, যাদের সমবায়ে নির্ম্মিত হয়েছে জ্যোতির্ম্ময় আনন্দলোক।

দেখা যাচ্ছে যে অনুপ্রাসকে রসমুখীন করতে পারলে তার প্রাচুর্য্যও হ'য়ে ওঠে ঐশ্বর্য্য। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাসের স্থান সকলের শীর্ষে। সকল দেশেরই কাব্যে অনুপ্রাসের প্রচুর প্রয়োগ আছে। উচ্চাঙ্গের কাব্যেও সর্ব্বত্র তার রসানুগত্য থাকে না। না থাক; সীমার মধ্যে রাখলে তাতে যে ধ্বনিবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, তারও মূল্য কম নয়। সীমা ছাড়ালেই, অনুপ্রাস অট্টহাস।

শব্দালঙ্কার

আমাদের কাব্যশাস্ত্রকারগণ কাব্যের দুটি প্রকারভেদ নির্দ্দেশ করেছেন দুটি বিশেষণের সাহায্যে—দৃশ্য আর শ্রব্য। দৃশ্য কাব্য নাটক; শ্রব্য কাব্য রামায়ণ মেঘদূত মেঘনাদবধ সোনার তরী। শ্রব্যত্বই যে কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যরসিকগণও তা স্বীকার করেন। খ্যাতিমান্ কবিসমালোচক Alfred Noyes বলছেন, "…it (The Poetry Society of London) has been rendering a great service to the cause of poetry for many years now. It has helped people to realize that *poetry was meant to be heard*" (*The Poetry Review*, March-April, 1933)।

কাব্য রসাত্মক বাক্য। বাক্য পূর্ণ ভাবের প্রকাশক পদসমুচ্চয়। বাক্যকে যদি পরিবার বলি, পদকে বলতে হয় তার পরিজন। বহু বাক্য নিয়েও যেমন কবিতা হয়, একটিমাত্র বাক্যেও তেমনি নিটোল একখানি রসোত্তীর্ণ কবিতার সৃষ্টি হ'তে পারে। শেষোক্ত লক্ষণের অজস্র কবিতা রয়েছে সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে; বাঙলাতেও রয়েছে এর অনেকগুলি নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'লেখন' আর 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে।

বাক্যপরিবারের পরিজন যে পদ, তার দুটি রূপ—একটি বর্ণময় দেহরূপ, অন্যটি অর্থময় চিদ্-রূপ। প্রথমটির আবেদন আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে, দ্বিতীয়টির বোধের কাছে—একটি concrete, অপরটি abstract।

দেহরূপটিকে কান দিয়ে দেখাই সার্থক দেখা—ধ্বনির (sound) মধ্যে যে রূপের আলো থাকে তার দ্রষ্টা চোখ নয়, মন। কবি 'ছন্দে ছন্দে সুন্দর গতি' দান করেন এই ধ্বনিকে, প্রসাধনে মণ্ডিত করেন এই ধ্বনিকে।

শব্দালঙ্কার প্রকৃতপক্ষে ধ্বনির অলঙ্কার। ধ্বনি আবার বর্ণধ্বনি, পদধ্বনি, কোথাও বা বাক্যধ্বনি। শব্দালঙ্কারের শব্দ, সূক্ষ্ম বিচারে, word নয়। বর্ণধ্বনি অনুপ্রাসে, পদধ্বনি যমক বক্রোক্তি শ্লেষ পুনরুক্তবদাভাসে, বাক্যধ্বনি সর্ব্বযমকে। যথাস্থানে এদের ব্যাখ্যা করব এবং বাঙলাভাষার অন্তঃপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রেখে এদের নানানতর প্রকারভেদ যুক্তি দিয়ে যথাযোগ্যভাবে গ্রহণ বা বর্জ্জন করব।

কেউ হয়তো বলবেন, 'শব্দ' মানে ধ্বনি শুধু অনুপ্রাস-সম্পর্কেই বলা চলে; যমক শ্লেষ ইত্যাদির বেলায় শব্দ মানে word বলব না কেন?

বলতে আমিও তো নিষেধ করি নাই। শব্দ মানে word না ধরলে 'পদধ্বনি' 'বাক্যধ্বনি' লেখা তো আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। যমক শ্লেষ ইত্যাদিতে অর্থেরও চরম মর্য্যাদা—অর্থ বাদ দিলে এসব অলঙ্কারের অস্তিত্বই থাকবে না, শুধু অনুপ্রাসই থাকবে একমাত্র শব্দালঙ্কার হ'য়ে। তবু এরা অর্থালঙ্কারের পর্য্যায়ভুক্ত হয় নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হ'য়ে যাবে। অর্থালঙ্কারে শব্দের (word-এর) অর্থটাই সর্ব্বস্ব; শব্দালঙ্কারে অর্থের দিক্‌টা নিতান্তই গৌণ। শব্দ এখানে word সত্য; কিন্তু শব্দের বিশেষবর্ণসমাবেশময় গঠনরূপটাই চরম সত্য। এই গঠনরূপে বর্ণাবলীর মিলিত যে ধ্বনি (sound), সেইটিই অলঙ্কারের নিয়ন্তা। দুটো উদাহরণ দেওয়া যাক—

মধুসূদনের

"কেন গর্ব্বী **কর্ণে** তুমি **কর্ণ**-দান কর,
রাজেন্দ্র?"

প্রেমেন্দ্রের

"কোন্ সে বধূর বুকের আগুন ভিতর করিয়া খাক্,
অবশেষে লাগে বসনে তাহার পুড়ে গেল **সাতপাক**।"

প্রথমটিতে **'কর্ণ' 'কর্ণ'**—অলঙ্কার **যমক**। 'সেনাপতি কর্ণ' আর 'কান' এদের যথাক্রমিক অর্থ (অহঙ্কারী কর্ণের কথা শোন কেন?)। প্রথম 'কর্ণ'-কে 'সূতপুত্র' অথবা দ্বিতীয় 'কর্ণ'-কে 'কান' বা 'শ্রুতি' করলে আর যমক থাকে না। অলঙ্কার রাখতে হ'লে 'কর্ণ-কর্ণ' রাখতেই হবে। অর্থের সঙ্গে যেটি চাই-ই চাই সেটি হচ্ছে 'করণ' বর্ণকয়টির ধ্বনির যথাযথ দ্বিরাবৃত্তি। প্রেমেন্দ্রের কবিতাংশটিতে **'সাতপাক'** কথাটিতে **শ্লেষ** অলঙ্কার। এটি word তো নিশ্চয়ই; কিন্তু এর অর্থ বজায় রেখে একে যদি সাতপ্যাঁচ, সপ্তবেষ্টনী-গোছের চেহারা দেওয়া যায় তাহ'লে শাড়ীর সাতটা পাক ঠিকই থাকবে, কিন্তু **বিবাহ** অর্থটা অন্তর্ধান করবে এবং শ্লেষ অলঙ্কার বরণ করবে অপমৃত্যু। মূল্য তাহ'লে কোন্‌টার বেশী হ'ল?—অর্থের? না, বিশেষধ্বনিমান্ **সা-ত-পা-ক** বর্ণাবলীর?

শব্দালঙ্কার শব্দপরিবর্ত্তন সইতে পারে না, অর্থালঙ্কার পারে। এইখানেই দুইয়ের পার্থক্য ('অর্থালঙ্কার' দ্রষ্টব্য)।

শব্দালঙ্কারের মধ্যে **অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, (শব্দ-) শ্লেষ** এবং **পুনরুক্তবদাভাসই** প্রধান। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যেও অনুপ্রাসের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশী; এর নীচেই বক্রোক্তি আর শ্লেষ; তৃতীয় স্থান যমকের এবং চতুর্থ পুনরুক্তবদাভাসের।

আগেই বলেছি শব্দপরিবর্ত্তনে শব্দালঙ্কারের অস্তিত্ব থাকে না।

১। অনুপ্রাস

একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ, যুক্তভাবেই হোক আর বিযুক্তভাবেই হোক, একাধিকবার ধ্বনিত হ'লে হয় **অনুপ্রাস**।

বর্ণ—ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ নয়। যে বর্ণের বা বর্ণগুচ্ছের অনুপ্রাস হবে, তাদের সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনি বিষম অর্থাৎ বিভিন্ন হ'লেও অনুপ্রাস অক্ষুণ্ণ থাকবে ("অনুপ্রাসঃ শব্দসাম্যং **বৈষম্যেঽপি** স্বরস্য যৎ"—সাহিত্যদর্পণ)। 'শব্দসাম্য' কথাটার অর্থ ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিসাম্য। অনুপ্রাসে স্বরধ্বনির সম্মান নাই। দুইএকটা উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে:

(i) "গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—প্রথম পঙ্‌ক্তিতে **'গ'** অনুপ্রাসিত হয়েছে **চারবার** এবং প্রত্যেক বারেই 'গ'-র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আছে 'উ'-ধ্বনি; সুতরাং ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরধ্বনিরও ঘটেছে সমতা। পরবর্ত্তী পঙ্‌ক্তিদুটিতেও এই অবস্থা: **'গ'** অনুপ্রাসিত হয়েছে **আটবার** এবং প্রত্যেক বারেই 'গ'-র সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আছে 'অ'-ধ্বনি; সুতরাং স্বর ও ব্যঞ্জন দুইয়েরই ধ্বনিসাম্য। আবার সমগ্রভাবে তিনটি পঙ্‌ক্তিতে **'গ'** অনুপ্রাসিত হয়েছে **বারোবার**। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে স্বরধ্বনি **'উ'**, দ্বিতীয়-তৃতীয়ে **'অ'**; সুতরাং স্বরধ্বনি **বিষম**। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনির সাম্য হ'ল কি বৈষম্য হ'ল সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। উদ্ধৃতিটির অলঙ্কারনির্ণয়ে শুধু এই কথাটি বলতে হবে যে **এখানে 'গ'-ধ্বনির অনুপ্রাস, ধ্বনিটি বারোবার আবৃত্ত হয়েছে।**

(ii) "কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত"—রবীন্দ্রনাথ।

—চারবার আবৃত্ত 'ক'-ধ্বনির অনুপ্রাস।

(iii) 'স্বর্ণোজ্জ্বলবর্ণা, তোমার কর্ণে দুলিছে কর্ণিকার'—শ. চ.

—'র্ণো', 'র্ণা', 'র্ণে', 'র্ণি'; কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমাদের অলঙ্কার চারবার আবৃত্ত 'র্ণ' এই যুক্তব্যঞ্জনধ্বনির অনুপ্রাস।

অনুপ্রাসে ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলিত স্বরধ্বনির সাম্যকে ইংরিজিতেও মূল্য দেওয়া হয় না।

শুদ্ধ স্বরধ্বনির সাদৃশ্যকে আমরা অনুপ্রাস বলি না, কারণ এক স্বর বার বার উচ্চারিত হ'লেও ধ্বনিগত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে না—"স্বরমাত্রসাদৃশ্যং তু বৈচিত্র্যাভাবাৎ ন গণিতম্" (বিশ্বনাথ)। এ যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত। ইংরিজিতে ভুল ক'রে স্বরবর্ণের অনুপ্রাস (Alliteration) বহুদিন ধ'রে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছিল। আজও উদাহরণরূপে

"Apt Alliteration's artful aid" বা
"An Austrian army awfully arrayed"

অনেকের বইয়ে দেখা যায়। অথচ ধ্বনির দিক্ থেকে 'a' কত বিসদৃশ—'a' = এ্যা, আ, এ, অ। এর চেয়ে শতগুণে ভালো

'আকুল আবেগে আমি আপনার আসার আশায় আছি'—শ. চ.

ধ্বনির দিক্ থেকে এটি নিখুঁত। তবু 'আ'-র অনুপ্রাস হয়েছে একথা বলব না। আধুনিক ইংরিজি কাব্যশাস্ত্রে স্বরের alliteration স্বীকার করা হয় না, হয় শুধু ব্যঞ্জনের—"*Alliteration* occurs when two or more syllables in close proximity commence with *the same consonant*", বলেছেন Smith।

একটা মূল্যবান্ প্রসঙ্গ:

একই স্বরধ্বনির বহুবার আবৃত্তি ক্ষেত্রবিশেষে অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল বিস্তার করে Onomatopœia বা 'ভাবধ্বনি'তে। কিন্তু Onomatopœia অনুপ্রাস নয়। এটিকে Figure-এর বা অলঙ্কারের পর্য্যায়ভুক্ত করা ভুল, কারণ এর কোনো বাঁধা পথ নাই। একটা উদাহরণ দিই:

"স্তব্ধ প্রাসাদ বিষাদ-আঁধার,
শ্মশান হইতে আসে হাহাকার—
রাজপুরবধূ যত অনাথার
মর্মবিদার রব।"—রবীন্দ্রনাথ।

এখানে দীর্ঘায়ত 'আ'-ধ্বনি বার বার আবৃত্ত হ'য়ে করেছে বেদনার অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা। কিন্তু এই ব্যঞ্জনারহস্য শুধু নিরাকার 'আ'-ধ্বনির মধ্যেই নিহিত নয়।

বারংবার আবৃত্ত সাকার 'শষস'-ব্যঞ্জনধ্বনির শ্বাসব্যঞ্জনাকে আর শোকপ্রকাশ-দ্যোতক দ্বিরাবৃত্ত 'হ'-ধ্বনিকে সাহায্য করার সৌভাগ্য লাভ করেছে ব'লেই 'আ'-ধ্বনির অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা সম্ভবপর হয়েছে। একা 'আ'-ধ্বনি যে কত ব্যর্থ তা বোঝা যাবে যদি 'শষস' আর 'হহ' উড়িয়ে দিই :

'মূক রাজাগারে বেদনা-তিমির,
চিতাভূমে জাগা আনিছে সমীর
কত না অনাথা পুরকামিনীর
মর্ম্মবিদারী রব।'—শ. চ.

এখানেও তেরোটি আ-ধ্বনি রয়েছে, কিন্তু একান্ত মূল্যহীন এরা—না আছে অনুপ্রাস, না আছে Onomatopœia।

কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের

"ঐ আসে ঐ অতিভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা"

নজিররূপে দাঁড় করিয়ে বলেন, এই তো চমৎকার অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে 'ঐ', 'ঔ'; তাহ'লে মানি কেমন ক'রে যে স্বরধ্বনিতে অনুপ্রাস হয় না?

আমার উত্তর এই :

বাঙলায় স্বরধ্বনির উচ্চারণে হ্রস্বদীর্ঘবিচার নাই; সব স্বরই হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রার। **শুধু মাত্রাচ্ছন্দের কবিতায়** 'ঐ' আর 'ঔ' এই দুটিমাত্র স্বর দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিকভাবে উচ্চারিত হয়। এরা 'আ, ঈ, উ, এ, ও'-র চেয়ে ওজনে ভারী, তার কারণ উচ্চারণে এরা দুই স্বরধ্বনির (মিলিত নয়) স্বল্পব্যবহিত রূপ —'ঐ'=অই বা ওই, 'ঔ'=অউ বা ওউ। স্বরবর্ণাবলীর মধ্যে এরা এইভাবে একটু ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ব'লে একপ্রকার বিশেষ ধ্বনিমূল্য এদের আছে।

মাত্রাচ্ছন্দেই রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রয়োগ করেছেন 'ঐ' 'ঔ'। এদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন বহু গুরুগম্ভীর ব্যঞ্জনধ্বনি—ভ, হ, জ, ঘ, গ, ব, ষ; সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন 'ভ, জ, য, ত, র, ষ, স, ন'-র অনুপ্রাস। মেঘমেদুর বর্ষার ভাবব্যঞ্জনায় রচিত বহুবিচিত্র উপচার-উপকরণের নৈবেদ্যখানির অঙ্গীভূত হওয়ায় 'ঐ' আর 'ঔ' পাঠকমনে বিস্তার করে একপ্রকার মায়া—মাত্রাচ্ছন্দ ওই মায়াসৃষ্টির অবকাশ ঘটিয়েছে।

এই কবিতাংশটিকে তানপ্রধান পয়ারে রূপান্ত[illegible] দেখিয়ে দিচ্ছি

'ঐ' 'ঔ' একমাত্রিক হওয়ায় ধ্বনিগৌরব হারিয়ে কত গৌণভূমিতে নেমে এসেছে :

'ঐ আসে ঐ যে গো অতিভৈরব হরষে
সলিলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
জলদগৌরবে নবযৌবনা বরষা'—শ. চ.

এখানে **অনুপ্রাস হয় নাই** ; কারণ যে ধ্বনিবৈচিত্র্য থাকলে কান সুন্দর ব'লে তাকে বরণ ক'রে নেয়, 'ঐ' 'ঔ' এখানে মেরুদণ্ডহীন ব'লে সেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে নাই।

মনে হোয়, রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় 'ঐ' লিখেছিলেন 'ঐ'কারের সম্ভাব্য অনুপ্রাসনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি-আকর্ষণের বাসনায়। মনে হওয়ার কারণ 'ওই' লেখাই রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস, সবরকম ছন্দে।

যাই হোক, **আমরা মাত্রাচ্ছন্দের কবিতায় 'ঐ' আর 'ঔ' স্বরধ্বনি-দুটির অনুপ্রাস স্বীকার করব**। রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশটির মতন অনুকূল ধ্বনিপরিবেশ না থাকলেও 'ঐ' 'ঔ' আপন শক্তিতেই অনেকটা বৈচিত্র্য যে আনতে পারে তার প্রমাণ মিলবে নীচের কবিতাটিতে :

'ঐ ধেনু ল'য়ে হৈ হৈ রব করিয়া
পৌষের সাঁঝে যৌবনপথ ধরিয়া
রাখাল ফিরিছে, বৌ আসে জল ভরিয়া।'—শ. চ.

বাঙলা উচ্চারণ ও অনুপ্রাস

বাঙলাভাষার উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের কারণে আমাদের অনুপ্রাসবিচার ঠিক সংস্কৃতনিয়মে চলে না। আমরা মুখে বলি বর্গীয় 'ব' অন্তঃস্থ 'ব', বর্গীয় 'জ' অন্তঃস্থ 'য', দন্ত্য 'ন' মূর্দ্ধন্য 'ণ', তালব্য 'শ' মূর্দ্ধন্য 'ষ' দন্ত্য 'স'; কিন্তু উচ্চারণে আমাদের সকল 'জ'ই বর্গীয় (জল, যদি), সকল 'ব'ই বর্গীয় (বন্ধন, বচন), সকল 'ন'ই দন্ত্য (ধন্য, গণ্য), সকল 'শ'ই তালব্য (বিশেষণে সবিশেষ')। 'য'-কে 'জ' করেছি; কিন্তু 'য'-র মূল সংস্কৃত উচ্চারণ বাঙলায় যেখানে রাখতে হয়েছে, সেখানে এর তলায় ফুট্‌কি দিয়ে নতুন এক বর্ণ সৃষ্টি করেছি—নয়ন, প্রিয়। এইসব কারণে আমাদের অনুপ্রাসকে অনেকক্ষেত্রে চলতে হবে অ-সংস্কৃত অর্থাৎ খাঁটি বাঙলা পদ্ধতিতে।

দুইএকটা উদাহরণ দিই :

(i) 'দুঃশাসনের শোষণ-নাশন হে ভীষণ-দরশন'—শ. চ.

(ii) 'নববন্ধনে বাঁধিলে যে তুমি জননি'—শ. চ.

—(i) **বাঙলামতে** 'শ ষ স' সবই উচ্চারণে 'শ' (sh) এবং 'ণ ন' উচ্চারণে 'ন' (n) ব'লে সাতবার 'শ'-ধ্বনির এবং ছবার 'ন'-ধ্বনির অনুপ্রাস। **সংস্কৃত-মতে** এ উদাহরণে অনুপ্রাস-বিচার চলে **দুভাবে:** (১) উচ্চারণস্থান বিভিন্ন ব'লে 'শ ষ স' অথবা 'ণ ন' অনুপ্রাসের অধিকারে বঞ্চিত; বলতে হবে—চারবার 'শ', দুবার 'ষ', দুবার 'ণ' আর চারবার 'ন' অনুপ্রাসিত হয়েছে, 'স' প'ড়ে আছে একলা। (২) 'স ন' অনুপ্রাস উচ্চারণস্থান দন্ত ব'লে, 'ষ ণ' অনুপ্রাস উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা ব'লে—এর নাম 'শ্রুত্যনুপ্রাস'।

(ii) **বাঙলামতে** দুবার 'ব'-ধ্বনির অনুপ্রাস। **সংস্কৃতমতে** অনুপ্রাস নাই, কারণ 'নব'-র 'ব' অন্তঃস্থ, 'বন্ধনে'-র 'ব' বর্গীয়। **বাঙলামতে** 'জ য' অনুপ্রাস আমাদের উচ্চারণে এরা এক (j) ব'লে। **সংস্কৃতমতেও** অনুপ্রাস 'জ য' একই স্থান (তালু) থেকে উচ্চারিত ব'লে—শ্রুত্যনুপ্রাস।

'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'-র প্রথম সংস্করণে শ্রুত্যনুপ্রাস কেন বর্জ্জন করেছিলাম সংক্ষেপে তা একটু জানিয়ে দেওয়ার দরকার হয়েছে।

যে-সব ব্যঞ্জন একই স্থান থেকে উচ্চারিত তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম একপ্রকার ধ্বনিসাম্য অনুভূত হয়। এই সূক্ষ্ম সাদৃশ্য-অনুভূতির ভিত্তিতে এইজাতীয় বর্ণধ্বনির অনুপ্রাস প্রাচীনদের কেউ কেউ স্বীকার করেছিলেন। এরই নাম শ্রুত্যনুপ্রাস; আচার্য্য দণ্ডী এর প্রবর্ত্তক, ভোজরাজ উৎসাহী সমর্থক, বিশ্বনাথ অদ্ভুত অনুবর্ত্তক—'অদ্ভুত' বললাম এই কারণে যে বিশ্বনাথ প্রাচীন ধারা থেকে স'রে এসে আমার অর্থাৎ বাঙালীর প্রায় পাশে দাঁড়িয়েছেন। আচার্য্য দণ্ডীর উদাহরণ "এষ রাজা যদা লক্ষ্মীম্…"—তাঁর মতে 'ষ-র', 'জ-য', 'দ-ল' প্রত্যেক জোড়াটিতে শ্রুত্যনুপ্রাস; কারণ প্রথম জোড়াটির উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, দ্বিতীয়টির তালু এবং তৃতীয়টির দন্ত। আমরা কিন্তু একমাত্র 'জ-য' ছাড়া অন্য কোনো জোড়ায় বর্ণে বর্ণে ধ্বনিসাম্য শ্রুতি (কান) দিয়ে ধরতে পারি না। বিশ্বনাথেরও আমাদেরই মতন অবস্থা হয়েছে। তাঁর উদাহরণ "মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ"—তিনি বলছেন 'জ-য' শ্রুত্যনুপ্রাস; কিন্তু 'মনসিজ' কথাটিতে দন্ত হ'তে উচ্চারিত 'ন-স'-সম্বন্ধে তিনি নীরব। এর একমাত্র কারণ এই যে বাঙলার মতন ওড়িয়াতেও 'য' উচ্চারণে 'জ' ব'লে বিশ্বনাথের কান সহজেই এদের ধ্বনিসাম্য মেনে নিয়েছে, 'ন-স'-কে সমধ্বনি ব'লে স্বীকার করতে পারে নাই।

এ অবস্থায় শ্রুত্যনুপ্রাসকে বাঙলায় প্রাচীন সংজ্ঞা-অনুসারে গ্রহণ করার কোনো সার্থকতা দেখি না।

বাঙলা কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস একটি মূল্যবান্ শব্দালঙ্কার। সেখানে শ্রুত্যনুপ্রাস আমাদের উপকার করবে; **কিন্তু তার সংজ্ঞা রচনা করব** নতুন ক'রে।

বাঙলায় **অনুপ্রাস তিনরকম—অন্ত্য, বৃত্তি, ছেক**। এদের মধ্যে **বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ**, কারণ গদ্যপদ্যময় সাহিত্যে এর সার্ব্বভৌম **অধিকার**; মিত্রছন্দা কবিতার আনন্দলোকে 'চরণ-বিচরণ' অন্ত্যানুপ্রাসের। ছেক গৌণ। **শ্রুত্যনুপ্রাসকে আমরা গ্রহণ করছি শুধু অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারিরূপে; বাঙলায় এর স্বতন্ত্র আসন নাই।**

(ক) **শ্রুত্যনুপ্রাস** ঃ

বাগ্‌যন্ত্রের একই স্থান হ'তে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য-সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জনধ্বনির নাম **শ্রুত্যনুপ্রাস**।

ধ্বনির ঐক্য নয়, সাদৃশ্য অর্থাৎ 'ছন্দ-নন্দ'-র মতন ঠিক এক নয়, 'ছন্দ-বন্ধ'-র মতন একরকম। বাঙলায় 'ক' আর 'খ' সদৃশ ধ্বনি, 'গ' আর 'ঘ' সদৃশ ধ্বনি, তেমনি চ ছ, ট ঠ, ত থ, প ফ, জ ঝ, ড ঢ, দ ধ, ব ভ সদৃশ ধ্বনি। এইজাতীয় ধ্বনিসাদৃশ্য নিয়ে অজস্র অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন বাঙলার সকল যুগের কবিরা। রবীন্দ্রনাথ থেকে উদাহরণ দিই—

ক খ ঃ পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা।
গ ঘ ঃ বাতাস বহে বেগে, ঝিলিক মারে মেঘে।
চ ছ ঃ কালো চোখে আলো নাচে, আমার যেমন আছে।
জ ঝ ঃ চিরদিন বাজে অন্তরমাঝে।
ট ঠ ঃ ধরি তার কর দুটি, আদেশ পাইলে উঠি।
ত থ ঃ লীলাপদ্ম হাতে, কুরুবক মাথে।
দ ধ ঃ বাদী প্রতিবাদী, বিবিধ উপাধি।
প ফ ঃ দিল সে এত কাল যাপি, হোলির দিনে কত কাফি।
ব ভ ঃ কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু;
হতাশ মনে রইব না আর কভু।

('ড-ঢ'-র অন্ত্যানুপ্রাস বাঙলায় নানা কারণে দুর্লভ)

উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে একস্থান হ'তে উচ্চারিত শ্রুতিগ্রাহ্য সদৃশ ধ্বনি ব্যঞ্জনের অনুপ্রাস, অতএব শ্রুত্যনুপ্রাস। উদাহরণগুলি

অন্ত্যানুপ্রাসের এবং এই অন্ত্যানুপ্রাস সম্ভবপর হয়েছে শ্রুত্যনু-প্রাসের সহকারিতায়। শ্রুত্যনুপ্রাসহীন অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ :

"দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুররেখা,
তব বামবাহু বেড়ি শঙ্খবলয় তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা॥"

—রবি।

বর্গের প্রথম-দ্বিতীয় (যেমন ত-থ) অথবা তৃতীয়-চতুর্থ (যেমন দ-ধ) বর্ণের ধ্বনিসাদৃশ্য শ্রুত্যনুপ্রাসের সৃষ্টি করে; কিন্তু প্রথম-তৃতীয় (ত-দ…), প্রথম-চতুর্থ (ত-ধ…), দ্বিতীয়-চতুর্থ (থ-ধ…) বা দ্বিতীয়-তৃতীয় (থ-দ…) করে না। ধ্বনিতত্ত্বের দিক্ থেকে এইটেই স্বাভাবিক; কারণ, 'ত-থ' বা 'দ-ধ' একই ধ্বনির অল্পপ্রাণ (mute) আর মহাপ্রাণ (aspirate) রূপ। প্রথম আর তৃতীয় বর্ণকে নিয়ে শ্রুত্যনুপ্রাসজাত অন্ত্যানুপ্রাস কচিৎ দেখা যায়; বর্ণদুটি 'ক' আর 'গ'। শব্দান্তের হসন্ত 'ক' (ক্) উচ্চারণে কোথাও কোথাও 'গ্' হ'য়ে যায় বর্ণবিকৃতির ফলে : কাক্>কাগ্, বক্>বগ্, শাক্>শাগ্। পশ্চিম বাঙলায় তদ্ভব ক্রিয়াপদের প্রয়োগেও এই বর্ণবিকারটি শোনা যায়—থাক্, যাক্, হোক্>থাগ্, যাগ্, হোগ্। এই ব্যাপারটিও কাজে লাগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :

"ভয় কোরো না অলক্তরাগ
মোছে যদি মুছিয়া যাক।"

বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই **ক** এখানে **গ**-বৎ উচ্চারিত।

র এবং **ড়** ধ্বনির অনুপ্রাসও শ্রুত্যনুপ্রাস, বর্ণদুটি মূর্দ্ধন্য। এই দুটির শ্রুত্যনুপ্রাসের সহকারিতায় অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ :

"স্থির জলে নাহি সাড়া
পাতাগুলি গতিহারা।"—রবীন্দ্রনাথ।

"শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা।"—রবীন্দ্রনাথ।

কবিতার চরণের মধ্যেও শ্রুত্যনুপ্রাসকে অপূর্বসুন্দরভাবে অন্য অনুপ্রাসের সঙ্গে মিলিয়ে দি[illegible] দাঁড়াবে থ[illegible]

(iii) "নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-[illegible] দেহে
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা"—[illegible] দিল স্নেহে।"

—প্রথম চরণে 'ব-ভ' শ্রুত্যনুপ্রাস; 'নিরারণ-নিরারণ' ছেকানুপ্রাস; মিলিতভাবে ('নিরাবরণ-নিরাভরণ') সাধারণ অনুপ্রাস। দ্বিতীয় চরণে 'ক-খ' শ্রুত্যনুপ্রাস; 'ন-ন' বৃত্ত্যনুপ্রাস; 'ইকন-ইখন' মিলিত সাধারণ অনুপ্রাস। মধুর উদাহরণ।

(খ) অন্ত্যানুপ্রাস ঃ

পদ্যে পাদান্তের সঙ্গে পাদান্তের, চরণান্তের সঙ্গে চরণান্তের ধ্বনিসাম্যের নাম **অন্ত্যানুপ্রাস**।

বৈদিক থেকে লৌকিক পর্য্যন্ত সংস্কৃত কাব্যে বৃত্তছন্দ বেশী প্রচলিত। "বৃত্তম্ অক্ষরসংখ্যাতম্" অর্থাৎ metres regulated by the number of syllables with rhythm but without rhyme। কাজেই পাদান্তগত বা চরণান্তগত ধ্বনিসাম্য যেখানে মিলেছে, সেখানে তাকে ধ্বনিজাত অলঙ্কার অনুপ্রাস ব'লেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রে 'অন্ত্যানুপ্রাস' ব'লে কিছু নাই।

অন্ত্যানুপ্রাস অনুপ্রাস হ'লেও অনুপ্রাসের অনুশাসন এখানে শিথিল। এখানে স্বরধ্বনিও সম্মানিত। "...স্বরসংযুক্তাক্ষরবিশিষ্টম্" (ব্যঞ্জনম্), বলেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। আধুনিক ইংরিজি সংজ্ঞাতেও এই ভাবের কথা আরও সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে : Rhyme (আমাদের অন্ত্যানুপ্রাস) হ'ল, "likeness between the vowel sounds in the last metrically stressed syllables of two or more lines or sections of lines, and between all sounds, consonant or vowel, that succeed" (Smith)।

অন্ত্যানুপ্রাসে স্বরধ্বনিকে পূর্ণ মর্য্যাদা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। এমন কি, অনুপ্রাসিত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব্ববর্ত্তী স্বাধীন অথবা পরাধীন স্বরধ্বনিকেও অন্ত্যানুপ্রাসে গ্রহণ করতে হবে, যদি এ ধ্বনি সদৃশ হয়। যেমন—

> "ধরা নাহি দিলে ধরিব **দুপায়**,
> কি করিতে হবে বলো সে **উপায়**,
> ঘর ভরি দিব সোনায় **রুপায়**" —রবীন্দ্রনাথ।

—অন্ত্যানুপ্রাস 'উপায়-উপায়-উপায়' : [illegible] প্রথম আর তৃতীয় চরণে পরাধীন : দ্+উপা[illegible]ণে একস্থান হ'তে উচ্চারিত শ্রুতি[illegible]'-কে ছিনিয়ে নিয়েছি। [illegible] অতএব শ্রুত্যনুপ্রাস। উদাহরণগুলি

বাঙলাকাব্যে **শুদ্ধ স্বরধ্বনির অন্ত্যানুপ্রাস** যথেষ্ট পাওয়া যায় :

(i) শোন্ শোন্ লো রাজার ঝি,
তোরে কহিতে আসিয়াছি,—
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি একাজ করিলি **কি**।"—কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি।

(ii) "কহিল, 'ওস্তাদজি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি'।"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "কহিলা কবির **স্ত্রী**,
মাথার উপরে বাড়ি পড়োপড়ো তার খোঁজ রাখ **কি**?"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "আমার সুন্দর **না**
যেবা আসি দিবে **পা**"—মাধবদাস।

(v) "মনে মনে ভাবছে কেসর **খাঁ**,
তেমন ক'রে কাঁকন বাজছে **না**"—রবীন্দ্রনাথ।

প্রথম তিনটিতে 'ই' ধ্বনির এবং পরের দুটিতে 'আ' ধ্বনির অন্ত্যানুপ্রাস। ব্যঞ্জনাশ্রিত না ক'রে শুধু স্বরেই অন্ত্যানুপ্রাস করা যায় :

'এখন ব'লে যাও **গামাপা ধা**,
আশের বেলা শুধু **আআআ আ**।'—শ. চ.

আমাদের আধুনিক কাব্যে, বিশেষ ক'রে ধ্বনিরসিক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অন্ত্যানুপ্রাস বহুবিচিত্র রূপ লাভ করেছে। এর জন্য আমরা ঋণী মহাকবি জয়দেবের কাছে। অননুকরণীয় কাব্য 'গীতগোবিন্দ'র গানগুলিতে একাক্ষর (monosyllabic), দ্ব্যক্ষর, ত্র্যক্ষর এবং তিনেরও বেশী অক্ষরের সুন্দর অন্ত্যানুপ্রাস চরণান্তে, পাদান্তে, এমন কি পাদার্দ্ধেরও অন্তে প্রচুর রয়েছে। এই-ভাবের এবং আরও অভিনবভাবের অন্ত্যানুপ্রাসে রবীন্দ্রকাব্য গুঞ্জনমুখর।

শ্রেণীবদ্ধ উদাহরণ :

সহজ পথের অন্ত্যানুপ্রাস :

(i) "ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী **ঝর্ণা**!
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন**বর্ণা**"—সত্যেন্দ্রনাথ।

(ii) "অজানা গোপন গন্ধে পুলকে **চমকি**
দাঁড়াবে **থমকি**"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-**অঞ্চলা**
বিদ্যুৎ-**চঞ্চলা**"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজিনে ভাই, **ভাষাতীত**,
আকাশপানে বাহু তুলে চাহিনে ভাই, **আশাতীত**।"—রবীন্দ্রনাথ।

—অর্ণা-অর্ণা, অমকি-অমকি, অঙ্কলা-অঙ্কলা, আষাতীত-আশাতীত। স্বরধ্বনিসমেত গ্রহণ করতে হয় একথা আগে বলেছি। শিথিল ভাষায় বলা হয় 'রবি' আর 'কবি' মিল হয়েছে। একথা বলা ভুল—'র' আর 'ক' অনুপ্রাস নয়, 'অবি-অবি' অনুপ্রাস যেমন 'take-sake' রাইম নয়, রাইম 'ake-ake'। স্বরধ্বনি সর্ব্বত্রই গ্রহণীয়।

রবীন্দ্রনাথকর্ত্তৃক খেলাচ্ছলে সৃষ্ট একটি অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণ:

"শ্রাবণে ডেপুটি**পনা**
এ তো কভু নয় **সনা**-
তন প্রথা এ যে **অনা**-
সৃষ্টি অনাচার।"—(শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্রাংশ)।

চিত্র অন্ত্যানুপ্রাস (Composite rhyme)

(v) "দিঘির **কালো জলে** সাঁঝের **আলো ঝলে**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "সন্ধ্যামুখের **সৌরভী ভাষা**,
বন্ধ্যাবুকের **গৌরবী আশা** . ।"—যতীন্দ্রমোহন।

—এ দুটি একভাবের। প্রথমাংশের দুটো ক'রে কথা দ্বিতীয়াংশের দুটো ক'রে কথার সঙ্গে মিল ঘটিয়েছে: 'কালো-আলো', 'জলে-ঝলে', 'সৌরভী-গৌরবী', 'ভাষা-আশা'। প্রত্যেক কথাটা **পূর্ণ পদ**। ধ্বনিবিচার পূর্ব্ববৎ।

(vii) "এতটুকু ফাঁকা যেখানে **যা পাই**
তোমার মূরতি সেখানে **চাপাই**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "আসে গুটি **গুটি বৈয়াকরণ**
ধূলিভরা **দুটি লইয়া চরণ**"—রবীন্দ্রনাথ।

—(vii)-তে প্রথমাংশে দুটি কথা, দ্বিতীয়াংশে একটি। **'যা পাই'** পদদুটির সমগ্রধ্বনি 'চাপাই'-এর ধ্বনির সঙ্গে অনুপ্রাসিত।

(viii)-তে ছয়টি ক'রে অক্ষরের (syllable) অন্ত্যানুপ্রাস।

সংক্ষেপে, গুটি বৈয়া করণ / দুটি লইয়া চরণ } অথবা, গুটি বৈয়াকরণ / দুটি লইয়াচরণ }

উপান্ত্য অনুপ্রাস (Penultimate rhyme)

(ix) "জমবে ধুলা তানপুরাটার **তারগুলায়**,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের **দ্বারগুলায়**,... ।"—রবীন্দ্রনাথ।

(x) "এমনিধারা একটি চপল **পলকসম**,
ক্ষণপ্রভার হাসির একটি **ঝলকসম**
তিনটি ফাগুন অভ্যাগতের **কুঞ্জ দিয়ে**
পার হ'ল তায় পূজার অর্ঘ্য**পুঞ্জ দিয়ে**।"

—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

"কচি কচি দুটি টুকটুকে ঠোঁট অভিমানভরে **ফুলে ওঠে**,
নয়নের কূলে অশ্রুপাথার **দুলে ওঠে**।...
'ছি ছি, থাক্ থাক্, সরো, হবে'খন, খোকনের মান **ভাঙি আগে**,
ওর হাসিমাখা চুমায় এমুখ **রাঙি আগে**'।"

—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

—দুচরণের অন্ত্য শব্দ এক (গুলায়, সম, দিয়ে, ওঠে, আগে); অনুপ্রাস উপান্ত শব্দে (তার-ধার, পলক-ঝলক, কুঞ্জ-পুঞ্জ, ফুলে-দুলে, ভাঙি-রাঙি)।

সর্ব্বানুপ্রাস (Omnirhyme)

(xii) "গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা।"—যতীন্দ্রমোহন।

(xiv) "রজনীগন্ধা বাস বিলালো,
সজনী সন্ধ্যা আসবি না লো?"—যতীন্দ্রমোহন।

—'গগনে-চরণে', 'ছড়ায়ে-জড়ায়ে', 'এলোচুল বনফুল'; 'সন্ধ্যা-বন্ধ্যা', 'মুখের-বুকের', 'সৌরভী-গৌরবী', 'ভাষা-আশা'; 'রজনী-সজনী', 'গন্ধা-সন্ধ্যা', 'বাস বি-আসবি', 'লালো-না লো'। অত্যন্ত কৃত্রিম; তবু সাহিত্যে রয়েছে যখন, উদ্ধৃত করতেই হবে। শেষের উদাহরণ তিনটিতে সত্যকার অন্ত্যানুপ্রাস রয়েছে ব'লেই সর্ব্বানুপ্রাসলক্ষণ-সত্ত্বেও এদের অন্ত্যানুপ্রাসের দলভুক্ত করলাম।

Omnirhyme নামকরণটি আমার নিজের। এ নাম আমি দিয়েছিলাম ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আমার 'Golden Book of Rhetoric and Prosody' গ্রন্থে; বহু অনুসন্ধানের ফলে একটি ইংরিজি উদাহরণ আবিষ্কার করেছিলাম—

"Ripe for rest
Pipe your best"—John Davidson.

একটি অদ্ভুত উদাহরণ :

"বন্ধু, বন্ধু গো,
ভালো হ'তে হেথা মন্দ যে বেশী নাহিক সন্দেহ "
—যতীন্দ্রনাথ।

'উ'কার 'এ'কার বাদ দিয়ে 'হ'-কে 'হো' (বাঙলামতে প্রকৃত উচ্চারণ এখানে 'ও'কারান্ত) ধরলে দাঁড়ায় 'বন্ধ গো-সন্দ হো'='অন্ধ ও-অন্দ ও'। 'অ'দুটি স্বাভাবিক ; 'উ'কার 'এ'কারকে মূল্য না দিয়ে শুধু 'ন্ধ-ন্দ' ইংরিজিমতে Consonance আর 'গ-হ'-কে মূল্য না দিয়ে 'ও-ও' Assonance। তবে এঁটাও ঠিক যে 'গ' আর 'হ'-র মধ্যে একটা শ্রুতিগত ভাবসাদৃশ্য আছে। ইংরিজির consonance অর্থাৎ স্বরধ্বনিকে মূল্য না দিয়ে শুদ্ধ ব্যঞ্জনধ্বনির অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োগ বাঙলায় কেউ কেউ করছেন। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের পূজাসংখ্যা 'দেশ' পত্রিকা থেকে একটি উদাহরণ দিলাম :

"মনে আছে সেই গ্রীষ্মের দিনপঞ্জী।
রোদে ফুটিফাটা মাঠের পাঁজরে
কচি শস্যের চারা ধুঁকে মরে—
ঘূর্ণি ধুলোয় এসেছে নকল পাঞ্জা
আসেনি প্রবল বর্ষণে মেঘপুঞ্জ !"—মণীন্দ্র রায়।

[জয়দেব থেকে কয়েকটি উদাহরণ :

(i) "চল সখি কুঞ্জং
সতিমিরপুঞ্জং···।"

(ii) "রচয়তি শয়নং
সচকিতনয়নং···।"

(iii) "মধুরমধুযামিনী
কৃতসুকৃতকামিনী।"

(iv) "স্থলকমলগঞ্জনং
মম হৃদয়-রঞ্জনং···।"

(v) "বরতরুণেন
অতিকরুণেন।"

(vi) "জনকসুতাকৃতভূষণ
জিতদূষণ।"

(vii) "অহহ ন যযৌ বনম্
অপি রূপযৌবনম্।"

(viii) "অনিলতরলকুবলয়নয়নেন
তপতি ন সা কিসলয়শয়নেন॥"]

আধুনিক ইংরিজি কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আন্তানু-প্রাসেরও প্রয়োগ কোনো কোনো কবি করেছেন দেখতে পাই :নাথ।

"*Crude* daubs that cavemen would have scorned,
yet fools conspired to *praise*,
Rude verse less rhythmic, more uncouth, than pristine
bardic *lays*."—Stephen Phillips.

—অন্ত্যানুপ্রাস (স্বাভাবিক rhyme) : 'Praise-lays' ; **আন্তানুপ্রাস :** '*Crude-Rude*'। বাঙলায় এমনি উদাহরণ পেলে তার একটা নাম তো দিতে হবে ; তাই এর নাম দিলাম **আন্তানুপ্রাস**। বাঙলা উদাহরণ অবশ্য পেয়েছি :

"নর্ম্মের অবকাশ নাই রে
মগ্ন রয়েছি সদা **কর্ম্মে**,
চিন্তায় ভুলে থাকি তাই রে
লগ্ন রয়েছে যাহা **মর্ম্মে**।"
—লীলাময় রায় (অন্নদাশঙ্কর)।

—**'মগ্ন-লগ্ন' আন্তানুপ্রাস**। 'কর্ম্মে-মর্ম্মে' অন্ত্যানুপ্রাস।

অন্ত্যানুপ্রাসহীন বৃত্তচ্ছন্দে রচিত বররুচির সুবিখ্যাত কবিতায় অতি সুন্দর **আন্তানুপ্রাস** দেখতে পাচ্ছি :

"**ইতরতা**পশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥"

—আন্তানুপ্রাস 'ইতরতা'-'(ব্)ইতর তা'।

রবীন্দ্রনাথের

(i) "**বাঁকিয়ে** ভুরু **পাকিয়ে** চক্ষু বিমু বললে খেপে"
(ii) "**নিরাবরণ** বক্ষে তব **নিরাভরণ** দেহে"
—এ দুটিতে **পাদগত আন্তানুপ্রাস**। আর,
(iii) **চিকন** সোনা-**লিখন** উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে"
—এটিতে **পাদার্দ্ধগত আন্তানুপ্রাস**।

(গ) বৃত্ত্যনুপ্রাস ঃ

প্রকৃতপক্ষে সকল অনুপ্রাসই বৃত্ত্যনুপ্রাস, কারণ একই ব্যঞ্জনধ্বনির বৃত্তি (আবৃত্তি—repetition) অনুপ্রাসমাত্রেরই প্রাণ। অনুপ্রাস-প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থে 'বৃত্তি' কথাটি প্রথম যোগ করেন অষ্টম শতাব্দীর উদ্ভট। তাঁর 'বৃত্তি' মানে বলার ভঙ্গী ; প্রকাশের রূপের দিকটাই তাঁর কাছে ছিল বড়।

তাঁর তিনরকম বৃত্তির নাম **'পরুষা'**, **'উপনাগরিকা'** আর **'গ্রাম্যা'** (পরবর্তী কালের 'কোমলা')। এদের মধ্যে 'উপনাগরিকা'-র আসন সকলের ঊর্ধ্বে, কারণ তুলনায় সে নগরবাসিনী বিদগ্ধা বনিতার মতন। উদ্ভটের মতে—

(i) "সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে" (রবীন্দ্রনাথ) **'পরুষা'র** উদাহরণ, কারণ এতে 'শ-স' ধ্বনির প্রাধান্য ,

(ii) "ললিতগীতি কলিতকল্লোলে" (রবি) **'গ্রাম্যা'র** উদাহরণ তরল 'ল' ধ্বনির প্রাধান্য ব'লে , আর **'উপনাগরিকা'র** উদাহরণ :

(iii) "কুন্দবরণ সুন্দর হাসি" (রবি) বা "কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহারী" (জগদানন্দ) অনুনাসিকমধুর একই ব্যঞ্জনধ্বনির আবৃত্তি ব'লে।

কেউ কেউ 'বৈদর্ভী' রীতির সঙ্গে 'উপনাগরিকা'র, 'পাঞ্চালী'র সঙ্গে 'গ্রাম্যা'র (কোমলার) এবং 'গৌড়ী'র সঙ্গে 'পরুষা'র সম্বন্ধ স্থাপন করলেন।

কেউ কেউ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের "বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ"-র আকর্ষণে আনলেন তাঁর 'কৈশিকী', 'ভারতী' ইত্যাদি বৃত্তিকে। উদ্ভটের 'বৃত্তি' আর ভরতমুনির 'বৃত্তি'র মিলন ঘটল রসসাগরসঙ্গমে। আনন্দবর্দ্ধন বললেন, উপনাগরিকা ইত্যাদি শব্দাশ্রয়া বৃত্তি আর কৈশিকী ইত্যাদি অর্থতত্ত্বসংবদ্ধা বৃত্তি (ধ্বন্যালোক ৩।৪৭ বৃত্তি)। ভরতমুনির "কৈশিকী শ্লক্ষ্ণনেপথ্যা শৃঙ্গার-রসসম্ভবা"-র অনুসরণে অভিনবগুপ্ত বললেন, উপনাগরিকা-নামক "অনুপ্রাস-বৃত্তিঃ শৃঙ্গারাদৌ বিশ্রাম্যতি। পরুষা ইতি দীপ্তেষু রৌদ্রাদিষু। কোমলা ইতি হাস্যাদৌ।"

সেই সময় থেকেই **বৃত্ত্যনুপ্রাসের 'বৃত্তি'** কথাটার অর্থ হ'য়ে গেছে রসের **আনুগত্য** এবং এর সংজ্ঞা করা হচ্ছে এই ব'লে—

রসানুগত অনুপ্রাসের নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস।

এ সংজ্ঞার প্রয়োজন ছিল ব'লে মনে করি না, কারণ কবির সৃষ্টিতে সকল-রকম অনুপ্রাসই রসানুগত অনুপ্রাস আর অকবির হাতে তথাকথিত বৃত্ত্যনু-প্রাসও অট্টহাস।

বৃত্ত্যনুপ্রাস-সম্বন্ধে **চারটি** কথা মনে রাখতে হবে :

প্রথম—একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ **দুবারমাত্র** ধ্বনিত হবে :

(i) "নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব"—রবীন্দ্রনাথ।

—**'হ'** এবং **'র'** মাত্র দুবার ক'রে ধ্বনিত হয়েছে।

(ii) 'বঞ্জুলবনে মঞ্জুমধুর কলকণ্ঠের তরল তান—শ. চ.

—'ব', 'ম', 'ক' এবং 'ত' মাত্র দুবার ক'রে ধ্বনিত হয়েছে।

দ্বিতীয়—একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ **বহুবার** ধ্বনিত হবে :

(i) "বাজিল বনে বাঁশের বাঁশরী
বনে ব'সে বাজাইছে বনবিহারী......"—লোকসঙ্গীত।

—'ব' প্রত্যেক শব্দের আদিতে ধ্বনিত হয়েছে। বারের সংখ্যা নয় (৯)। [উদাহরণটি একটি গানের মাত্র প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি। গানটি বেশ বড় এবং আদ্যন্ত প্রত্যেক শব্দের আরম্ভ 'ব' দিয়ে।]

(ii) "কান্ত কাতর কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়"—বিদ্যাপতি।

(iii) "চলচপলার চকিত চমকে
করিছ চরণ বিচরণ"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "পিয়ালফুলের পরাগে পাটল পল্লীর বনবাটে"—যতীন্দ্রমোহন।

(v) "কেতকী কত কি কথা কামিনীর কহে কানে কানে"—কালিদাস।

(vi) "শরতের শেষে সরিষা রো"—খনার বচন।

তৃতীয়—ব্যঞ্জনগুচ্ছ **স্বরূপানুসারে** মাত্র দুবার ধ্বনিত হবে।

[অলঙ্কারশাস্ত্রে বর্ণের **স্বরূপসাদৃশ্য** এবং **ক্রমসাদৃশ্য** এই দুরকম সাদৃশ্যের কথা আছে। উদাহরণ দিয়ে এদের পার্থক্য বোঝানো যাক :—

(i) 'জেগেছে যৌ**বন নব** বসুধার দেহে' (শ. চ.) : দেখা যাচ্ছে স্থূলাক্ষর অংশদুটির প্রথমটিতে যে যে বর্ণ ('ব' ও 'ন'), দ্বিতীয়টিতেও তাই। কিন্তু পর্যায় (succession) ভঙ্গ হয়েছে অর্থাৎ 'নব' শব্দে আগে এসেছে 'ন', পরে 'ব'। অথচ ধ্বনিসাদৃশ্য রয়েছে। এইজাতীয় সাদৃশ্যকে **স্বরূপসাদৃশ্য** বলে। কিন্তু যদি বলি (i) 'ফুটেছে যৌ**বন-বনে** আনন্দের ফুল' (শ. চ.), তাহ'লে স্থূলাক্ষর দুটি অংশেই বর্ণসজ্জা একরকমই থেকে ধ্বনিসাদৃশ্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বর্ণগুলির ক্রম (succession) অক্ষুণ্ণ থাকে। এইপ্রকার সাদৃশ্যের নাম **ক্রমসাদৃশ্য**।]

এই স্বরূপসাদৃশ্যের অনুপ্রাস **যুক্তব্যঞ্জনে হয় না**। 'তোমার চরণে অর্পিনু প্রাণ' চরণটিতে **র্প** আর **প্র** অনুপ্রাস নয়, যদিও **র্প**=র্‌প আর **প্র**=প্‌র —স্বরূপসাদৃশ্য। যুক্তবর্ণে ধ্বনিমাধুর্যের একান্ত অভাবই এর কারণ।

(ii) "অদূরে কো**মল-লোম** ছাগবৎস ধীরে"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "**কবির বুকের** দুখের কাব্য
ভক্তে চমৎকার।"—যতীন্দ্রনাথ।

(iv) "রাজপুতসেনা সরোষে **সরমে** ছাড়িল **সমরসাজ**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(v) "কবরী দিল করবীমালে ঢাকি।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "বাক্যকে অধিকার করেচে কাব্য।"— ঐ

চতুর্থ—ব্যঞ্জনগুচ্ছ যুক্ত বা অযুক্তভাবে **ক্রমানুসারে বহুবার** ধ্বনিত হবে :

(i) "এত ছলনা কেন বল না
গোপললনা হ'ল সারা"—নীলকণ্ঠপদাবলী।

—এখানে অযুক্ত ব্যঞ্জনগুচ্ছ 'লনা' ক্রমানুসারে তিনবার ধ্বনিত হয়েছে।

(ii) "গত যামিনী জিতদামিনী কামিনীকুললাজে"—জগদানন্দ।

(iii) "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার"—কালিদাস।

(iv) "অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।

।-পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'ঞ্চ' চারবার এবং 'ঞ্জ' চারবার ধ্বনিত হয়েছে।

(v) "ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া॥"—বিদ্যাপতি।

(vi) "সঙ্কটময় পঙ্কিল পথ শঙ্কিল চারিধার"—যতীন্দ্রমোহন।

(vii) "মঞ্জুবিকচকুসুমপুঞ্জ মধুপশব্দগঞ্জিগুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুর-পুঞ্জ মালতীফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জনগতিহারী।"—জগদানন্দ।

—শেষের পাঁচটি উদাহরণ বহুবার ধ্বনিত যুক্তব্যঞ্জনের।

(ঘ) **ছেকানুপ্রাস** ঃ

দুটি বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্ত থেকে **ক্রমানুসারে** যদি **মাত্র দুবার** ধ্বনিত হয়, তবেই হয় **ছেকানুপ্রাস**। **একব্যঞ্জনে ছেকানুপ্রাস হয় না**।

বৃত্ত্যনুপ্রাসেও ব্যঞ্জনগুচ্ছের দুবার ধ্বনিত হওয়ার লক্ষণ রয়েছে ; কিন্তু সেখানে ধ্বনিত হয় শুধু অযুক্তভাবে এবং স্বরূপানুসারে আর ছেকানুপ্রাসে দুবার ধ্বনিত হয় যুক্ত বা অযুক্তভাবে এবং ক্রমানুসারে। এইখানে দুটির পার্থক্য।

(i) "উড়িল কলম্বকুল অম্বরপ্রদেশে"—মধুসূদন।

(ii) "লঙ্কার পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে"— ঐ

(iii) "এখনি **অন্ধ বন্ধ** করো না পাখা"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গ**ন্ধ অন্ধ** হ'য়ে"— ঐ

(v) "জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌর**ভ র**ভসে"— ঐ

(vi) 'যাপিনু **যামিনী যমুনার** কূলে বন্ধুর পথ চাহি'—শ. চ.

(vii) "অশান্ত আকাঙ্ক্ষাপাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে **পঞ্জর-পিঞ্জরে**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "**করুণাকিরণে** বিকচ নয়ান।"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "কে বেঁধেছে তার তরণী,
তরুণ তরণী।"— ঐ

(x) "কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে তোমার **কমলকোমল** পাণি।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xi) "একটি ধানের **শিষের** উপরে একটি **শিশির**বিন্দু।"— ঐ

(xii) "উদ্ধত যত **শাখার শিখরে** রডোডেণ্ড্রনগুচ্ছ।"— ঐ

(xiii) "**অধর অধীর** হ'তো চুম্বন-লালসে।"—মোহিতলাল।

(xiv) "আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারচে, কিন্তু সে যে তার **গারদের গরাদের** ভিতর থেকে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xv) "**ঝিনিঝিনি ঝুনুঝুনু** সোনার নূপুর।"—রবীন্দ্রনাথ।

—উদাহরণগুলির প্রথম চারটিতে যুক্তব্যঞ্জন এবং বাকী কয়টিতে অযুক্ত-ব্যঞ্জনগুচ্ছ মাত্র দুবার ক'রে ধ্বনিত হয়েছে।

২। *শব্দশ্লেষ*

কবি যখন বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রয়োগ করেন এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে পাঠক বিভিন্ন অর্থেই শব্দটিকে গ্রহণ করবেন, তখনি হয় **শব্দশ্লেষ অলঙ্কার**।

শ্লেষবক্রোক্তির সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে **শ্লেষবক্রোক্তিতে** বক্তা আর শ্রোতার যে উক্তিপ্রত্যুক্তি লক্ষণটি রয়েছে, **শব্দশ্লেষে** তা নাই; এছাড়া, প্রথমটিতে বক্তা একটিমাত্র অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন এবং শ্রোতা তার অন্য অর্থ ধ'রে উত্তর দেন; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বক্তা নিজেই বিভিন্ন অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন।

শব্দশ্লেষ আর **অর্থশ্লেষে** পার্থক্য এই যে প্রথমটিতে শব্দ পরিবর্তন ক অলঙ্কার থাকে না, দ্বিতীয়টিতে থাকে।

শব্দশ্লেষ অলঙ্কারটি নানা কারণে মূল্যবান্। অন্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংলেন: রেখে শব্দশ্লেষ স্বাধীন অলঙ্কারজীবন যাপন করতে যেমন পারে, তেমনি

অন্ত অলঙ্কারের অঙ্গীভূত হ'য়ে তাকেই প্রাধান্ত দিয়ে নিজে গৌণ হ'য়ে থাকতে।

শব্দশ্লেষের প্রকারভেদ দুটি—**সভঙ্গ** আর **অভঙ্গ**।

সভঙ্গের উদাহরণ বাঙলাসাহিত্যে বিরল; অভঙ্গের সুপ্রচুর।

(ক) **সভঙ্গ**: লেখক যদি এমন শব্দ প্রয়োগ করেন যাকে না ভাঙলে বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যাবে না, তাহ'লে হয় **সভঙ্গ শব্দশ্লেষ**।

একটি সহজ অথচ অতিসুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি,—সাহিত্য থেকে উদ্ধৃত নয়, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট থেকে সংগৃহীত। একটি পাদুকার দোকানের নাম

"শ্রীচরণেষু"

—ক্রেতার শ্রীচরণশরণ পাদুকাব্যবসায়ীকে করতেই হবে, অতএব **শ্রীচরণেষু** ('শ্রীচরণ' শব্দের উত্তর সপ্তমীর বহুবচন, বুঝি বা গৌরবে)। চমৎকার কাব্যিক নাম। শব্দের অভগ্ন অখণ্ড রূপ।

অথচ, এরই মধ্যে আসল কথাটিও রয়েছে অতিপ্রচ্ছন্নরূপে—শ্রীচরণেষু= শ্রীচরণে+'সু' (Shoe)। শব্দের ভগ্নরূপ। **সভঙ্গ**।

(i) "অপরূপ রূপ **কেশবে**
দেখ্ রে তোরা এমনধারা কালো রূপ কি আছে ভবে॥"
—দাশরথি।

—গানটি কৃষ্ণপক্ষ ও কালীপক্ষ দুই অর্থে রচিত। শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্বনিরসন এই গানের উদ্দেশ্য। কবি বলছেন, এমন অপরূপ কালো রূপ বিশ্বে আর নাই, নয়ন ভ'রে ওই রূপ দেখে নে। কালো রূপ কার? কৃষ্ণের এবং কালীর। এ অর্থ কেমন ক'রে পেলাম? কেশব=নারায়ণ বা কৃষ্ণ একথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু কালী? 'কেশব' শব্দটি ভেঙে একে কে+শব করলেই অর্থ স্পষ্ট হবে। **শবে** অর্থাৎ শবরূপী শিবের হৃদ্‌বিহারিণী অপরূপা ওই বামা কে?

(ii) "**কৃষ্ণসারের** পায় **কেশরী** করুণা চায়
তরল-আয়ত-আঁখি-পরসাদে মুগ্ধ।"—কবিশেখর কালিদাস।

—'কৃষ্ণসার' একরকম হরিণ; 'কেশরী' সিংহ। এই হ'ল প্রথম অর্থ। সেখানে অর্থ: **কৃষ্ণ** (শ্রীকৃষ্ণ) **সার যাঁর সেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত**; কেশরী' হলেন বেদান্তকেশরী মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। কাশীর অগ্রগণ্য অদ্বৈতবৈদান্তিক প্রকাশানন্দ-কর্তৃক শ্রীচৈতন্তের নিকট প্রেমধর্মে প্রার্থনার কথা। **'কৃষ্ণসার'-এ সভঙ্গ শ্লেষ**; 'কেশরী'-তে **অভঙ্গ**।

(iii) "আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে **মুলতানে**
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন…"—রবীন্দ্রনাথ ('রোগশয্যায়' থেকে)।

—**'মুলতান'** যখন **এককথা**, তখন এটি সঙ্গীতের **রাগিণীবিশেষের নাম**। উচ্চাঙ্গসঙ্গীততাত্ত্বিক কবি রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে টৌড়ী মেলের রাগ এই মূলতান প্রকৃতিতে পূরবীর নিকটবর্ত্তী ব'লে, এটিকে আলাপ করতে হয় সূর্য্যাস্তকালে ; তাই, 'দিনের শেষ ছায়াটুকু…'। 'মূলতান'-এর এই রাগিণী অর্থের কথা কবি নিজেই বলেছেন এই কবিতায়—'এই রাগিণীর করুণ আভাস'। কিন্তু এই অর্থই কবির একমাত্র কাম্য অর্থ নয়।

দ্বিতীয় এবং মূল্যবান্ অর্থটি মিলবে কথাটিকে ভাঙলে : **'মুলতান'=মুল+তান**। সেই তান, আনন্দের সেই অনাহত ছন্দঃস্পন্দ যা অবিরাম অনন্ত-বৈচিত্র্যময় গুঞ্জনে আত্মপ্রকাশ করছে বিশ্ববীণার রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শের তন্ত্রে তন্ত্রে, যাকে 'কোটিকে গুটিক' ভাগ্যবান্ দেখতে পেয়ে বলতে পারেন—

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।"

বিশ্বের সেই **মুল তান**কে পেয়েছেন কবি—এইটুকু আভাসে বুঝবে অনাগত কালের পথিক কবির **মুলতান**রাগের অর্থহীন গুঞ্জন থেকে, বলবে তারা—

"বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে বেঁচেছিল কেউ বুঝি,
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই তাই সে পেয়েছে খুঁজি।"

(খ) **অভঙ্গ** : শব্দকে না ভেঙে অর্থাৎ পূর্ণরূপে রেখেই একাধিক অর্থে যদি তার প্রয়োগ করা হয় তবেই হয় **অভঙ্গশ্লেষ**।

(i) "পূজাশেষে কুমারী বললে, 'ঠাকুর, আমাকে একটি মনের মত বর দাও'।"—শ. চ.

—বর=আশীর্ব্বাদ ; স্বামী।

[Pun-এর সঙ্গে অভঙ্গশ্লেষেরও কিছু মিল রয়েছে। "When a woman loses her husband, she pines for a second" (Second=মুহূর্ত্ত, দ্বিতীয় স্বামী) বাঙলা উদাহরণটির সগোত্র। এই অভঙ্গশ্লেষই আমাদের সাহিত্যে বেশী পাওয়া যায়।]

(ii) "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর ?"—গুপ্ত।

—কবি দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এই কবিতাংশটুকু রচনা করেছিলেন : (১) ভগবানের মহিমা- ও (২) নিজের মহিমা-প্রকাশ।

(১) যাঁর আলোতে সূর্য্য আলোকিত, যিনি বিশ্বব্যাপী, সেই ভগবান্‌কে কে বলে গুপ্ত ?

(২) ঈশ্বর (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) গুপ্ত (অখ্যাতনামা) কে বলে? প্রভাকর (গুপ্তকবি-সম্পাদিত পত্রিকা) তাঁরই প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশিত।

(iii) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।"—ভারতচন্দ্র।

[**অতি বড় বৃদ্ধ**=খুব বুড়ো; সকলের চেয়ে বৃদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী ও সম্মানিত। সিদ্ধি=ভাঙ; মুক্তি। কোন গুণ নাই তার=গুণহীন; সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণের অতীত। কপালে আগুন=পোড়াকপাল; শিবের ললাটবহ্নি, মদন যাতে ভস্ম হয়েছিলেন। কু=মন্দ; পৃথিবী। পঞ্চমুখ=অজস্র মন্দ কথা যখন বলেন, মনে হয় যেন এক মুখে নয় বুঝি পাঁচ মুখে বলছেন; শিবের অপর নাম পঞ্চানন, যেহেতু তাঁর পাঁচ মুখ। কণ্ঠভরা বিষ=কথায় বিষের মতো জ্বালা; সাগরমন্থনে বিষ উঠলে সৃষ্টিরক্ষার জন্য শিব তা পান করেছিলেন ব'লে তাঁর নাম নীলকণ্ঠ—বিষের নীলবর্ণে তাঁর কণ্ঠ নীল। দ্বন্দ্ব=ঝগড়া, মিলন। ভূত= সারাদিন বাড়ীতে এমনি উপদ্রব করে মনে হয় যেন **ভূত নাচিয়ে** বেড়াচ্ছে (বাঙলা idiom); প্রেত বা প্রমথ শিবের অনুচর (**সৃষ্টিও** হ'তে পারে: ভূ+ ভাববাচ্যে ক্ত)। না মরে=মরলে আপদ্ যায়, হাড়ে বাতাস লাগে, কিন্তু এমনি কপাল যে মরেও না; অমর। পাষাণ বাপ=নিষ্ঠুর পিতা; পার্ব্বতীর পিতা পাষাণকায় হিমাচল ("দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ")।]

কবিতাংশটি ঈশ্বরী পাটনীর কাছে অন্নদা (দুর্গা)-র কৌশলে আত্মপরিচয়। **এটি ব্যাজস্তুতিরও চমৎকার উদাহরণ।**

(iv) "এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজ**গুণে**"—মুকুন্দরাম।

—সুন্দরীরূপিণী চণ্ডী আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে কালকেতুর পত্নী ফুল্লরাকে বলছেন। গুণে=স্বভাবের চমৎকারিত্বে; ধনুকের ছিলায় (স্বর্ণগোধারূপিণী চণ্ডীকে ব্যাধ কালকেতু ধনুকের ছিলায় বেঁধে বন হ'তে বাড়ী এনেছিল)।

কবিকঙ্কণরচিত চণ্ডীর আত্মপরিচয়টি শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারে মণ্ডিত।

(অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও ব'লে রাখি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদার আত্মপরিচয়' মুকুন্দরামের প্রবল প্রভাবের ফল)।

(v) "কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বোঝা ভার।
সে বোঝে **অক্ষর কালী** হৃদে আছে যার ॥"—রামপ্রসাদ।

—'অক্ষর কালী'=(১) সনাতনী কালিকা; (৩) কালীর আঁখর অর্থাৎ বিদ্যা। (কালীকিঙ্করের=রামপ্রসাদের)

(vi) "দেখ নাকি, হায়, বেলা চ'লে যায়, সারা হয়ে এল দিন।
বাজে **পূরবীর** ছন্দে **রবির** শেষ রাগিণীর বীণ।"—রবীন্দ্রনাথ।

(১) 'পূরবী'=গোধূলির রাগবিশেষ; 'রবি'=সূর্য্য।

(২) 'পূরবী'='পূরবী'-নামক কাব্যগ্রন্থ; 'রবি'=রবীন্দ্রনাথ।

'পূরবী' কাব্যের প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স চৌষট্টি বৎসর।

(vii) "পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব, পড়ি যায় শেখা
সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে; আছে কি কি **বীজ**
কবিত্ব-**কলায়**; শেলি গেটে কোলরীজ
কার কোন্ শ্রেণী..."—রবীন্দ্রনাথ।

(১) 'বীজ'=মূল সূত্র; 'কলা'=শিল্প। (২) 'বীজ'=বীচি (seeds); 'কলা'=কদলী। উক্তিটি বিদ্রূপাত্মক।

(viii) "একদিন রাত্রে, যদিও সেটা শুক্লপক্ষ নয়, **জ্যোৎস্না** আমারই ঘরে এসে দাঁড়ালো।"—অচিন্ত্যকুমার।

—জ্যোৎস্না—(১) একটি মেয়ের নাম; (২) চাঁদের আলো।

এইবার যে উদাহরণগুলি দিচ্ছি শ্লেষের ভূমিকা সেখানে গৌণ, কারণ অন্য অলঙ্কারের সে অঙ্গীভূত। গৌণ হ'য়েও আপন শক্তি আর সৌন্দর্য্যে সে দীপ্তিমান্। শ্লেষের সভঙ্গ অভঙ্গ দুই রূপই এখানে পাব।

(i) "ঋতুতে ঋতুতে মহাকবি কাল নির্ভুল নিয়মে তাঁর **ঋতুসংহার** কাব্য রচনা ক'রে চলেন।"—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

—'কাল'-এর উপর 'মহাকবি' আরোপিত হওয়ায় যে রূপক অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে, বর্ত্তমান আলোচনায় আমাদের দৃষ্টিকে সে দিক্ থেকে সরিয়ে রাখছি। আমাদের দৃষ্টি এখানে কেন্দ্রীভূত **'ঋতুসংহার'** কথাটিতে, যা নারায়ণের কল্পনাকে করেছে লীলাচঞ্চল। মহাকবি কালের উপর মহাকবি কালিদাসকে আরোপিত করেছে 'ঋতুসংহার', ব্যঞ্জনার পথে দুই কবিরই কাব্যের

বিষয়বস্তু 'ঋতু'। কালিদাস ঋতুকে **'সংহার'** করেছেন—ঋতুপরম্পরাকে **সঙ্কলন** করেছেন, সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যের সূত্রে ঋতুপরম্পরার **মালা গেঁথেছেন** ; 'কাল' ঋতুকে **'সংহার'** ক'রে চলেছেন—ঋতুপরম্পরার রসরূপকে **ধ্বংস** ক'রে চলেছেন ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কলেরা বসন্ত আমাশয়রূপ মহামারী দিয়ে। যাই হোক, দুই কাব্যই যে **'ঋতুসংহার'** তাতে সন্দেহ নাই। এইখানে শ্লেষের খেলা এবং এই খেলার ফলশ্রুতি **ব্যঙ্গ্যরূপক** অলঙ্কার।

(ii) "বাসরঘরে বর এবং পাঠকসভায় লেখকের প্রায় একই দশা। **কর্ণ**মূলে অনেক কঠিন কৌতুক উভয়কে নিঃশব্দে সহ্য করিতে হয়।"—রবীন্দ্রনাথ।

'কর্ণ'=(১) চর্ম্ম-মাংস-উপাস্থিময় প্রত্যঙ্গ ; (২) শ্রবণেন্দ্রিয়। "কঠিন কৌতুক" বরের 'কর্ণ'পক্ষে **মর্দ্দন** এবং লেখকের 'কর্ণ'পক্ষে **নিন্দাবিদ্রূপ**। 'কঠিন কৌতুক'-এ শ্লেষ নাই ; **'কর্ণ'** কথাটির অর্থ **শ্লিষ্ট**। 'প্রায়' কথাটি অভেদ-আরোপে বাধা দেওয়ায় বর আর লেখক রূপক হ'তে পারল না। আবার উপমার লক্ষণ স্পষ্ট নয় ব'লে সাধারণ উপমাও বলা গেল না। কিন্তু **উপমাই** ; কর্ণমূলক কঠিন কৌতুক নিঃশব্দে সহ্য করার মধ্যে সাধারণধর্ম্মের ব্যঞ্জনা। 'কঠিন কৌতুক'-এর স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করেছে 'কর্ণ'-ঘটিত শ্লেষ। **শ্লেষগর্ভ ব্যঙ্গ্য উপমা**।

একটা কথা এইখানে ব'লে রাখি। এই বিশেষভাবের শব্দশ্লেষ অলঙ্কারের কার্য্যকলাপ বুঝতে হ'লে আগে অর্থালঙ্কারের সঙ্গে একটু পরিচয় দরকার।

(iii) "ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-**মানস**-হংস) কহিলা মহীরে।"—মধুসূদন।

—**'মানস'**=(১) মন ; (২) মানসসরোবর। চিন্তামণি (বিষ্ণু) যোগীন্দ্রের ধ্যানের ধন ; এইখানে 'মানস' কথাটির 'মন' অর্থের সার্থকতা। কিন্তু চিন্তা-মণির উপর 'হংস' আরোপিত হওয়ায় অলঙ্কার হয়েছে **রূপক**। 'হংস' মানসে (মনে) বিহার করে না, করে সরোবরে। এখানে সেই সরোবরের নাম পুণ্যতীর্থ 'মানস', কারণ 'হংস' নারায়ণ। মনবাচক 'মানস' (বিষয়) গ্রস্ত হয়েছে সরোবরবাচক 'মানস'-কর্ত্তৃক—অলঙ্কার **অতিশয়োক্তি**। 'মানস'-ঘটিত শব্দশ্লেষ এই অতিশয়োক্তির মূলে।

(iv) "রবি-**রশ্মি**-গ্রথিত দিন-রত্নের মালা"—রবীন্দ্রনাথ।

—**'রশ্মি'**=(১) কিরণ ; (২) রজ্জু, এখানে সূত্র। 'দিন'-সম্পর্কে 'রশ্মি' কিরণ অর্থে সার্থক ; কিন্তু যখনই দিনের উপর রত্নের আরোপে রূপক এসে

ঐ রত্নের মালা গাঁথতে চেয়েছে, তখনই 'রশ্মি' শ্লিষ্ট হ'য়ে 'সূত্র' অর্থ নিয়ে তাকে সাহায্য করেছে। **অলঙ্কার শ্লেষগর্ভ রূপক।**

(৮) "তৃতীয় দশকের শেষবৈশাখে **কল্লোলের** কলধ্বনি শোনা গেল বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায়।"—জগদীশ ভট্টাচার্য্য।

—**'কল্লোল'**=(১) 'কল্লোল'-নামক বাঙলা মাসিক পত্রিকা; (২) মহাতরঙ্গ (বড় ঢেউ)। 'বাঙলা সাহিত্যে'র সূত্রে 'কল্লোল' পত্রিকার অর্থে সার্থক; 'কলধ্বনি'-সূত্রে 'কল্লোল' 'মহাতরঙ্গ' অর্থে সার্থক। আবার 'কলধ্বনি' কথাটির ব্যঞ্জনায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে জগদীশ পত্রিকা 'কল্লোলে'র উপর মহাতরঙ্গার্থক 'কল্লোল'-কে আরোপ ক'রে সৃষ্টি করেছেন **শব্দশ্লেষ-অনুপ্রাণিত ব্যঙ্গ্য রূপক অলঙ্কার।**

৩। *পুনরুক্তবদাভাস*

কোনো বাক্যে **একই অর্থে** একের বেশী শব্দ **বিভিন্নরূপে** ব্যবহৃত হয়েছে ব'লে যদি মনে হয়, কিন্তু একটু মন দিলেই যদি দেখা যায় যে তারা একই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, তাহ'লে যে অলঙ্কার হয় তার নাম **পুনরুক্তবদাভাস**।

'পুনরুক্ত' মানে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি: নদী, নদী। **'পুনরুক্তবৎ'** ('বৎ'=মতো) মানে শব্দের প্রতিশব্দরূপে আবৃত্তি: নদী, তটিনী। **'আভাস'** মানে দেখতে প্রতিশব্দরূপে পুনরাবৃত্তির মতন, কিন্তু অর্থ বিভিন্ন।

(i) সহসা **জলেশ পাশী** অস্থির হইলা—মধুসূদন।

—'জলেশ' আর 'পাশী' দুটিরই অর্থ বরুণ। কিন্তু 'পাশী' কথাটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে **'পাশ' (অস্ত্রবিশেষ) আছে যাঁর** এই অর্থে। 'জলেশ পাশী'=পাশ অস্ত্রের অধিকারী বরুণদেব।

(ii) "**তনু দেহটি** সাজাব তব আমার আভরণে"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "**তনু দেহ**খানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ী"— ঐ

—'তনু' আর 'দেহ' অর্থে এক; কিন্তু এখানে তা নয়। এখানে **'তনু'**= **ছিপছিপে।**

কিন্তু, "**তনু** তোমার **তনু**লতা চোখের কোণে চঞ্চলতা" (রবীন্দ্রনাথ)। এখানে কিন্তু একই 'তনু'-র পুনরুক্তি বিভিন্ন অর্থে; অলঙ্কার তাই **যমক।**

(iv) "**ত্রিযামা যামিনী** একা ব'সে গান গাহি,
হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'ত্রিযামা', 'যামিনী' দুইয়েরই অর্থ রাত্রি। 'যাম' মানে প্রহর। কবি এখানে 'ত্রিযামা' কথাটি প্রয়োগ করেছেন 'রাত্রি' অর্থে নয়, **তিনপ্রহর ধ'রে** এই অর্থে। যামিনীর (রাত্রির) তিনটি প্রহরই অর্থাৎ **সারা** রাত্রিই (যামিনী) গান গাই—এই হ'ল বাক্যার্থ।

(v) "বসন্ত বিদায় আজ সভাপতি **দ্বিজরাজ**
সুধাকরে করে তার শেষ সম্ভাষণ।"

—স্বভাবকবি গোবিন্দদাস।

—দ্বিজরাজ=চন্দ্র ; সুধাকর=চন্দ্র। এখানে **সুধাকর** চন্দ্র নয়, সুধাময় কর অর্থাৎ কিরণ—সুধাময় কর দিয়ে দ্বিজরাজ (চন্দ্র) আজ বসন্তের (মহাপ্রয়াণ-পথযাত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের) শেষ সম্ভাষণ করছেন।

আবার, **'সুধাকরে করে' যমক**।

৪। যমক

দুই বা তার বেশী ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসমেত নির্দ্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থক-ভাবে ব্যবহৃত হ'লে **যমক** অলঙ্কার হয়।

(১) **'সার্থক' বা 'নিরর্থক'** বলার তাৎপর্য্য এই যে আবৃত্ত (repeated) বর্ণগুচ্ছের অর্থ (i) থাকতে পারে, (ii) নাও থাকতে পারে, (iii) একটি অর্থযুক্ত অপরটি অর্থহীন হ'তে পারে।

(২) **'নির্দ্দিষ্ট ক্রম'** মানে 'রাধা' যদি 'ধারা'-রূপে আবৃত্ত হয় অর্থাৎ বর্ণাবলীর বিন্যাসক্রমটি যদি পরিবর্ত্তিত হয়, যমক হবে না।

(৩) **'স্বরধ্বনিসমেত'** বলার কারণ এই যে 'পঞ্জর-পিঞ্জর' যমক নয়, অনুপ্রাস।

ধ্বন্যালোক কবিকে বলেছেন, 'বাপুহে, কাব্যে রসবন্ধনের ইচ্ছা যদি থাকে, যমকটিকে বাদ দিয়ো—অমন কৃত্রিম অলঙ্কার আর নাই।' কিন্তু যমক হ'লেই যে সে কৃত্রিম হবে একথা বলা চলে না। এমন উৎকৃষ্ট কবিতা সংস্কৃতে যথেষ্ট রয়েছে, যাতে যমক রসের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায় নাই। যমক কৃত্রিম হয় তখনই যখন কবি কোমর বেঁধে বসেন যমক তৈরী করতে। একটি ভগবতী-স্তোত্র থেকে গুটিদুই চরণ উদ্ধৃত ক'রে দিই—

"শ্রিতরজনীরজনীরজনীরজনীরজনীকরবক্ত্রবৃতে,
সুনয়নবিভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরভ্রমরাধিপতে"...।

দেবী জ্ঞানরূপা; তিনি এর মানে বুঝেছেন, ভক্তকবিকে বরও নিশ্চয় দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সসেমিরা অবস্থা। বড় কবিদেরও এমন বদ-খেয়াল চাপে, যেমন বিদ্যাপতির—

"**সারঙ্গ** নয়ন বচন পুন **সারঙ্গ**
সারঙ্গ তসু সমধানে।
সারঙ্গ উপর উগল দশ **সারঙ্গ**
কেলি করই মধুপানে ॥"

কবিতা নয়, সারঙ্গরঙ্গশালা! সোজা কথায়, রাধার—

'নয়নে **হরিণী** বচনে **কোকিল** অপাঙ্গে **ফুলশর**,
কমলের বুকে মধু পিয়া তার খেলে দশ **মধুকর**।'—শ. চ.

অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষবক্রোক্তি প্রভৃতির উপর মানুষমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক টান আছে। কবিরাও মানুষ। নানা কারণে তাঁরা কাব্যে এদের প্রয়োগ করেন। সীমার মধ্যে থাকলেই এরা সুন্দর, সীমা ছাড়িয়ে গেলেই অসুন্দর। রবিকাব্যে এদের অজস্র প্রয়োগ দেখতে পাই। অতি-আধুনিকদের কাব্যও বাদ যায় না। উদাহরণে এর প্রমাণ মিলবে।

অলঙ্কার-চন্দ্রিকার প্রথম সংস্করণে 'নিরর্থক' যমক-সম্পর্কে বলেছিলাম—অনুপ্রাস স্বরের অসাম্যেও হয়, সাম্যেও হয়। কাজেই আমাদের উদাহরণটিকে ('বঁধুর মধুর মনোহর রূপ'—ধুরম, ধুবম) ছেকানুপ্রাস বলব না কেন? এবার আর প্রশ্ন নয়; একে **ছেকানুপ্রাসই বলব**।

মন্তব্য: বাঙলায় অলঙ্কার-সম্বন্ধে যে দুইএকখানি বই আছে, তাতে **আদ্য-মধ্য-অন্ত্য- এবং সর্ব্ব**-ভেদে চার রকমের যমকের কথা বলা হয়েছে।

(i) "**ভারত ভারত**খ্যাত আপনার গুণে"
(ii) "পাইয়া **চরণতরি তরি** ভবে আশা"
(iii) "মনে করি **করী করি** কিন্তু **হয় হয়**।"
(iv) "আটপণে আধসের কিনিয়াছি **চিনি**।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি **চিনি**"

এবং (v) "**কান্তার আমোদপূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে** ॥"

সর্ব্বত্রই গৃহীত হয়েছে যথাক্রমে এই উদাহরণগুলি (তৃতীয়টি ছাড়া)।

[শেষেরটির অর্থ—কান্তার=বনভূমি, দয়িতার; আমোদ=সৌরভ, আনন্দ; কান্ত=বসন্তকাল, প্রেমাস্পদ; সহকারে=সমাগমে, সঙ্গে। প্রথম চক্রবৃদ্ধি—

বনভূমি বসন্তসমাগমে সৌরভপূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় পঙ্ক্তি—দয়িতা প্রিয়সঙ্গে আনন্দিতা হয়েছেন।]

প্রথমটিতে একই চরণে আদ্য যমক, দ্বিতীয়টিতে একই চরণে মধ্য যমক, তৃতীয়টিতে একই চরণে অন্ত্য যমক ('হয়'—ঘোড়া, 'হয়'—ক্রিয়াপদ) এবং মধ্য যমক ('করী'—হাতী, 'করি'—ক্রিয়াপদ) আর চতুর্থটিতে দুচরণে অন্ত্য যমক। পঞ্চমটিতে দ্বিতীয় চরণটি প্রথম চরণের পুনরাবৃত্তি—সর্ব্বযমক।

(ক) **সার্থক** (সার্থক হ'লে শব্দগুলিকে বিভিন্নার্থক হ'তে হবে):

(i) "প্রভাকর **প্রভাতে প্রভাতে** মনোলোভা"—ঈশ্বর গুপ্ত।

—প্রভাতে—প্রাতে ; প্রভাতে (প্রভা-তে)—জ্যোতিতে।

(ii) "অসম্বর **অম্বর অম্বর** পড়ে শিরে"—রামপ্রসাদ।

—অম্বর—বস্ত্র ; অম্বর—আকাশ।

(iii) "নিরমল **নিরাকার নীরাকার** নয়"—ঈশ্বর গুপ্ত।

—যথাক্রমে, আকারহীন আর জলাকার।

(iv) "আবরিছে দিননাথে **ঘন ঘন**রূপে"—মধুসূদন।

—নিবিড় ; মেঘ।

(v) "**মুরারি**মুরলীধ্বনিসদৃশ **মুরারি**"—মধুসূদন।

—প্রথমটি শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিতীয়টি 'অনর্ঘরাঘব'-রচয়িতা কবি।

(vi) "সর্ব্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে ; শুধু মন্ত্র-উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর **ক্রিয়াকর্ম্ম**-জ্ঞান!"—রবীন্দ্রনাথ।

—ক্রিয়াকর্ম্ম—আচার-অনুষ্ঠান ; ক্রিয়াকর্ম্ম—ক্রিয়াপদ-কর্ম্মকারক।

(vii) "**ঘন** বনতলে এসো **ঘন**নীলবসনা"—রবীন্দ্রনাথ।

—ঘন—নিবিড় ; ঘন—মেঘ (মেঘের মতন নীল—'ঘননীল')।

(viii) "**রক্ত**মাখা অস্ত্রহাতে যতো **রক্ত**আঁখি"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "**চাহি** না **চাহি**তে আর কারো প্রতি"—রবীন্দ্রনাথ।

(x) "কবির রমণী বাঁধি কেশ**পাশ**
বসি একাকিনী বাতায়ন**পাশ**"—রবীন্দ্রনাথ।

—এটিতে অন্ত্যযমক।

(xi) "আশার স্বপন **ফলে** কি হোথায় সোনার **ফলে**?"—রবীন্দ্রনাথ।

প্রথমটি ক্রিয়াপদ (নামধাতু) ; দ্বিতীয়টি বিশেষ্য।

(xii) "**অর্থ** চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি ;
রাজস্বপ্নে **অর্থ** নাই যত মাথা খুঁড়ি।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "**অর্থ** তোমার বুঝে কেবল লোকে,
তোমার **অর্থ** বুঝবে বলো কবে।"
—যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

(xiv) "সত্য কথাই বলি,
বড়লোক যারা—খেতে বলে কেউ ? মিছে এত **বড়** হলি।"
—যতীন্দ্রমোহন।

(xv) "**জীবে** দয়া তব পরম ধর্ম্ম, '**জীবে**' দয়া তব কই ?"
—কবিশেখর কালিদাস।

—রূপ গোস্বামীর প্রতি সনাতন গোস্বামীর উক্তি। ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীকে শ্রীরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন ; উক্তির উপলক্ষ এই। দ্বিতীয় 'জীব' জীব গোস্বামী।

(xvi) "আঁধারের **কালি কালি**র লিখন একাকার করি দিল"
—মোহিতলাল।

(xvii) "ভোজন কর **কৃষ্ণজীরে,** ভজন কর **কৃষ্ণজীরে**"—দাশরথি।

—শ্রীকৃষ্ণের ভারি অসুখ ; শ্রীকৃষ্ণই আবার যাচ্ছেন কবিরাজ সেজে তাঁর চিকিৎসা করতে। বৃন্দার সঙ্গে পথে কবিরাজমশায়ের দেখা। বৃন্দার আবার এক ব্যারাম হয়েছে—সবই তিনি কালো দেখছেন। কবিরাজ তাঁকে বাতলে দিলেন ওষুধ। **'কৃষ্ণজীরে' কালোজীরে** (সত্যই বায়ুনাশক) ; **কৃষ্ণজীরে** = **কৃষ্ণজী-রে** (-কে) = **শ্রীকৃষ্ণকে**।

(xviii) "আর কি শুধু **আসার আশায়** ভুলি ?"
—কবিশেখর কালিদাস।

(xix) "পেয়েছে সে
নবঘন**শ্যাম শ্যামে** তার"—যতীন সেন।

—'শ্যাম' বর্ণ ; 'শ্যাম' শ্রীকৃষ্ণ।

(xx) "ধানের **শীষে** আগুনের **শীষ**—সমস্ত মাঠ ভ'রে গেছে এখন সোনার আমেজে"—অচিন্ত্যকুমার।

(xxi) "**আসা** তার পাপ্‌ড়িতে পাপ্‌ড়িতে খোলে **আশা**"—বিষ্ণু দে।

(xxii) "**পুরনারী** না হ'লেও নারীর স্বভাবে [illegible]গা **নারী**"
—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

মন্তব্য : 'আসা-আশা', 'পুরনারী-পুরো নারী', **'স-শ' 'র-রো'-সত্ত্বেও যমক**। বাঙলায় বর্ণধ্বনির সাম্যবিচার বহুক্ষেত্রে চলে তার প্রকৃতিগত উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পথে। এর বিশদ আলোচনা ক'রে এসেছি **অনুপ্রাস-প্রসঙ্গে**। আমাদের 'শষস' সবই উচ্চারণে **'শ'** (sh)। বাঙলা শব্দের **অন্ত্য 'অ'**ধ্বনি যেখানে উচ্চারিত, সেখানে প্রায় সবক্ষেত্রেই তার উচ্চারণ ও-বৎ—'পুরনারী' উচ্চারণে স্বভাবতঃই **'পুরোনারী'**। সুতরাং সংজ্ঞার 'স্বরধ্বনিসমেত' লক্ষণটি এখানে মিলছে না, একথা মনে করা ভুল। তারপর **'শ্যাম-শ্যামে', 'শীষে-শীষ' :** শ্যামে=শ্যাম (+'এ' বিভক্তিচিহ্ন), শীষে=শীষ (+'এ' বিভক্তিচিহ্ন)। বিভক্তিচিহ্ন স্বরধ্বনির বৈষম্য ঘটিয়েছে। এ অবস্থায় **যমক না ব'লে অনুপ্রাস** বলাই উচিত ছিল। কিন্তু অনুপ্রাস বলা চলে কি ? **চলে না**। চলে না এই কারণে যে অনুপ্রাসজনিত আনন্দের উৎস শুদ্ধ বর্ণধ্বনির সাম্য আর **সার্থক যমকে** আনন্দ **ধ্বনিসাম্য এবং অর্থ-বিভিন্নতার মিলন** হ'তে উৎসারিত। এখন, যে যমকও হচ্ছে না আবার অনুপ্রাসও হচ্ছে না, অথচ একটা কিছু হচ্ছে এবং তা সুন্দর, সেই 'শ্যাম-শ্যামে' 'শীষে-শীষ'কে কি বলব ?

বলব—**যমকই**।

আমরা বলছি **সার্থক** যমকের কথা। **বর্ণগুচ্ছের অর্থ থাকলে সে** আর শুধু বর্ণগুচ্ছ নয়, **প্রাতিপদিক**। এই প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভক্তি যোগ হ'লে, তার নাম হয় পদ। বাঙলায় বিভক্তিচিহ্ন সকল পদে দেখা যায় না। আমাদের 'শ্যাম', 'শীষ' এমনি চিহ্নহীন পদ ; 'শ্যামে' 'শীষে' বিভক্তিচিহ্নযুক্ত পদ। কোনো শব্দালঙ্কারে বিভক্তি যদি বাধা সৃষ্টি করে, সেখানে অলঙ্কারত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হয় বিভক্তিচিহ্নকে উপেক্ষা ক'রে প্রাতিপদিককে পূর্ণমূল্য দিয়ে। 'ধানের শীষে আগুনের শীষ' শুনলেই মন দেখতে পায় বিভিন্ন অর্থ নিয়ে 'শীষ' শব্দটার খেলা, বিভক্তিচিহ্ন চোখেই পড়ে না। বাঙলায় এই পথে চলতে হবে। একে **'লাটানুপ্রাস'** বলা অসম্ভব ; কারণ এ অনুপ্রাসে হয় **অর্থসমেত শব্দের পুনরাবৃত্তি ; অর্থের একটু পার্থক্য হয় তাৎপর্য্যে :**

"নয়ানের কাজল বয়ানে লেগেছে **কালোর** উপরে **কালো**"— চণ্ডীদাস।

এখানে দ্বিতীয় 'কালো'টি কালো-ই (Black)। **তাৎপর্য্য নিবিড় কালো** (যেহেতু কাজল)। এখানে লাটানুপ্রাস, যমক নয়। **আমাদের উদাহরণে অলঙ্কার যমক**। এমনি আরও কয়েকটি উদাহরণ :

(xxiii) **"মজল** কঁ॥ তিনি **মজলের** দেশে।"—**ঈশ্বর গুপ্ত**।

'তিনি'—বেদানা। দ্বিতীয় **'মজল'** মঙ্গোলীয় জাতি।

(xxiv) '**সংসারে** সবই **সং, সার** ব'লে কিছুই নাই।'—শ. চ.

(xxv) "মানস**সরসে**

সরস কমলকুল বিকশিত যথা।"—মধুসূদন।

(xxvi) "**চন্দ্রহারে চন্দ্রের হার**" —বঙ্কিমচন্দ্র।

(xvii) "কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হ'লে তিনি **বিদ্যাসুন্দর** রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে **বিদ্যা ও সুন্দরের** অপূর্ব মিলন সংঘটিত হ'ত।"

—বীরবল।

(xviii) "আমার **সুবাদে**! দেখি আজ থেকে সমস্ত **সু বাদ** দিলাম দিদি"—অচিন্ত্যকুমার।

(খ) **একটি সার্থক অন্যটি নিরর্থক ঃ**

(i) "তারার যৌ**বন-বন**-ঋতুরাজ তুমি"—মধুসূদন।

(ii) "যৌ**বনের বনে** মন হারাইয়া গেল"—জ্ঞানদাস।

(iii) "করেছ ভ্রমণ মম যৌ**বন-বনে**"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "ভীষণ অশনিসম প্রহ**রণে রণে**"—মধুসূদন।

(v) "কালা**গুরুর গুরু** গন্ধ লেগে থাকতো সাজে"—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "গলায়ে গলায়ে বা**সনার সোনা**"— ঐ

(বাঙলা উচ্চারণগত ধ্বনিসাম্য)

(vii) "মা**সীমার সীমা**তেও আমি আসিনি।"—অচিন্ত্যকুমার।

(viii) "প্রবীণ প্রা**চীন চীন**" —রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "নানা বেশভূষা হীরা রুপাসোনা

এনেছি পাড়ার করি উপাসনা।"— ঐ

(র্+**উপাসনা, উপাসনা**)

মন্তব্য ঃ মনে রাখতে হবে যে পদ্যে অন্ত্যযমক দুই চরণের অন্ত্যপদ নিয়ে সৃষ্ট হ'লে, পদদুটি সহজেই অন্ত্যানুপ্রাসও হ'য়ে যায়—

"যাইতে মানস-**সরে**

কার না মানস **সরে**?"

এখানে 'সরে-সরে' একাধারে যমক আর অন্ত্যানুপ্রাস দুইই। আমাদের এই (ix) উদাহরণটিতে অন্ত্যানুপ্রাস এবং 'নিরর্থক-সার্থক' লক্ষণের অন্ত্যযমক দুটিই বর্ত্তমান।

(x) "**ঝলের ঝলমলে** চরণ টলমল"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(xi) "নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার **পরশ-রস**তরঙ্গে"—রবীন্দ্রনাথ।

(xii) "**পরশে** তার **রসে** তরুণ বাসি ফুলের হার"—করুণানিধান।

(xiii) "**আরণ্য**-আশ্রম নেই, কিন্তু তার জায়গা জুড়েচে সা**ধারণ্য**-আশ্রম। এখন দেশে **আরণ্যক** পাওয়া যায় না, কিন্তু সা**ধারণ্যকের** সংখ্যা কম নয়।"

(**আরণ্য**, সাধ্+**আরণ্য** ; **আরণ্যক**, সাধ্+**আরণ্যক**)

(xiv) "আছি গো তা**রিণী ঋণী** তব পায়"—দাশরথি।

(xv) "শে**ফালি** রায়ের সঙ্গে আমার এক **ফালি**ও পরিচয় নেই"

—অচিন্ত্যকুমার।

বাঙলায় একই শব্দের ভিন্নার্থে দুই বা ততোধিকবার আবৃত্তি যমক ব'লে মানা হয়। শাস্ত্রের জটিলবিচারমূলক সূক্ষ্ম বিভাগ বাঙলা যমকে আমরা কতকটা পরিহার ক'রেই চলি। আদ্য, মধ্য, সর্ব্বরূপ যমকভেদ ছাড়াও একজাতীয় যমক আমাদের এককালে খুব প্রিয় ছিল। দাশরথি, নীলকণ্ঠ, ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র এইপ্রকার যমকসৃষ্টির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা মাত্র **দাশরথির** রচনা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম :

(i) "(আমার) কাজ কি গোকুল ? কাজ কি গো কুল ?
ব্রজকুল সব হোক প্রতিকূল..."

(ii) "কাজ কি বাসে ? কাজ কি বাসে ?
কাজ কেবল সেই পীতবাসে
সে যার হৃদয়ে বাসে
সে কি বাসে বাস করে ?"

(iii) "বাছা করে সর সর পাপিনী বলে সর সর
অবসর হয় না সর দিতে।
সর সর ক'রে ত্রিভঙ্গ হয় বাছার স্বরভঙ্গ
বাক্যশর হানে আবার তাতে ॥"

যমকের সঙ্গে Pun (Paronomasia)-এর **কতকটা** মিল আছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি :—

"In cards a **good deal** depends on good playing and good playing depends on a **good deal**." প্রথম good deal = much ; দ্বিতীয় good deal = good distribution of cards।

৫। বক্রোক্তি

কোনো কথার যে অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত, সে অর্থটি না ধ'রে শ্রোতা যদি তার অন্য অর্থ গ্রহণ করে, তবে **বক্রোক্তি** অলঙ্কার হয়।

(i) 'বক্তা—আপনার কপালে **রাজদণ্ড** আছে।
শ্রোতা—নিশ্চয়ই, আইন অমান্য ক'রে ছমাস খেটেছি, সশস্ত্রবিপ্লবে এখন বছরকতক খাটব।'—শ. চ.

[বক্রোক্তির এই রূপটিও Pun-এর রূপবিশেষের সঙ্গে মেলে :

Q. Can a leopard change its *spot* ?

A. Yes, when it goes from one place to another.

Spot = mark, place.]

শ্লেষ ও **কাকু** ভেদে বক্রোক্তি দুরকম।

(ক) শ্লেষবক্রোক্তি :

একই শব্দে নানা অর্থ গ্রহণের নাম শ্লেষ। এইজাতীয় শব্দের অর্থগত বৈচিত্র্যের উপর যে বক্রোক্তি নির্ভর করে, তার নাম **শ্লেষবক্রোক্তি**।

আমাদের (i)-চিহ্নিত উদাহরণটি শ্লেষবক্রোক্তির।

(ii) "প্রশ্ন—দ্বিজ হ'য়ে কেন কর বারুণী সেবন?
উত্তর—রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।
প্রশ্ন—বিপ্র হ'য়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয়?
উত্তর—সুরে না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয়?"—অজ্ঞাত।

—প্রশ্নকারী 'দ্বিজ' ব্রাহ্মণ অর্থে এবং 'বারুণী' মদ্য অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ 'দ্বিজ' চন্দ্র অর্থে এবং 'বারুণী' পশ্চিমদিক্ অর্থে উত্তর

...রীর অভিপ্রায়—বামুন হ'য়ে মদ খাচ্ছ কেন? ব্রাহ্মণের উত্তর—সূর্য্য ...না। তাই চাঁদ পশ্চিমে ডুবছে।

...তক দেখে প্রশ্নকর্তা পুনরায় ভাষান্তরে যে প্রশ্ন করলেন, তাতেও মুস্কিল ...সক্ত' শব্দটি নিয়ে :

...রীর অভিপ্রায়—সুরা+আসক্ত;

...র গৃহীত অর্থ—সুর+আসক্ত।

... "শতজীব বিস্তারত্ন—দাও, তুমি **সিদ্ধ** পুরুষ।

দাশরথি রায়—ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যখন পাঁচালির দল
করিয়াছি, তখন সিদ্ধ বই আর কি? আপনারা আতপ,
আমি আর এ জন্মে আতপ হইতে পারিলাম না।"

—চন্দ্রশেখর কর-লিখিত দাশরথি রায়।

—বিদ্যারত্ন 'সিদ্ধ' শব্দটি তপঃসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন; দাশরথি সিদ্ধ চাউলে 'সিদ্ধ' যে অর্থে ব্যবহৃত সেই অর্থ ধ'রে উত্তর দিয়েছিলেন। সিদ্ধ ও আতপ চালে পবিত্রতার দিক্ দিয়ে যে পার্থক্য, তাঁতে এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণে সেই প্রভেদ এই কথাই বলেছিলেন।

(এযুগে অনেকের হয়তো জানা না থাকতে পারে যে হিন্দুর কাছে আতপ চাউল পবিত্র, সিদ্ধ চাউল তা নয়।)

[উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর অভিপ্রায় বুঝেই ইচ্ছা ক'রে বাঁকা পথে চলেন—উদ্দেশ্য কৌতুকসৃষ্টি। এই কথাটি মনে রাখা দরকার।]

(খ) কাকুবক্রোক্তি:

এই অলঙ্কারটি বক্তার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীর উপর নির্ভর করে (কাকু=স্বরভঙ্গী)। এতে কণ্ঠধ্বনির বিশেষ ভঙ্গীর ফলে নিষেধ (negation) বিধি (affirmation)-তে এবং বিধি নিষেধে পর্য্যবসিত হ'য়ে শ্রোতার দ্বারা গৃহীত হয়।

(i) "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?"—মধুসূদন।

—কেউ ছেঁড়ে না: পর্ণই (পাপড়ি) হ'ল পদ্মের সর্ব্বস্ব; এই সর্ব্বস্ব থেকে পদ্মকে বঞ্চিত করবে এমন নিষ্ঠুর কেউ নাই, জিজ্ঞাসার এই অর্থ ই পাওয়া যাচ্ছে। নিরাভরণা সীতার প্রতি সরমার উক্তি।

(ii) "………দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপানলোভে?"—

(iii) "বজ্রে যে জন মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কেবা করে?'

—যতী একটা

যে উদাহরণগুলি আমরা উদ্ধৃত করলাম, তার সঙ্গে Erotesis-এর
মিল রয়েছে। ind good

"Shall we, who struck the Lion, shall we h; দ্বিতীয়
Pay the Wolf homage?"—Byron, ঐরকমই (iii)

বিশ্বনাথ যে উদাহরণটি দিয়েছেন, তা এই—

“কালে কোকিলবাচালে সহকারমনোহরে
কৃতাগসঃ পরিত্যাগাৎ তস্যাশ্চেতো ন দূয়তে।”

[এর অর্থ—কোকিলকলকণ্ঠমুখর চূতমঞ্জরীমনোহর বসন্তে অপরাধী (কান্তের) পরিত্যাগ তার (নায়িকার) চিত্ত পরিতাপিত করে না।]

অলঙ্কারনির্দ্দেশক ব্যাখ্যাসূত্রে বিশ্বনাথ বলেছেন, “অত্র কয়াচিৎ সখ্যা নিষেধার্থে নিযুক্তো নঞ্ অন্যয়া কাক্বা দূয়তে এব ইতি বিধ্যর্থে ঘটিতঃ।” অর্থ—এখানে কোনো সখীর নিষেধার্থে নিযুক্ত নঞ্ অন্যসখীর দ্বারা কাকুসহকারে ‘নিশ্চয় পরিতাপিত হয়’ এই বিধি-অর্থে ঘটিত হয়েছে।

ঠিক এইভাবের কাকুবক্রোক্তি বাঙলায় বিরল ব’লে মনে হয়।

অর্থালঙ্কার

যে-অলঙ্কার একান্তভাবে অর্থের উপর নির্ভর করে, অর্থ-প্রকাশক অলঙ্কার-স্রষ্টা শব্দ বা শব্দাবলীকে (word বা words) পরিবর্তিত ক'রে সেখানে সমার্থক (synonymous) অন্য শব্দ বসিয়ে দিলেও যে-অলঙ্কার অক্ষুণ্ণ থাকে, তার নাম **অর্থালঙ্কার**।

উদাহরণ তৈরী ক'রে ব্যাপারটা বোঝানো যাক:

'নয়নে তোমার চপল দৃষ্টি চকিতহরিণীসম'

—এতে রয়েছে অর্থালঙ্কার পূর্ণোপমা। এটিকে যদি এইভাবে রূপান্তরিত করি:

'চোখে চঞ্চল চাহনি তোমার ত্রস্ত মৃগীর মতো'

পূর্ণোপমাই র'য়ে গেল; শব্দপরিবর্তন সমার্থকতার ভিত্তিতে করা হ'ল ব'লে অলঙ্কার তার পূর্ব্বমহিমা নিয়ে অটুট হ'য়ে রইল।

এইরকম শব্দপরিবৃত্তিসহিষ্ণুতা শব্দালঙ্কারের নাই; একথা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথের

"বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ"

চরণটিকে যদি এইভাবে লিখি—

'বাজে পূরবীর ছন্দে ভানুর শেষ রাগিণীর বীণ',

তাহ'লে ঐ একটি কথা 'রবি'র জায়গায় সমার্থক 'ভানু' বসানোতে একসঙ্গে বহু বিপর্য্যয় ঘ'টে যায়: 'ঈর' 'ইর' 'ঈর' (পূরব্-ঈর, রব্-ইর, রাগিণ্-ঈর)-এর অনুপ্রাস, (পূ-) রবীর রবির যমক, 'রবি'র (সূর্য্য, রবিঠাকুর) শ্লেষ অন্তর্ধান করে।

শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের পার্থক্য নির্ণীত হয় একটিমাত্র আদর্শে। সে আদর্শটি হ'ল শব্দের পরিবর্তন সহ্য করার শক্তি। **এ শক্তি** অর্থালঙ্কারের **আছে**, শব্দালঙ্কারের **নাই**।

অর্থালঙ্কার বহুসংখ্যক হ'লেও তাদের শ্রেণীগতভাবে বিচার করলে মোটামুটি **পাঁচটি শ্রেণী** পাওয়া যায়। এক একটি শ্রেণীর মধ্যে অনেকগুলি ক'রে অলঙ্কার থাকে। শ্রেণীবিভাগের মূলসূত্র কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ।

শ্রেণী পাঁচটির লক্ষণাত্মক নাম:

(ক) **সাদৃশ্য**; (খ) **বিরোধ**; (গ) **শৃঙ্খলা**; (ঘ) **ন্যায়**; (ঙ) **গূঢ়ার্থপ্রতীতি**।

প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অলঙ্কার :

(ক) **সাদৃশ্য**—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান্, ব্যতিরেক, প্রতীপ, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, উল্লেখ, দীপক, তুল্যযোগিতা, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, স্মরণ, সামান্য, সহোক্তি, অর্থশ্লেষ।

(খ) **বিরোধ**—বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসঙ্গতি, বিষম, বিচিত্র, অধিক, অনুকূল, ব্যাঘাত, অন্যোন্য।

(গ) **শৃঙ্খলা**—কারণমালা, একাবলী, সার, মালাদীপক।

(ঘ) **ন্যায়**—অর্থাপত্তি, কাব্যলিঙ্গ, অনুমান, পর্য্যায়, পরিবৃত্তি, সমুচ্চয়, পরিসংখ্যা, উত্তর, সমাধি, সামান্য, তদ্‌গুণ।

(ঙ) **গূঢ়ার্থপ্রতীতি**—অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, আক্ষেপ, ব্যাজস্তুতি, পর্য্যায়োক্ত, পরিকর, সূক্ষ্ম, ব্যাজোক্তি, স্বভাবোক্তি, ভাবিক, উদাত্ত।

শ্রেণীবিভাগটি কিন্তু খুব সূক্ষ্ম নয়। কোথাও কোথাও অলঙ্কারবিশেষ তার পূর্ণপরিচয়ের জন্য আপন সীমায় থেকেও অন্য সীমার এক-আধটু সাহায্য নেবে। তবে, সে এমন গুরুতর কিছু নয়; শ্রেণীবিভাগের মূল্য তাতে ক্ষুণ্ণ হবে না।

(ক) সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার

এ সাদৃশ্য দুই বিসদৃশ (dissimilar) বস্তুর সদৃশতা (similarity)। আকারে প্রকারে বস্তুদুটি যতই বিভিন্ন হোক, কবি প্রাতিভদৃষ্টির আলোকে দুইয়ের মধ্যেই বর্ত্তমান এমন ধর্ম্ম (property) আবিষ্কার করেন, যা বস্তুদুটিকে সাম্যসূত্রে বেঁধে ফেলে। সাদৃশ্য, সাম্য, সারূপ্য, সাধর্ম্ম্য একার্থক শব্দ। বস্তুদ্বয়ের বাহ্য বৈসাদৃশ্য যত বেশী হবে, অলঙ্কার তত সৌন্দর্য্যময় হ'য়ে আপন নামকে সার্থক করবে। চোখের সঙ্গে চোখের তুলনায় অলঙ্কার হয় না, কারণ এরা সমজাতীয় ব'লে বৈচিত্র্যহীন; চোখের সঙ্গে পদ্মপলাশের তুলনায় অলঙ্কার হয়, কারণ এরা অসম-(বি-) জাতীয় ব'লে পাঠকের কল্পনা উদ্দীপিত ক'রে তোলে। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার কবি-পাঠক উভয়েরই যে এত প্রিয়, তার প্রধান কারণ এরা চিত্রধর্ম্মা—ভাবকে মূর্ত্তিমান্ ক'রে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে বিরাট্ চিত্রশালা, রসিকমাত্রকেই একথা স্বীকার করতে হবে। এই চিত্রধর্ম্মিতা রবিকাব্যের অন্যতম প্রধান গুণ। পূর্ণলক্ষণের অলঙ্কার

রবীন্দ্রকাব্যে প্রচুর ; তার চেয়ে বেশী 'সংসৃষ্টি' এবং সবচেয়ে বেশী অপূর্ব্ব সুন্দর 'সঙ্কর' (অলঙ্কার-চন্দ্রিকায় 'সংসৃষ্টি ও সঙ্কর'-শীর্ষক ধারা দ্রষ্টব্য)।

সাদৃশ্য বা সাধর্ম্ম্য বিচার করা যায় প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে :

(১) বস্তুদুটির **সমান মূল্য** স্বীকার ক'রে ;

(২) বস্তুদুটির **অভেদ কল্পনা** ক'রে ;

(৩) বস্তুদুটির **ভেদকে প্রাধান্য** দিয়ে।

উপমা, রূপক আর ব্যতিরেক এই তিন পন্থার যথাক্রমিক প্রতীক।

সাদৃশ্য হয় বস্তুদুটির **গুণগত, অবস্থাগত, ক্রিয়াগত** অথবা গুণ-অবস্থা-ক্রিয়ার নানাভাবের **মিশ্রণগত** ধর্ম্মের ভিত্তিতে।

সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের **চারটি অঙ্গ :**

(১) যাকে তুলনার বিষয়ীভূত করা হয় ;

(২) যার সঙ্গে তুলনা করা হয় ;

(৩) যে সাধারণ ধর্ম্ম তুলনা সম্ভব করে ;

(৪) যে ভঙ্গীতে তুলনাটি দেখানো বা বোঝানো হয়।

প্রথমটির নাম **উপমেয়** ; দ্বিতীয়টির নাম **উপমান**। আরও কয়েকটি শব্দযুগ্ম সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের আলোচনায় দেখা যাবে। সেগুলি হচ্ছে—বিষয়-বিষয়ী, প্রকৃত-অপ্রকৃত, প্রস্তুত-অপ্রস্তুত, প্রাকরণিক-অপ্রাকরণিক। এরা অনেকটা সমার্থক। উপমেয়-উপমানের প্রতিশব্দ এরা নয়। তবু অনেক সময় লিখব প্রকৃত=উপমেয়, অপ্রস্তুত=উপমান ইত্যাদি। কেন লিখব, তা একটা উদাহরণ ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন,

"পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে **রেশমচিকন চুলে**",

তখন গ্রীবার লোভনতার মূলীভূত কারণ মেয়েটির চিক্কণ চুলই যে কবির আসল বর্ণনীয় বস্তু, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। চুলের চিক্কণতাকে আরও সুন্দরভাবে পরিস্ফুট ক'রে তুলতে কবি রেশমের সঙ্গে করেছেন তার তুলনা। অলঙ্কার এখানে লুপ্তোপমা : উপমেয় 'চুল', উপমান 'রেশম', সাধারণ ধর্ম্ম 'চিকন', তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত (এ সবের পরিচয় একটু পরেই মিলবে)। 'চুল'ই কবির বর্ণনীয়, অতএব প্রাসঙ্গিক, এবং অলঙ্কারসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আনীত ব'লে 'রেশম' অপ্রাসঙ্গিক ('চিকনকোমল চুলে' লিখলেও চলত, অলঙ্কারও হ'ত চ, ক, ল এই বর্ণতিনটির সুন্দর অনুপ্রাসে)। 'চুল'টাই কবির বর্ণনীয় **বিষয়** ; চুলটাই **প্রকৃত, প্রস্তুত, প্রাকরণিক**। 'অলঙ্কা কৌস্তভ' গ্রন্থে

কবিকর্ণপূর 'প্রস্তুত' কথাটার অর্থ লিখেছেন 'প্রাকরণিক, প্রাসঙ্গিক'। আমাদের আলোচ্যমান উদাহরণে 'চুল'ই যখন প্রকৃত এবং এই 'চুল'ই যখন 'উপমেয়' হয়েছে, তখন উপমা অলঙ্কারে সাধারণভাবে লেখা যেতে পারে প্রকৃত =উপমেয়, অপ্রকৃত=উপমান; চুল প্রস্তুত, রেশম অপ্রস্তুত। অন্যধরণের একটা উদাহরণ দিই :

"রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম,
যাত্রীরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্ত্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী"—

পথ রথ মূর্ত্তিকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভাবিয়েছেন, সত্যই কি তারা সেইভাবে ভাবছে? পথরথমূর্ত্তির কবিকল্পিত 'আমি দেব' ভাবনা আর অন্তর্য্যামীর নিছক একটু মিষ্টি হাসি কবির বর্ণনীয় বিষয় নাকি? তা তো নয়। কবির মূল বক্তব্যটি উপনিষদের একটি পরমা বাণী—'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'। অরূপের রূপলীলা এই বিশ্বচরাচর। খণ্ডের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না। অন্যত্র কবি যে বলেছেন,

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে,"

আলোচ্যমান কবিতাটিরও তাই প্রতিপাদ্য। কবির অভীপ্সিত এই সাধারণ সত্যটি **প্রস্তুত**; কিন্তু কবি এই প্রস্তুতকে রেখেছেন প্রতীয়মান অর্থরূপে (in the shape of a suggested meaning)। কবিতাটি রচিত হয়েছে একটি বিশেষ উপলক্ষ রথযাত্রাকে নিয়ে। এইটাই কবির অভিপ্রেত বিষয় নয় এবং নয় ব'লেই এটি **অপ্রস্তুত**। এই অপ্রস্তুতের ব্যঞ্জনা থেকেই প্রস্তুতটিকে পাচ্ছি। অলঙ্কার অপ্রস্তুতপ্রশংসা। দেখা যাচ্ছে যে এখানে তুলনার নামগন্ধও নাই। এই কারণেই বলেছি প্রস্তুত-অপ্রস্তুত, প্রকৃত-অপ্রকৃত প্রভৃতি উপমেয়-উপমানের প্রতিশব্দ নয়। এদের অর্থ ব্যাপক, প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত।

উপমা

উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ **তুলনা**। 'দেবোপম মানব' বলতে বোঝায় সেই মানবকে যাঁর উপমা অর্থাৎ তুলনা চলে দেবের সঙ্গে (দেবোপম=দেব উপমা যার : বহুব্রীহি সমাস)। "উমার সঙ্গে কি প্রাণের উপমা?"—বিজয়া-গানের এই চরণটিতেও দাশরথি 'তুলনা' অর্থেই উপমা কথাটি প্রয়োগ

করেছেন। এই কারণে তুলনার ভিত্তিতে যত অলঙ্কারের সৃষ্টি, তাদের সকলেরই সাধারণ নাম উপমা। আলঙ্কারিক অপ্পয় দীক্ষিত তাই বলেছেন—উপমা এক নটী; বিচিত্র ভূমিকায় সে অভিনয় করে কাব্যের রঙ্গমঞ্চে আর সঙ্গে সঙ্গে করে রসিকজনের চিত্তরঞ্জন:

"উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকাভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ॥"

এই বহুবিচিত্র ভূমিকার মধ্যে নটী সাধারণ উপমার একটি ভূমিকা হচ্ছে বিশেষ লক্ষণের উপমা-নামক অলঙ্কার; অন্যগুলি উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহ্নুতি, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান্ ইত্যাদি ইত্যাদি। সাদৃশ্য-মূলক অলঙ্কারের প্রকারভেদ মানেই সাধারণী উপমার 'চিত্রভূমিকাভেদ'। প্রথমেই যে উদাহরণ দুটি দিয়েছি, একটু পরেই বোঝা যাবে যে ওদের প্রথমটিতে সত্যকার বিশিষ্ট লক্ষণের উপমা আর দ্বিতীয়টিতে ব্যতিরেক অলঙ্কার, যদিও 'উপমা' কথাটি দুটি উদাহরণেই বর্তমান। সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে উপমা জাতি এবং ব্যক্তি অর্থাৎ Genus এবং Species দুইই—সাধারণ অর্থে জাতি, বিশিষ্ট অর্থে ব্যক্তি।

এই সূত্রে 'কাব্যে অলঙ্কার-প্রয়োগ'-শীর্ষক ধারায় 'উপমা কালিদাসস্য'-র ব্যাখ্যা এবং 'অলঙ্কারের বিবর্তন'-শীর্ষক সমগ্র ধারাটি মন দিয়ে পড়লে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

এইবার বলছি বিশিষ্ট লক্ষণের উপমা অলঙ্কারের কথা।

১। উপমা:

একই বাক্যে স্বভাবধর্মে বিজাতীয় দুটি পদার্থের ('in their general nature dissimilar'—Johnson) বিসদৃশ কোনো ধর্মের উল্লেখ না ক'রে যদি শুধু কোনো বিশেষ গুণে, বা অবস্থায়, অথবা ক্রিয়ায় পদার্থদুটির সাম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য দেখানো হয়, তাহ'লে হয় **উপমা** অলঙ্কার।

"এও যে রক্তের মতো রাঙা
দুটি জবাফুল।"

—জবাফুল আর রক্ত দুটি বিজাতীয় পদার্থ। **একই বাক্যে** এরা রয়েছে। 'রাঙা' এদের সাম্য বা সাধর্ম্য ঘটিয়েছে। এই কারণে এখানে হয়েছে **উপমা** অলঙ্কার। এখানে সাধর্ম্যটি গুণগত, কারণ রাঙা একটি গুণ। বিজাতীয় বস্তু-দুটির বিরুদ্ধ ধর্মের উল্লেখ নাই, যেমন থাকে ব্যতিরেক অলঙ্কারে ('ব্যতিরেক' দ্রষ্টব্য)। দেখা যাচ্ছে যে সংজ্ঞার লক্ষণগুলি সবই এতে রয়েছে।

উপমার সম্বন্ধে যে আলোচনাটুকু করা গেল, তাতে পাওয়া গেল উপমার সাধারণ সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এইবার দিচ্ছি উপমার বিশদ পরিচয়।

উপমা প্রধানতঃ **চাররকম : পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা, বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের উপমা, বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা।** এ ছাড়া আরও নানা রকমের উপমা আছে ; যথাস্থানে তাদের নামসমেত পরিচয় দেব।

১। (ক) পূর্ণোপমা :

যে উপমায় উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ—চারটি অঙ্গই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে, তার নাম **পূর্ণোপমা**।

তুলনাবাচক শব্দ : মত, সম, যথা, যেমতি, প্রায়, পারা, মতন, নিভ, তুল, তুলনা, উপমা, তুল্য, হেন, কল্প, সঙ্কাশ, জাতীয়, সদৃশ, যেন, প্রতীকাশ, বৎ (যেমন, জলবৎ)।

এদের সবগুলিই বাঙলাসাহিত্যে পাওয়া যায়। 'যেন' দেখলেই বাচ্যোৎপ্রেক্ষার কথা মনে আসে ; কিন্তু উপমাতেও 'যেমন' অর্থে 'যেন'-র প্রয়োগ দেখতে পাই। তাই অর্থের দিকে একটু মনোনিবেশ ক'রে স্থির করতে হয় অলঙ্কারটি উপমা না উৎপ্রেক্ষা।

আগে উদ্ধৃত 'এও যে রক্তের মতো' ইত্যাদি কবিতাংশটিতে পূর্ণোপমা। তুলনা-বাচক শব্দ 'মতো'। নীচের উদাহরণে স্থূলাক্ষর অংশ তুলনাবাচক।

(i) 'কাজলের **মতো** কালো কুন্তল পড়েছে ঝুলে
অলক্ত**সম** রাতুল দুখানি চরণ-মূলে।'—শ. চ.

—**উপমেয় :** কুন্তল, চরণ (কারণ, এই দুটিকেই কবি তুলনার বিষয়ীভূত করেছেন); **উপমান :** কাজল, অলক্ত (তুলনা হয়েছে এই দুটির সঙ্গে); **সাধারণ ধর্ম্ম :** কালো, রাতুল (এই গুণদুটি উপমেয় উপমান দুপক্ষেই থাকায় তুলনা সম্ভব হয়েছে); **তুলনাবাচক শব্দ :** মতো, সম।

(ii) "আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণদীপ্ত প্রভাতরশ্মি**সম**"—রবীন্দ্রনাথ।

—উপমেয় : ছুরি ; উপমান : প্রভাতরশ্মি ; সাধারণ ধর্ম্ম : তীক্ষ্ণদীপ্ত ; তুলনাবাচক শব্দ : সম।

(iii) "একা আছি সৌরভ-বিভোর
আমার অন্তরে আমি, কস্তুরীমৃগের **সম** একা।"—রাধারাণী।

(iv) "বিদ্যুৎ-ঝলা **সম** চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে।"—মধুসূদন।

—উপমেয় : কলম্বকুল (শরসমূহ) ; উপমান : বিদ্যুৎ-ঝলা ; সাধারণ ধর্ম্ম : চক্‌মকি ; তুলনাবাচক শব্দ : সম। এখানে সাধারণ ধর্ম্মটি ক্রিয়াগত, কারণ চক্‌মকি (চক্‌মক ক'রে) অসমাপিকা ক্রিয়া।

(v) "বরিষার ধারামত্ত অজস্র জননীপ্রেম।"—নবীনচন্দ্র।

—উপমেয় : জননীপ্রেম ; উপমান : বরিষার ধারা ; সাধারণ ধর্ম্ম : অজস্র ; তুলনাবাচক শব্দ : মত।

(vi) "ননীর মত শয্যা কোমল পাতা।"—কালিদাস (কবিশেখর)।

(vii) "হৃদি-শয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ।" —রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারারত্ন যথা!"—মধুসূদন।

—এখানে শোভাসৃষ্টি উপমেয় উপমানের সাধারণ ধর্ম্ম।

(ix) "পক্ষ্ম-অগ্রভাগে
দুলিল অশ্রুর বিন্দু, শিশির যেমতি
শিরীষ-কেশরে।" —মোহিতলাল।

(এখানে 'শিশির' থেকে 'কেশরে' পর্য্যন্ত সুন্দর অনুপ্রাসও রয়েছে)

(x) "সেনাপতি!......কাষ্ঠের পুতুল প্রায়
সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ একধারে!"—নবীনচন্দ্র।

—দ্বিতীয় চরণটি উপমেয় সেনাপতি এবং উপমান কাষ্ঠের পুতুল এই দুইয়ের সাধারণ ধর্ম্ম।

(xi) "মিহিন্ কুয়াসায়
ছাদ্‌নাতলা দেয় কি ঢেকে ওড়নাখানির প্রায়?"—মোহিতলাল।

(xii) "এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁষে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'সে'='কন্যা মোর চারি বছরের।'

(xiii) "ক্ষণেক শুধু অবশকায় থমকি রবে ছবির প্রায়।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xiv) "আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xv) "অঙ্গপরিমল সুগন্ধি চন্দন-
কুঙ্কুমকস্তুরী পারা।"—চণ্ডীদাস।

(xvi) "যেখানে তুমি আমাদেরি
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার **তুলনা**,
যেখানে শরতের শিউলীফুলের **উপমা** তুমি"—রবীন্দ্রনাথ।

—সাধারণ ধর্ম্ম : 'ছোটো', 'সুন্দর'।

(xvii) "আমার প্রেম রবিকিরণ-**হেন**
জ্যোতির্ম্ময় মুক্তি দিয়ে
তোমারে ঘেরে যেন।"—রবীন্দ্রনাথ।

—সাধারণ ধর্ম্ম : 'জ্যোতির্ম্ময় মুক্তি' (দিয়ে=দ্বারা)।

(xviii) "এ যে তোমার তরবারি
জ্ব'লে ওঠে আগুন যেন, বজ্র**হেন** তারি।"—রবীন্দ্রনাথ।

মন্তব্য : এখানে 'যেন' উৎপ্রেক্ষার নয়, উপমার। 'আগুন **যেন**'= আগুনের **মতো**। তুলনাবাচক শব্দের তালিকার পর এমনি 'যেন'-র কথাই ব'লে এসেছি। এইখানে আরও একটা কথা ব'লে রাখি। কবিরা অনেক সময় দুরকমের দুটো তুলনাবাচক শব্দ একই উপমায় প্রয়োগ করেন। সেখানে দুটোকে মিলিয়ে একটার মূল্য দিতে হয়। 'মতো' অর্থের 'যেন' সেখানেও দেখা যায়। দুটিমাত্র উদাহরণ দিয়ে মূল বিষয়ে ফিরছি।

"তুমি **যেন** দেবীর **মতন**"—রবীন্দ্রনাথ (চিত্রাঙ্গদা)।

"বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে **যেমতি** যোগিনী **পারা**।"
—চণ্ডীদাস।

(xix) "অন্ধকার, ওগো অন্ধকার!
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইয়া সপ্তরশ্মিরথ
অন্ধবৎ হারাইবে পথ।"—যতীন সেন।

পূর্ণোপমার অন্যভাবের আর দুটি উদাহরণ :

Skylark (আমাদের আগিন)-কে সম্বোধন ক'রে Shelley বলছেন,

"Thou dost float and run
Like an unbodied joy whose race is just begun."

উপমেয় এখানে 'Thou' (Skylark), উপমান 'joy'। দুটিই 'unbodied'; 'joy'-এর পক্ষে তা স্বাভাবিক, কারণ joy একটা ভাবমাত্র। অতিক্ষুদ্র

আর্গিনপাখী একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বস্তু হ'লেও সুদূর আকাশে উড়ে উড়ে যখন গান করে, তখন তাকে দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু সুরঝঙ্কার; এই দৃষ্টিতে তারও 'unbodied' বিশেষণের সার্থকতা। উপমান সত্য হোক মিথ্যা হোক, সকলের পরিচিত হ'তে হবে তাকে; নইলে উপমা তার স্বাদ হারিয়ে ফেলবে। অনেক উপমান আছে, যারা আমাদের কাছে মিথ্যা, তবু আমরা তাদের চিনি সংস্কারের বশে; যেমন 'সুধা', খাওয়া তো দূরের কথা, কেউ কস্মিন্‌কালে দেখেও নাই। তবু কাব্যে যখন দেখা যায়—

"অধর কী সুধাদানে
রহিবে উন্মুখ, পরিপূর্ণ বাণীভরে
নিশ্চল নীরব" —রবীন্দ্রনাথ।

তখন সকলকেই বলতে হয় যে হ্যাঁ, পাওয়ার মতন একটা জিনিস পাওয়া গেল। কিন্তু শেলির 'unbodied joy whose race is just begun'-এর সংস্কার কোনো লোকের আছে কি? এ ভাবের উপমান-প্রয়োগ পাঠকমস্তিষ্কের নিষ্ফল নিপীড়ন। পাশ্চাত্য কাব্যরসিকরাও এইজাতীয় simile-কে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেন না। ঠিক এতটা না হোক, অনেকটা এইরকম বাঙলা উদাহরণ:

(xx) "চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xxi) "সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে।"— ঐ

(xxii) "আমাদের জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্বোধ ও রহস্যময়, যাহাই আমাদের আশাকে 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ'রূপে আকর্ষণ করে,—সেই সকলই আমাদের অন্তরের কল্পলোক-রচনায় সহায়তা করিয়াছে।"

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

—উপমেয় 'আশা', উপমান 'পতঙ্গ', তুলনাবাচক তুল্যার্থক তদ্ধিতপ্রত্যয় 'বৎ' এবং সাধারণ ধর্ম্ম 'বিবিক্ষুঃ' (প্রবেশের জন্য উন্মুখ)।

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের আশাও প্রবেশেরই জন্য উন্মুখ। পতঙ্গ যেমন তার স্বভাবধর্ম্মে অগ্নিতে প্রবেশের জন্য উন্মুখ, আমাদের আশাও তেমনি তার অনিবার্য্য আকর্ষণকারীর মধ্যে প্রবেশের জন্য উন্মুখ। আকর্ষণকারীর মধ্যে বহ্নির ব্যঞ্জনা রয়েছে। 'রূপে' কথাটির আলঙ্কারিক মূল্য নাই; সংস্কৃত উক্তিটিকে বাঙলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে লেখককে কথাটি দিতে হয়েছে।

[**মন্তব্য :** মহাকবি কালিদাসকৃত 'কুমারসম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গের চৌষট্টিসংখ্যক কবিতার দ্বিতীয় চরণ "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"। মদন যখন হরপার্ব্বতীর মিলন ঘটাতে পুষ্পশরসন্ধানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখনই কবি মদন-সম্বন্ধে এই অলঙ্কারটি প্রয়োগ করেছেন। শরসন্ধানের ফলে মদন ক্রুদ্ধ মহেশ্বরের তৃতীয় নয়নের বহ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। এই অনিবার্য্য পরিণামের দিকে অলঙ্কারটিতে ইঙ্গিত রয়েছে।

'কাব্যশ্রী'-তে গ্রন্থকার সুধীরকুমার "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" চরণটির "বহ্নিমুখে **প্রবেশেচ্ছু** পতঙ্গের ন্যায়" এই অর্থ ক'রে মন্তব্য করেছেন, "কালিদাসোচিত সূক্ষ্ম কবিকর্ম রক্ষিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়; কেননা, পতঙ্গ **রূপের আকর্ষণে** বহ্নিমুখে স্বয়ং ঝাঁপ দেয়। মদন চাহিয়াছিল আত্মরক্ষা করিয়া শিবকে পরাভূত করিতে।" মল্লিনাথের অনুসরণে তিনি 'বিবিক্ষু'-র 'সন্' প্রত্যয়টি (বিশ্ ধাতু+সন্=বিবিক্ষ্ ধাতু+কর্ত্তৃবাচ্যে 'উ' প্রত্যয়=বিবিক্ষু) **'ইচ্ছা'** অর্থে ধ'রে লিখেছেন 'প্রবেশেচ্ছু'। 'সন্' প্রত্যয়ের এই 'ইচ্ছা' অর্থগ্রহণই তাঁর মন্তব্যের ভিত্তি।

কালিদাসের এই 'বিবিক্ষু' **ইচ্ছার্থে** 'সন্' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন **নয়**। পাণিনি ব্যাকরণে "ইচ্ছায়াং···" বলা হয়েছে (৩।১।৭); কিন্তু 'ইচ্ছা' অর্থ ধ'রে সমস্ত ধাতুজ পদের সব জায়গায় মানে করা যায় না দেখে মহামুনি কাত্যায়ন ঐ পাণিনিসূত্রের সঙ্গে 'বার্ত্তিক'রূপে যোগ দিলেন "আশঙ্কায়াং সন্ বক্তব্যঃ" (অর্থাৎ **'আশঙ্কা'** অর্থেও 'সন্' প্রত্যয় হয়)। পাণিনিসূত্রের ভগবান্ পতঞ্জলিকৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার কৈয়ট লিখলেন আশঙ্কা মানে সম্ভাবনা ("আশঙ্কা সম্ভাবনা")। কাত্যায়নের 'আশঙ্কায়াং সন্ বক্তব্যঃ'-র দুটি উদাহরণ অধিকাংশ ব্যাখ্যাতেই দেখতে পাচ্ছি—(i) 'শ্বা মুমূর্ষতি', (ii) 'কূলং পিপতিষতি'। এ দুটির মানে কুকুরের মৃত্যু সম্ভাব্যতার দ্বারে এসে পৌঁছেছে, (নদী-) কূলের পতন আসন্ন। সোজা কথায় কুকুর আর নদীর কূল যথাক্রমে মরণের আর পতনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ কুকুরটি মরণোন্মুখ (মর'-মর'), কূলটি পতনোন্মুখ (পড়'-পড়')।

ধ্বন্যালোকের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা আচার্য্য অভিনবগুপ্তের গুরু পরমাচার্য্য প্রতীহারেন্দুরাজ 'সন্' প্রত্যয়ের এই 'আশঙ্কা সম্ভাবনা' বুঝিয়েছেন একটি চমৎকার কথায়। কথাটি হচ্ছে 'ঔন্মুখ্য' (উন্মুখতা)। আচার্য্য ভামহ 'নিদর্শনা' অলঙ্কারের একটি উদাহরণ দিয়েছেন; তার বাঙলা করলে দাঁড়ায়—"এই মন্দদ্যুতি প্রভাকর 'উন্নতির পরিণাম পতন' এই কথাটি শ্রীমান্ মানুষদের বুঝিয়ে

দিতে দিতে অস্তমিত হচ্ছে (এর অলঙ্কারব্যাখ্যা 'নিদর্শনা'-য় করব)। আলোচ্যমান প্রসঙ্গে এর সংস্কৃত রূপটিই আমার কাছে মূল্যবান্। শ্লোকটি এই :

"অয়ং মন্দদ্যুতির্ভাস্বানস্তং প্রতি **যিযাসতি**।
উদয়ঃ পতনায়েতি শ্রীমতো বোধয়ন্ নরান্॥"

স্থূলাক্ষর ক্রিয়াপদটি 'যা' ধাতু (যাওয়া)+**সন্** প্রত্যয় ক'রে নিষ্পাদিত হয়েছে। 'সন্' এখানে 'ইচ্ছা' বোঝাচ্ছে **না**, বোঝাচ্ছে ঔন্মুখ্য বা উন্মুখতা ('ভাস্বতঃ যৎ এতৎ অস্তময়ৌন্মুখ্যম্'—প্রতীহারেন্দুরাজ)। ধ্বন্যালোকের ব্যাখ্যায় এই কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন অভিনবগুপ্ত। রামষরক তাঁর 'বালপ্রিয়া' টীকায় লিখছেন 'যিযাসতি'-র অর্থ 'যাতুম্ আরভতে' (যেতে আরম্ভ করছে)। আরম্ভ মানে কাজের প্রথম অবস্থা ; সুতরাং 'যাতুম্ আরভতে' কথাটিরও তাৎপর্য্য সূর্য্য অস্তোন্মুখ।

এই সব থেকে বেশ বোঝা যায় যে মহাকবি কালিদাস **'প্রবেশেচ্ছু' অর্থে 'বিবিক্ষু' লেখেন নাই, লিখেছেন প্রবেশোন্মুখ অর্থে**। "কামঃ...পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"-র মানে পতঙ্গ যেমন বহ্নিমুখে প্রবেশের জন্য উন্মুখ, মদন তেমনি (মহেশ্বরের তৃতীয়নয়নবিচ্ছুরিত) অগ্নিমুখে প্রবেশের জন্য উন্মুখ। 'উন্মুখ' কথাটার মধ্যে ইচ্ছার অন্তর্ভাব নাই—'স্ফুটনোন্মুখ মুকুল' বলতে মুকুলের ফোটার ইচ্ছা বোঝায় না, বোঝায় : মুকুল এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যার অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাসন্ন পরিণাম বিকাশ। সুধীরকুমার বলেছেন পতঙ্গের বহ্নিপ্রবেশের মূলে 'রূপের আকর্ষণ'। 'রূপের আকর্ষণ' পতঙ্গসম্পর্কে শুদ্ধ কবিকল্পনা। রূপ বোঝার শক্তি পতঙ্গের নাই, রূপতৃষ্ণাও তাই সম্ভব নয়। Biologyর মতে পতঙ্গ আগুনে ঝাঁপ দেয় স্নায়ুর একপ্রকার অসহ্য উত্তেজনায় ; এর পারিভাষিক নাম 'Phototropism'। আগুন তাকে আকর্ষণ করে অনিবার্য্যভাবে, না জেনেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মরে—এ টান মরণের টান। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মদনের অবস্থাও ঠিক পতঙ্গবৎ—মরণের টান। মহাকবি অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক কাব্যশিল্পী কালিদাস কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের গোড়া থেকেই "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" মদনকে সঙ্কেতিত ক'রে এসেছেন। পিনাকপাণি মহেশ্বরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব ("কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণে-র্ধৈর্য্যচ্যুতিম্"—৩।১০) ব'লে অহঙ্কারী মদন যখন যাত্রা করলেন, রতির বুক কেঁপে উঠল ("রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ"—৩।২৩)। মদনের ধ্যানমগ্নমহেশ্বর-দর্শনের ছবি আঁকতে গিয়ে কালিদাস দেখেছেন আসন্নমৃত্যু মদনকে ("আসন্ন-

শরীরপাতস্তিমিতয়কং সংযমিনং দদর্শ"—৩।৪৪)। ঐ মহেশ্বরদর্শনের সময় ভয়ে মদনের অজ্ঞাতসারেই হাত থেকে ধনুর্বাণ খ'সে পড়েছে ("নালক্ষয়ৎ সাধ্বস-সসন্নহস্তঃ। স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ॥"—৩।৫১)। ধনুর্বাণ খসে পড়ার মধ্যে আসন্ন অমঙ্গলের দ্যোতনাটি লক্ষণীয়। এমন সময় এলেন পার্ব্বতী। রতির চেয়েও শতগুণে সুন্দরী পার্ব্বতীকে দেখে মদন আশ্বস্ত হলেন—আমার জয় অনিবার্য্য ("জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ। স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশ-শংসে॥—৩।৫৭)। 'জিতেন্দ্রিয়-শূলী'-র মহাপ্রাণ গাম্ভীর্য্যের পাশে 'পুষ্পচাপ'-এর স্বল্পপ্রাণ তারল্যটুকুর ব্যঞ্জনা সুন্দর। মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গ হ'ল, পার্ব্বতীও অর্ঘ্য দিতে গেলেন, মদনও সুযোগ বুঝে প্রস্তুত হ'লেন সম্মোহন শরসন্ধানের জন্য, কালিদাস বললেন, "কামঃ……পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" (৩।৬৪)—পতঙ্গের মতন বহ্নিমুখে প্রবেশোন্মুখ হ'লেন মদন। মদন **ইচ্ছা** ক'রে প্রবেশ করছেন না, **দুর্নিয়তি তাঁকে টানছে**—একথা কবি জানেন, সহৃদয় পাঠক জানেন। মদনের এই উন্মুখতা পূর্ণতা পেলে একটু পরেই—"বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা। ভস্মাবশেষং মদনং চকার॥" (৩।৭২)।

অনুপমা উপমা "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ"। 'কালিদাসোচিত সূক্ষ্ম কবিকর্ম্ম' নিশ্চিত সুন্দররূপে রক্ষিত হয়েছে, 'উপমা কালিদাসস্য' স্বমহিমায় ভাস্বর আছে।]

১ (খ)। লুপ্তোপমা

যে উপমা অলঙ্কারে একমাত্র উপমেয় ছাড়া অন্য তিনটি অঙ্গের একটি, দুটি, এমন কি তিনটিই লুপ্ত থাকে, তার নাম **লুপ্তোপমা**।

(অ)। **তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত:**

(i) "রঞ্জিত মেঘের মাঝে **তুষার-ধবল**
তোমার প্রাসাদ-সৌধ।" —রবীন্দ্রনাথ।

—তুষারধবল—তুষারের মতো ধবল। উপমেয় 'প্রাসাদসৌধ', উপমান 'তুষার', সাধারণ ধর্ম্ম 'ধবল', তুলনাবাচক **মতো** লুপ্ত।

(ii) "**শাল-প্রাংশু মহাভুজ** রথী।" —কালিদাস।
—শালের মতো প্রাংশু (দীর্ঘ)।

রা
স্থ

(iii) "**কমলদলজল জীবন** টলমল।" —গোবিন্দদাস।

(iv) "**কমলফুল-বিমল শেজখানি**।" —রবীন্দ্রনাথ।

(v) "**অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ**।" —শরৎচন্দ্র।

(vi) "মধ্যে নীলসরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
স্ফটিকনির্ম্মল স্বচ্ছ।" —রবীন্দ্রনাথ।

(আ)। **সাধারণ ধর্ম্ম লুপ্ত ঃ**

(i) "**শরদিন্দুনিভাননী** প্রমীলা সুন্দরী।" মধুসূদন।

—উপমেয় 'আনন', উপমান 'শরদিন্দু', তুলনাবাচক শব্দ 'নিভ', সাধারণ ধর্ম্ম লুপ্ত।

(ii) "কণ্টক গাড়ি **কমলসম পদতল**
মঞ্জীর চীর হি ঝাঁপি।" —গোবিন্দদাস।

(iii) "বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন **বাসনা** মম
ফিরে **মরীচিকা সম**।"—?

(iv) "আমি শিবপূজো ক'রে **শিবের মতন স্বামী** পেয়েছিলাম।"
—গিরিশচন্দ্র।

(v) "**গন্ধটুকু** সন্ধ্যাবায়ে **রেখার মতো** রাখি।" —রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "আমাদের প্রিয়তমা **অগ্নিকল্পা কবিতাকল্পনা**।"
—বুদ্ধদেব বসু।

(vii) "**গন্তজাতীয় ভোজ্যও** কিছু দিয়ো।" —রবীন্দ্রনাথ।
—জাতীয়=মতো। (vi)-তে অগ্নিকল্পা=অগ্নির মতো।

(viii) "অঙ্গের **লাবণ্য** যার **উপমেয় প্রিয়ঙ্গুলতায়**।"
—অচিন্ত্যকুমার।

(ই)। **সাধারণ ধর্ম্ম** এবং **তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ**

(i) "**দুগ্ধফেন-শয়ন** করি আলো
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।" —রবীন্দ্রনাথ।

—দুগ্ধফেন-শয়ন=দুগ্ধফেনতুল্য শুভ্রকোমল শয্যা। 'তুল্য' এবং শুভ্রকোমল দুইই লুপ্ত।

(ii) "তি৺াক না দেখি ও **চাঁদ-বদন**
মরমে মরিয়া থাকি।" —চণ্ডীদাস।

মন্তব্য : 'চাঁদ-বদন' কথাটিতে সমাস রূপককর্ম্মধারয় নয়; রূপক-কর্ম্মধারয় সমাসে উপমানটি সব সময়েই উত্তরপদ (the last member of the compound) : দুঃখাগ্নি, কথামৃত, বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি। এখানে উপমান 'চাঁদ' পূর্ব্বপদ (first member of the compound)। সুতরাং অলঙ্কার এখানে সাধারণ ধর্ম্ম এবং তুলনাবাচক শব্দ-লোপের উপমা। এটিকে রূপকের উদাহরণ মনে করার কোনো কারণ নাই।

(iii) "নীরবিলা **শশিমুখী**।"—মধুসূদন।

(iv) "মেঘ হানে **জুঁইফুলী** বৃষ্টি ও অঙ্গে।"—সত্যেন্দ্রনাথ।

—জুঁইফুলী=জুঁইফুলের মতন শুভ্রসুন্দর।

(v) "স্রগ্ধরা কি মালিনীতে **বিম্বাধরের** স্তুতিগীতে
দিতাম রচি দুটি-চারটি ছোটো-খাটো পুঁথি।"—রবীন্দ্রনাথ।

—বিম্বাধর=বিম্বের অর্থাৎ (পাকা) তেলাকুচো ফলের মতন লাল নরম রসাল অধর। স্রগ্ধরা, মালিনী দুটি সংস্কৃত ছন্দের নাম।

(ঈ)। **সাধারণ ধর্ম্ম** এবং **উপমান লুপ্ত :**

(i) 'আকাশে ধরণীতে, স্বপনসরণিতে, **সাকি,**
তোমার সদৃশারে বৃথাই বারে বারে খুঁজিয়া ফিরে মোর আঁখি।'
—শ. চ.

—উপমেয় 'সাকী', তুলনাবাচক শব্দ 'সদৃশ'; উপমেয়ের রূপগুণগত যে ধর্ম্ম তা অন্যত্র মিলছে না ব'লে উপমান স্বভাবতঃই লুপ্ত এবং উপমান না থাকায় উপমেয়ের ধর্ম্ম কারুর সঙ্গে **সাধারণ** (attribute common to both) হ'তে পারল না ব'লে লুপ্ত।

মন্তব্য : এখানে অনন্বয়, ব্যতিরেক বা প্রতীপ অলঙ্কার বলা যায় না; কারণ এ তিনটিতেই উপমান উপমেয় দুইই উল্লিখিত থাকে। অনন্বয়ে যে উপমেয়, সে-ই উপমান ব'লে উপমেয় যে স্বয়ংপূর্ণ এইটেই দ্যোতিত হয়। আমাদের 'আকাশে ধরণীতে......' উদাহরণেও ওই দ্যোতনা। তবু দুটি এক নয়; কারণ, অনন্বয়ে উপমান থাকে, এখানে থাকে না। ব্যতিরেকে উপমানকে এনে উপমেয়ের চেয়ে তাকে নিকৃষ্ট ব'লে প্রতিপন্ন করা হয় এবং প্রতীপে উপমানকে আমন্ত্রণ করা হয় প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে (যথাস্থানে এদের বিশদ পরিচয় দ্রষ্টব্য)।

(ঊ)। **উপমান এবং তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ**

(i) "দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো **হরিণ-চোখ**।"—রবীন্দ্রনাথ।

(ঊ)। **উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম** এবং **তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত ঃ**

(i) "**তড়িত-বরণী হরিণ-নয়নী**
দেখিনু আঙিনামাঝে।"—চণ্ডীদাস।

—এই উদাহরণটি বিচিত্র এবং চমৎকার। এতে উপমান নাই, সাধারণ ধর্ম্ম নাই, তুলনাবাচক শব্দ নাই ; **আছে শুধু উপমেয় ঃ** 'তড়িত-বরণী, হরিণ-নয়নী' অর্থাৎ রাধা। তড়িত-বরণী=তড়িতের বরণের মতো (শুভ্র) বরণ **যার** এবং হরিণ-নয়ণী=হরিণের নয়নের মতো (চঞ্চল) নয়ন **যার**। দুটিতেই বহুব্রীহি সমাস। সমাস ভেঙে অর্থাৎ ব্যাসবাক্যে উপমার পূর্ণরূপটি পাওয়া গেল। সমাসে উপমেয়টি ছাড়া আর সবই লুপ্ত হ'য়ে আছে।

মন্তব্য ঃ বহুব্রীহি সমাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে সমস্ত (compound) পদটির অর্থ তার পূর্ব্বপদ এবং উত্তরপদকে অতিক্রম ক'রে এদের বাইরে অন্য একটি পদকে আশ্রয় করে। এই কারণে বলা হয় "অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ।" 'পীত অম্বর যার' এই ব্যাসবাক্যের বহুব্রীহি সমাস 'পীতাম্বর' কথাটার অর্থ পীতও নয় অম্বরও নয়, শ্রীকৃষ্ণ। **'পীতাম্বর' দুই পদের বহুব্রীহি** ; পূর্ব্বপদ 'পীত' এবং উত্তরপদ 'অম্বর'। আমাদের **'তড়িত-বরণী', 'হরিণ-নয়নী' তিন পদের উপমাগর্ভ বহুব্রীহি**। হরিণ-নয়নী=**হরিণ-নয়নের মতো নয়ন যার** (সেই শ্রীরাধা)। **'হরিণ-নয়ন' উপমান পূর্ব্বপদ ;** 'মতো'-র পরবর্ত্তী **'নয়ন' উপমেয় উত্তরপদ**। কিন্তু 'হরিণ-নয়ন' দুই পদের ষষ্ঠীতৎপুরুষ ; ব্যাসবাক্য 'হরিণের নয়ন'—'হরিণের' পূর্ব্বপদ, 'নয়ন' উত্তরপদ। দেখা যাচ্ছে যে উপমান পূর্ব্বপদে একটি পূর্ব্বপদ এবং একটি উত্তরপদ রয়েছে। নয়নের সঙ্গে নয়নের উপমা হয় না, কারণ এরা **সজাতীয়** ; কিন্তু হরিণ-নয়ন এবং হরিণেতর অন্য নয়ন **বিজাতীয়** ব'লে এদের উপমায় বাধা নাই। আমাদের বহুব্রীহিব্যাসবাক্যে উপমান পূর্ব্বপদ 'হরিণ-নয়ন' যখন পূর্ব্বপদ 'হরিণের' এবং উত্তরপদ 'নয়ন' নিয়ে গঠিত, তখন বলতে হবে এই **'নয়ন' উপমান পূর্ব্বপদেরই উত্তরপদ। এই উত্তরপদ 'নয়ন'-টিই উপমান পূর্ব্বপদ 'হরিণ-নয়ন'-এর মুখ্য অংশ ; কারণ তৎপুরুষসমাসমাত্রই উত্তরপদপ্রধান** ; প্রকারান্তরে, এই 'নয়ন'-ই উপমান। পাণিনি-ব্যাকরণের

কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিক সূত্রে উপমাগর্ভ বহুব্রীহিতে এই উপমান পূর্ব্বপদেরই উত্তরপদলোপের কথা বলা হয়েছে ("উপমান-পূর্ব্বপদস্য চোত্তরপদলোপো বক্তব্যঃ")। এই উত্তরপদলোপই প্রকৃতপক্ষে **উপমান-লোপ**। এইবার দেখা যাক '**হরিণ-নয়নী**'-তে কি ঘটল।

হরিণ-নয়ন (-এর মতো) নয়ন যার=হরিণ-নয়ন; যার=রাধার, অতএব হরিণ-নয়ন+স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয়=হরিণ-নয়নী। এইবার পদগুলিকে বন্ধনীর মধ্যে পূরে লোপ দেখিয়ে দিই: **হরিণ**-(নয়ন ১) (-এর মতো ২) **নয়ন** (+স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ', যেহেতু 'নয়ন' রাধার) যার=হরিণ-নয়নী। আপন চোখ উড়িয়ে দিয়ে ওই চোখের **স্বভাবটুকুর** ব্যঞ্জনা নিয়ে '**হরিণ**' যুক্ত হ'ল রাধার '**নয়ন**'-এ। **স্বভাবটুকু** হ'ল **চঞ্চলতা**। এই চঞ্চলতাই উপমান উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম। তাহ'লে, **লুপ্ত** হল **উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম, তুলনাবাচক শব্দ**; **রইল** শুধু **উপমেয়**—এ উপমেয় রাধার **নয়ন** নয়, স্বয়ং নয়নের অধিকারিণী রাধা ("অন্যপদার্থ-প্রধানো বহুব্রীহিঃ")। রবীন্দ্রনাথের "কালো মেয়ের কালো **হরিণ-চোখ**" (আগে উদ্ধৃত করেছি) চরণটিতে 'হরিণ-চোখ' =হরিণ-চোখের মতো চোখ=হরিণ-(চোখের ৩) (মতো ৪) চোখ (সমাস উপমাগর্ভ কর্ম্মধারয়): উপমান লুপ্ত, তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত। রয়েছে 'হরিণ' বিশেষণের বিশেষ্য (কালো মেয়ের) চোখ উপমেয়, 'কালো' (দ্বিতীয়টি) সাধারণ ধর্ম্ম। মাঝখানকার উত্তরপদের লোপ অন্যভাবের ত্রিপদ বহুব্রীহিতেও হয়। প্রপতিত পর্ণ যার সে প্রপর্ণ (বৃক্ষ): আসল উত্তরপদ 'পর্ণ' অক্ষুণ্ণ রয়েছে, লোপ পেয়েছে 'প্র-পতিত'-র পত্ ধাতুজ 'পতিত' উত্তরপদটি ("প্রাদিভ্যঃ ধাতুজস্য…উত্তরপদলোপঃ"—কাত্যায়ন)।

এইভাবের আর একটি উদাহরণ—

(ii) "নীরবিলা **বীণাবাণী**।"—মধুসূদন।

'বীণাবাণী' প্রমীলা। বীণার বাণীর মতো বাণী যার।

১। (গ) মালোপমা

উপমেয় যেখানে মাত্র একটি এবং তার উপমান অনেক, সেইখানে হয় **মালোপমা**।

এ যেন উপমেয়ের গলায় উপমানের মালা।

(i) "মেহগনির মঞ্চ জুড়ি

পঞ্চ হাজার গ্রন্থ;

সোনার জলে দাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন
যূথী অনাঘ্রাতা।"—রবীন্দ্রনাথ।

—উপমেয় 'গ্রন্থ' ; উপমান 'মধু' আর 'যূথী'।

(ii) "প্রবালের মত রক্তিম আভায় এবং একরাশি পদ্মফুলের মত পেলবতায় অপরূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হ'য়ে তার স্তনভাণ্ড স্ফীত হ'য়ে ওঠে।"
—তারাশঙ্কর।

তার=কামধেনুর। উপমেয় 'স্তনভাণ্ড' ; উপমান 'প্রবাল', 'পদ্মফুল'।

(iii) "কুন্দেন্দু তুষার শঙ্খ শুচিশুভ্র সৌন্দর্য্যের রাণী,
মূর্ত্তিমাঝে উর বীণাপাণি।" —যতীন্দ্রমোহন।

—উপমেয় 'বীণাপাণি' ; উপমান 'কুন্দ', 'ইন্দু', 'তুষার', 'শঙ্খ'।

(iv) মলিনবদনা দেবী, হায় রে যেমতি,
খনির তিমির গর্ভে···সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।"—মধুসূদন।

(v) 'দৃষ্টি তব শরসম বিঁধিছে আমার
মর্ম্মখানি, দহিতেছে মোরে অনিবার
বহ্নির শিখার মতো, হলাহলসম
মূরছি তুলিছে নিত্য তনুমন মম।'—শ. চ.

(vi) "উদয়-শিখরে সূর্য্যের মতো সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত একটি নয়নসম।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "কমনীয় কণ্ঠ হ'তে সদ্য-উৎসারিত উৎসসম
গুঞ্জরিছে প্রভাতের প্রথম সঙ্গীত
মুঞ্জরিত মাধবীর আদিতম মঞ্জরীর মতন মধুর।"—শ্যামাপদ।
—উপমেয় 'সঙ্গীত' ; উপমান 'উৎস', 'মঞ্জরী'।

(viii) "সন্দীপ মন জাগাতে পারলো না এই মেয়ের? এ কি প্রবালের মতো কঠিন, জ্যোৎস্নার রেখার মতো শূন্য?"—জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

১ (ঘ)। বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা

বস্তুপ্রতিবস্তুর বিশদ ব্যাখ্যা করেছি প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারের ভূমিকায়। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। **একই সাধারণ ধর্ম্ম যদি উপমেয় আর**

উপমানে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহ'লে সাধারণ ধর্ম্মের এই ভিন্ন ভাষারূপদুটিকে বলা হয় বস্তু প্রতিবস্তু। এইভাবের উপমায় তুলনাবাচক শব্দ ভাষায় প্রকাশ করতেই হবে।

(i) "নিশাকালে যথা
মুদিত কমলদলে থাকে **গুপ্তভাবে**
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত।" —মধুসূদন।

—উপমেয় 'প্রেম', উপমান 'সৌরভ', সাধারণ ধর্ম্ম 'অন্তরিত'-'গুপ্তভাবে' বস্তুপ্রতিবস্তু। 'অন্তরিত' 'গুপ্তভাবে' ভাষায় বিভিন্ন, কিন্তু অর্থে এক —গোপনে। তুলনাবাচক শব্দ 'যথা'।

(ii) "তোমরা যেমন ক'রে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, **বুকে তার তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে,**
তেমনি **হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া**
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পর মোরে
নিয়ে যাও।" —রবীন্দ্রনাথ।

—তুলনাবাচক শব্দ 'যেমন' 'তেমনি'। উপমেয় 'মোরে' ('ইলা'র উক্তি বিক্রমদেবের প্রতি—'রাজা ও রানী'), উপমান 'হরিণী'। বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম স্থূলাক্ষর অংশদুটি।

(iii) "সবল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্ত্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার, ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে **শিখারূপে উঠে ঊর্দ্ধে**
চক্ষের নিমেষে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—উপমেয় 'দেহ', উপমান 'অগ্নি'; বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম স্থূলাক্ষর অংশদুটি। তুলনাবাচক শব্দ 'যথা'।

(iv) "**একটি** চুম্বন
ললাটে রখিয়া যাও, **একান্ত নির্জ্জন**
সন্ধ্যার তারার মতো।" —রবীন্দ্রনাথ।

(v) "দারুণ নখের ঘা হিয়াতে **বিরাজে**।
রক্তোৎপল **ভাসে** হেন নীল সরোমাঝে।" —চণ্ডীদাস।

(vi) "রকত-উৎপল ফুলে যৈছে ভ্রমর বুলে
ঐছে ফিরয়ে দুই আঁখি।" —চণ্ডীদাস।

(vii) "তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার , সর্ব্বদেহমন
পূর্ণ করি; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্তসুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি।" —রবীন্দ্রনাথ।

১। (ঙ) বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা

উপমেয়ের ধর্ম্ম এবং উপমানের ধর্ম্ম যদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, অথচ তাদের মধ্যে যদি একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য বোঝা যায়, তাহ'লে ওই ধর্ম্মদুটিকে বলা হয় **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম।**

বিশদ আলোচনা 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কারের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমায় **তুলনাবাচক শব্দ থাকতেই হবে।**

(i) "কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে
পাঁজর ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমতি
আসিতে যাইতে কাটে॥"—চণ্ডীদাস।

—উপমেয় 'কানুর পিরীতি', উপমান 'শঙ্খবণিকের করাত'। উপমেয়ের ধর্ম্ম 'বলিতে…উঠে' এবং উপমানের ধর্ম্ম 'আসিতে…কাটে'—বিভিন্ন। 'সকল অবস্থাতেই দুঃখময়' এই তাৎপর্য্যে ধর্ম্মদুটির সাদৃশ্য পাওয়া যাচ্ছে ব'লে এরা বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম।

(ii) "দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চল্‌তে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়॥" —রবীন্দ্রনাথ।

—উপমেয় 'শেষ আলোটি', উপমান 'বধূ'। স্থূলাক্ষর অংশদুটি দুই পক্ষের ধর্ম্ম—বিভিন্ন। প্রত্যাসন্ন আত্মীয়বিচ্ছেদের বেদনা দুটিকে পরস্পরের সদৃশ ক'রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্মে পরিণত করেছে। 'শেষ আলোটি'-র

রক্তিম আভা এই সঙ্গে স্মরণীয় ; বধূর 'নয়ন রাঙা' করার গতি হ'য়ে যাবে সহজেই। সুন্দর এই উদাহরণটি।

(iii) তুঁহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনী না সহে পরাণে ॥" —জ্ঞানদাস।

[তুঁহারি=তোমার ; পরথাপলুঁ=প্রস্তাব (বর্ণনা) করলাম ; আন=অন্য (বিপরীত) ; যৈছন=যেমন ; তুহিন=হিমকিরণ ; রজনীকর=চাঁদ।]

কৃষ্ণের প্রতি রাধাসম্পর্কে দূতীর উক্তি।

(iv) "ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা আপনার দুর্নিবার গতি-বেগে গড়ে যথা গ্রহে—
তেমনি বেদনা-সিন্ধু অক্লান্ত মন্থনে যেন উদ্‌গারিয়া তোলে শুধু মণি।"
—বুদ্ধদেব।

—'বেদনা-সিন্ধু'-তে রূপক অলঙ্কার ; তবু এই সমস্ত (compounded) পদটি আবার উপমেয়, উপমান 'নীহারিকা'।

(v) "বরিষার কালে, সখি, প্লাবনপীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে তীর অতিক্রমি
বারিরাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মন
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।"—মধুসূদন।

(vi) "আগুনে যেমন সব বিষ যায়,
প্রেমেও তেমনি সকলি শুচি।"—মোহিতলাল।

তুলনাবাচক কয়েকটি বিশেষ শব্দ

(i) "কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।"—চণ্ডীদাস।
(রীতি=মতো)

(ii) "জলদপ্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি।"—মধুসূদন।
(মেঘের মতো গর্জ্জনে)

(iii) "বারিদ, ভূধর, দেশ ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী- আকারে।"—হেমচন্দ্র।
(আকারে=মতো)

(iv) "ওই বঙ্গভূমি, বৎস, হিমাদ্রি আপনি
মুকুট-আকারে হের শোভে শিরোদেশে।"—যোগীন্দ্রনাথ বসু।

(v) "ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে।"—মধুসূদন।

তারাকারা=তারকার মতো। প্রথম 'তারা' বালির পত্নী, সুগ্রীবের ভ্রাতৃবধূ।

(vi) "বোঝাই হইল উঁচু পর্ব্বতের ন্যায়।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "সূর্য্যসমান হও গো উদয়, পোহায় না যে রাতি।"—করুণানিধান।

(viii) "বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়ামৃগ।" —মধুসূদন।

(ix) "রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরীর ছন্দ।" —মাধবীদাস।
(ছন্দ=মতো)

১। (চ) স্মরণোপমা (স্মরণ)

কোনো পদার্থের অনুভব থেকে যদি তৎসদৃশ অপর বস্তুর স্মৃতি মনে জেগে ওঠে, তবেই **স্মরণোপমা** অলঙ্কার হয় ("সদৃশানুভবাদ্বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে" —সাহিত্যদর্পণ)।

(i) "কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি ॥"—চণ্ডীদাস।

—জল, কেশ, অঞ্জন দেখে কালাকে (কৃষ্ণকে) রাধার মনে পড়ে—বর্ণসাদৃশ্যে। স্মরণ উপমা এই কারণে যে এখানে উপমেয় 'কালা', উপমান 'জল কেশ অঞ্জন' এবং সাধারণ ধর্ম্ম 'কাল'।

স্মৃতির উদ্দীপক এবং স্মৃত বস্তুদুটিকে বিজাতীয় হ'তে হবে। সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারগুলির এই বিশেষ লক্ষণটি সব সময় মনে রাখা উচিত। আর মনে রাখা উচিত যে বৈচিত্রীময় চমৎকারসৃষ্টিই সকল অলঙ্কারের একমাত্র লক্ষ্য।

'মনে পড়ে', 'স্মৃতিপথে ভেসে ওঠে' ইত্যাদির উল্লেখেও যেমন 'স্মরণোপমা' হয়, তেমনি অনুল্লেখেও হয় যদি স্মৃতিটি হয় ব্যঞ্জনালভ্য। পরে উদাহরণ-ব্যাখ্যায় একথা বোঝা যাবে।

সাদৃশ্য না থেকে যদি শুধু স্মৃতির পরিবেশটাই (association) সর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে 'মনে পড়ে' ইত্যাদি সত্ত্বেও সেখানে 'স্মরণোপমা' হবে না। একটা উদাহরণ দিই :

"বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালককালের কথা।

সেই মনে পড়ে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা-পলায়ন…”

—রবীন্দ্রনাথ।

—'তার'—আমগাছের। আমগাছটিকে দেখে উপেনের যেসব কথা মনে পড়ছে, আমগাছটির সঙ্গে তাদের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে অর্থাৎ গাছটির সূত্রে বিধৃত হ'য়ে আছে অবস্থা আর ঘটনাগুলি। গাছটিতে টান পড়তেই তারা সকলেই এসে পড়েছে Law of Association-এ। এখানে সাদৃশ্যের লেশও নাই—স্মরণোপমা অতএব অসম্ভব।

(ii) “শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলীবনে
শিশিরভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে?”—রবীন্দ্রনাথ।

—উপমায় যে স্মৃতিটি এখানে জেগেছে, সেটি বড় সূক্ষ্ম, বড়ই অনির্ব্বচনীয়। মাতৃস্নেহ শিশিরভেজা হাওয়া বেয়ে আসা ফুলের গন্ধের মতো স্নিগ্ধ ও মধুর। মোটামুটি উপমার ধারাটি এই: মা ফুলের সঙ্গে উপমিত হয়েছেন; (স্নেহ) উপমিত হয়েছে গন্ধের সঙ্গে। গন্ধানুভূতি সন্তানের মনে মাতৃস্নেহের সুপ্ত সংস্কারকে স্মৃতির রূপে জাগিয়ে তুলেছে।

(iii) “বরষায় আজি কদম্বতনু জড়ায়েছে শ্যামালতা;
সহসা পড়িল মনে মোর বঁধু হারানো দিনের কথা:
এমনি করিয়া তোমার বক্ষে লুটায়ে রহিত যবে
এ তনুবল্লী কণ্ঠ তোমার বাঁধি বাহুপল্লবে।”—শ. চ.

(iv) “তনুর লাবণি সনে
দেখিয়াছি পড়ে মনে
হরিৎধান্যব্যাকুল গ্রামের সীমা,
কাননকণ্ঠলগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা।”—প্রেমেন্দ্র।

(v) ‘চাপিয়া জননী যশোদার স্তন কচি দুটি মুঠিতলে,
বুকে রাখিয়া টুকটুকে ঠোঁটদুটি,
স্তন্য ভুলিয়া হাসে শিশু আনমনে:

দূরাতীত এক জনমের স্মৃতি সহসা একটি পলে
উঠেছে ফুটিয়া তিমিরাবরণ টুটি—
এমনি করিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়াছিনু কুরুসমরাঙ্গনে!'—শ. চ.

—একটি প্রাকৃত কবিতার অনুবাদ। যশোমতীর শুভ্র পীনস্তন মুঠিতলে চেপে তার বুকে মুখ রেখে কৃষ্ণ সহজেই স্মরণ করেছেন কুরুক্ষেত্রে শুভ্র পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজানোর কথা। সাদৃশ্যটি স্পষ্ট নয়, প্রতীয়মান; সৌন্দর্য্য এইখানে।

(vi) "পাখী তোর আন্‌চানানির চঞ্চলতার চম্‌কানিতে
কবেকার চোখদুটি কার ডাক দিয়ে যায় হাতছানিতে!
সে ছিল তোর মতনই মন্‌মোহিনী কৃষ্ণকলি"
—যতীন্দ্রমোহন।

—'পাখী'=ফিঙে। মনে পড়ার কথাটি এখানে ভাষায় প্রকাশিত নয়; ব্যঞ্জনায় পাওয়া যাচ্ছে।

কতকটা এইরকম একটি শ্লোক সংস্কৃতে রয়েছে এবং এটিও স্মরণোপমার উদাহরণ:

"অরবিন্দমিদং বীক্ষ্য খেলৎ-খঞ্জনমঞ্জুলম্। স্মরামি বদনং তস্যাশ্চারুচঞ্চল-লোচনম্॥" এর অনুবাদ ক'রে দিচ্ছি, কারণ অনুবাদটি স্মরণোপমার বাঙলা উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে:

(vii) নৃত্যনিরতখঞ্জনযুত মঞ্জুল এই পঙ্কজদরশনে
চঞ্চল-আঁখিমণ্ডিত-চারু মুখখানি তার পড়িছে আমার মনে।

(viii) 'নিঠুরা হরিণী, কি শান্তি তোর
আমার বক্ষ টুটি?
পারিবি কি দিতে আমার প্রিয়ার
ব্যাকুল নয়নদুটি?'—শ. চ.

—এ উদাহরণেরও বৈশিষ্ট্য এই যে এতে স্মৃতিটি ব্যঞ্জনায় প্রতীয়মান।

['মেঘনাদবধ' কাব্যের ভূমিকায় দীননাথ স্মরণ অলঙ্কারের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করেছেন—

"সুরাসুরবৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতি-সুত যত
বিবাদিল দেবসহ সুধামধুহেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।"

এখানে **স্মরণ অলঙ্কার হয় নাই**। উমাকে মোহিনীবেশে সাজিয়ে মদন

তাঁকে বলছেন, এ বেশে দেবী বেরুলে তাঁর রূপমাধুরীতে জগৎ মেতে উঠে একটা 'হিতে বিপরীত' ঘটিয়ে দেবে। পরেই বলছেন, সমুদ্রমন্থনে অমৃতলাভের পর দেবদৈত্যে যখন বিবাদ হয়, তখন বিষ্ণু মোহিনীবেশে সেজেছিলেন। তাঁর সে মোহিনীবেশ দেখে দেবদৈত্য একটা তুমুল কাণ্ড ঘটিয়েছিল। এর পরে মদন আবার বলছেন, "স্মরিলে সে কথা, সতি, **হাসি আসে মুখে।"** এখানে স্মরণ অলঙ্কারের লক্ষণ কই? মদন যদি বলতেন,—

'নিরখি তোমারে, দেবি, এ মোহিনীবেশে,

মনে হ'ল মুরারির মোহিনী মূরতি' ইত্যাদি, **তবু স্মরণ হ'ত না**; কারণ উপমেয় উপমান দুইই মোহিনী মূর্ত্তি অর্থাৎ স্বজাতি। তবু জোর ক'রে যদি বলতাম বিষ্ণু পুরুষ, উমা নারী, অতএব মোহিনীবেশব্যাপারে একটু বিজাতীয় ভাব আছে বৈকি, তাহ'লে না হয় স্মরণের পক্ষে একটু ওকালতি করা যেত। মোটের উপর, **দীননাথবাবুর উদাহরণে স্মরণ অলঙ্কার নাই।**]

২। *রূপক*

বিষয়ের অপহ্নব না ক'রে তার উপর বিষয়ীর অভেদ আরোপ করলে **রূপক** অলঙ্কার হয়।

(অপহ্নব=নিষেধ, অস্বীকার; বিষয়ী=উপমান)

আরোপ শব্দটির অর্থ এক কথায় বোঝানো অসম্ভব। ভাবটা এই: একটি বস্তুর উপর অন্য একটিকে এমনভাবে স্থাপন করা, যাতে দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে আপনার রূপে রূপায়িত ক'রে তোলে। এই অনুরঞ্জনের ফলে দুটি বিজাতীয় বস্তুকে এক ব'লে কল্পনা হয়।

এর থেকে আমরা বলতে পারি—**স্বরূপে অর্থাৎ বস্তুগতভাবে উপমেয় উপমান বিভিন্ন হ'লেও তাদের অতিসাম্য দেখাবার জন্যই কাল্পনিক অভেদারোপের নাম রূপক।** সোজা কথায়, রূপকে উপমান উপমেয়কে গ্রাস করে না (যেমন করে অতিশয়োক্তিতে—অতিশয়োক্তি অলঙ্কার এই সূত্রে তুলনীয়)। **রূপক অভেদপ্রধান অলঙ্কার, ঠিক অভেদসর্ব্বস্ব নয়। উপমা অলঙ্কারে উপমেয়টি মূল্যবান্**; কিন্তু **রূপকে মূল্য বেশী উপমানের।** উপমান উপমেয়কে গ্রাস না করলেও আচ্ছন্ন করে।

উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাক; কিন্তু সোজা পথে না গিয়ে, একটু বাঁকা পথ ধরি। মুখ আর চন্দ্রকে নিয়ে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার রচনা করতে কত রকমে এদুটিকে সাজানো যায় দেখা যাক:

(১) মুখ চন্দ্রসম, (২) মুখচন্দ্র, (৩) মুখ নয়, চন্দ্র, (৪) মুখ যেন চন্দ্র, (৫) মুখ ? না, চন্দ্র ? আরও হয় কিন্তু তাদের নিয়ে বর্ত্তমানে প্রয়োজন নাই।

প্রথমটিতে তুলনা (**উপমা**)। দ্বিতীয়টির কথা শেষে বলব। তৃতীয়টিতে মুখকে অস্বীকার বা অপহ্নব ক'রে তার জায়গায় উপমান চন্দ্রের কাল্পনিক প্রতিষ্ঠা (**অপহ্নুতি**)। চতুর্থটিতে মুখকে চন্দ্র ব'লে সংশয় (**উৎপ্রেক্ষা**)। পঞ্চমটিতে মুখ এবং চন্দ্র দুপক্ষেই সংশয় (**সন্দেহ**)। **দ্বিতীয়টিতে মুখই চন্দ্র** অর্থাৎ দুটি **অভিন্ন** এই কল্পনা। মুখচন্দ্র এখানে রূপককর্ম্মধারয় সমাস। এ সমাসের বৈশিষ্ট্য এই যে এতে উপমেয় উপমানের ভেদপ্রতীতি থাকে না এবং **ক্রিয়া-পদটি হয় উপমানের অনুগামী। এখন ক্রিয়া যার অনুগামী সে কর্ত্তা, কাজেই উপমানেরই প্রাধান্য**। উপমেয় অস্বীকৃত হবে না, কিন্তু থাকবে গৌণভাবে। এখানে **'কর্ত্তা'র অর্থ** কিন্তু Nominative Case নয়, **নিয়ন্তা**। যদি বলি 'মুখচন্দ্র চুমি', চুমি চন্দ্রের অনুগামী হ'ল কি ? অর্থাৎ চাঁদকে কেউ চুম্বন করে ? কিন্তু যদি বলি 'প্রিয়া, তব মুখচন্দ্র উদ্ভাসিল হৃদয় আমার', ক্রিয়া (উদ্ভাসিল) চাঁদের ঠিক অনুগত হয় এবং প্রমাণ ক'রে দেয় যে চাঁদ নিজের রূপে মুখকে রূপায়িত করেছে। ঠিক এমনটি হলেই হয় **রূপক অলঙ্কার**।

এইখানে একটা সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করতে হচ্ছে। যদি কোথাও দেখা যায় (দেখা যাওয়া অসম্ভব নয়) 'তনয়ের মুখচন্দ্র করিয়া চুম্বন, আশিষিলা তাহারে জননী', এটিকে যেন ভুল বলা না হয় ; কারণ 'মুখ চন্দ্রসম'-কেও সমাস করলে 'মুখচন্দ্র' হয়। এ মুখচন্দ্র **উপমিত কর্ম্মধারয়** সমাস ; এ সমাসে উপমান উপমেয়ের ভেদপ্রতীতি থাকে এবং **ক্রিয়াপদ হয় উপমেয়ের অনুগামী**। উপমেয় মুখ চুম্বন করা স্বাভাবিক। **অলঙ্কার এখানে উপমা**।

কিন্তু যদি কেউ বলে **'মুখচন্দ্র হেরিলাম'**, তাহ'লে কি **অলঙ্কার** হবে ? লোকে মুখও দেখে, চাঁদও দেখে অর্থাৎ আমাদের চোখের উপর আকর্ষণ মুখেরও আছে, চাঁদেরও আছে। কাজেই অলঙ্কার এখানে উপমাও হ'তে পারে, রূপকও হ'তে পারে ; অথচ কোনোটিই নির্ব্বিবাদে হ'তে পারে না। বলতেই হবে এটি **উপমা-রূপকের সঙ্কর (সঙ্কর ও সংসৃষ্টি দ্রষ্টব্য)**।

মুখ এবং চন্দ্রকে পাঁচ রকমে সাজিয়েছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে—কতকগুলি সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার থেকে রূপকের পার্থক্য দেখাতে। উপমা, অপহ্নুতি, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ কোনোটিতেই আরোপের প্রশ্ন নাই। তাছাড়া, রূপকে বিষয় বা উপমেয়ের নিষেধ হয় না ব'লে অপহ্নুতির সঙ্গে এর মিল নাই। উপমায়

উপমেয়-প্রাধান্য, রূপকে উপমান-প্রাধান্য। উৎপ্রেক্ষা সন্দেহসংশয়মূলক, রূপক আরোপমূলক।

[গোড়ায় ব'লে এসেছি—রূপক অভেদপ্রধান অলঙ্কার, ঠিক অভেদসর্ব্বস্ব নয়। কিন্তু অভেদপ্রাধান্যের পরিমাণ বা degree কতখানি, তা নিয়ে আলঙ্কারিকদের মতভেদ আছে। পাশ্চাত্য Metaphorএ অভেদের degree এত উঁচু যে আমাদের **অতিশয়োক্তি**, যাতে উপমানই সর্ব্বস্ব এবং উপমেয় উপমানের দ্বারা একেবারে গ্রস্ত হ'য়ে যায় (**অতিশয়োক্তি** দ্রষ্টব্য), সেই অতিশয়োক্তিও Metaphor ব'লে গণ্য হয় (অনেকে Metaphor-কে আমাদের রূপক বলেন, এ ধারণা ঠিক নয়)। "Pope Alexander desirous to **trouble the waters** of Italy, that he might **fish** the better"—Bacon : এটি পাশ্চাত্য মতে **Metaphor,** আমাদের মতে **অতিশয়োক্তি**। আবার আমাদের **সমাসোক্তিও Metaphor-এর সঙ্গে খানিকটা মেলে**। "I **bridle** my struggling Muse"—Addison : উপমেয় horse-কে উল্লেখ না ক'রে তার ব্যবহার Muse-এ আরোপ করায় এখানে আমাদের মতে **সমাসোক্তি**, ওদের Metaphor (**সমাসোক্তি** দ্রষ্টব্য)। সাহিত্যদর্পণে অভেদ বড় ব'লে স্বীকৃত না হওয়ায় উপমানপ্রাধান্যের degree কম হ'য়ে গেছে। 'মুখচন্দ্র দেখছি' আমার মতে খাঁটি রূপকের উদাহরণ নয়, একে উপমাও বলা চলে; কাজেই একে উপমা ও রূপকের **সঙ্করও** বলা চলে (একথা আগেই বিচার ক'রে দেখিয়েছি)। কিন্তু এটিকে বিশ্বনাথ খাঁটি রূপক বলেছেন ("রূপকে 'মুখচন্দ্রং পশ্যামি' ইত্যাদৌ আরোপ্যমাণচন্দ্রাদেঃ **উপরঞ্জকতামাত্রং, ন তু প্রকৃতে দর্শনাদৌ উপযোগঃ**")। এর একটা কারণ আছে। বিশ্বনাথ **পরিণাম** নামে পৃথক্ একটি অলঙ্কার সসম্মানে স্বীকার করেছেন ; যাতে, তাঁর মতে, উপমেয়-উপমান একাত্ম ("অন্বয়ঃ তাদাত্ম্যেন")। কাব্যপ্রকাশে বলা হয়েছে, উপমেয়-উপমানের যে **অভেদ**, তারই নাম **রূপক** ("রূপকং স্যাৎ অভেদো য উপমানোপমেয়য়োঃ")। রূপকে অভেদকে পূর্ণভাবে স্বীকার করায় অর্থাৎ উপমেয়-উপমান একাত্ম ব'লে গ্রহণ করায়, **মম্মটভট্ট (কাব্যপ্রকাশকার) পরিণামকে পৃথক্ অলঙ্কার ব'লে মানেন নাই**। তাঁর মতে পরিণাম রূপকই। **অলঙ্কারসর্ব্বস্ব** (রুয্যককৃত) গ্রন্থে বলা হয়েছে, "উপমা এব তিরোভূতভেদা রূপকম্", এখানেও অভেদ বা উপমেয় উপমানের একাত্মতা। বিশ্বনাথ রূপককে অনেকটা দুর্ব্বল করেছেন এবং তার সৌন্দর্য্যের অনেকটা হানি —ছেন ব'লে আমার বিশ্বাস।

রূপকের সংজ্ঞায় বিশ্বনাথ অভেদের প্রশ্নকে সাবধানে এড়িয়ে গেছেন—"রূপকং রূপিতারোপো বিষয়ে নিরপহ্নবে"।]

[**পরিণাম অলঙ্কারের** পৃথক্ আলোচনা আমি করব না। এইখানেই প্রসঙ্গতঃ দুচারটি কথা বলব; তবে **রূপক অলঙ্কার শেষ ক'রে এই অংশটুকু পড়াই যুক্তিসঙ্গত। অপ্পয়দীক্ষিত** পরিণামের যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা এই: "প্রসন্নেন দৃগব্জেন বীক্ষতে মদিরেক্ষণা" অর্থাৎ মদিরনয়না প্রসন্ন নয়নকমলের দ্বারা দর্শন করছেন। টীকায় আশাধর বলেছেন, 'কমল তো নিজে দেখতে পারে না, তাই সে নয়ন হ'য়ে দেখছে ("কমলং হি স্বয়ং দ্রষ্টুম্ অশক্তং নেত্ররূপং ভূত্বা পশ্যতি")। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে উপমান কমল উপমেয় নয়ন হ'য়ে যাচ্ছে—কবিপ্রসিদ্ধির বিপরীত, কতকটা **প্রতীপ অলঙ্কারের** মতন (**প্রতীপ** দ্রষ্টব্য)। পরিণাম যে প্রতীপের মতন একথা **জগন্নাথের রসগঙ্গাধরের** টীকায় **নাগেশভট্ট** বলেছেন: "উপমেয়-প্রতিযোগিকাভেদঃ **পরিণামঃ প্রতীপবৎ**।" **বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে** বলেছেন, উপমান উপমেয়ের একাত্মরূপে **পরিণত** হয় ব'লে এর নাম পরিণাম। উপমেয়ের সঙ্গে উপমান একরকম কাজ করায় দুয়ের অভেদপ্রতীতির যে ধারার সৃষ্টি হয় তাই পরিণাম—এই হ'ল তর্কবাগীশ মহাশয়ের টীকা। দেখা যাচ্ছে অপ্পয়-বিশ্বনাথ পরিণামে তত্ত্বতঃ এক। তর্কবাগীশ একটা নতুন কথা যোগ করেছেন: **হওয়া বা করার অর্থযুক্ত ক্রিয়াপদের যোগ পরিণামে থাকে** ("ভবত্যর্থস্য করোত্যর্থস্য ধাতোঃ প্রয়োগঃ")। (হিমালয়ে) 'ওষধিগুলি বনেচর বনিতাসখাদের…সুরত-প্রদীপ হয়'—সাহিত্যদর্পণের অন্যতর উদাহরণ। ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ বলেছেন, প্রদীপ ওষধির সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় প্রকৃতিবিষয়ে রতিক্রিয়ার অনুকূল অন্ধকারনাশ ক'রে উপকার করছে।

"এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্রসূর্য্যতারারূপে দীপে অহরহ।"—মেঘনাদবধ হ'তে গৃহীত দীননাথের এই উদাহরণটিতে 'পরিণাম' অলঙ্কার নাই। সাহিত্যদর্পণে প্রদীপ যেমন ওষধি হ'য়ে অন্ধকার নাশ করছে, এখানে তেমনি চন্দ্রসূর্য্যতারা বিধাতার হাসি হ'য়ে দীপ্তি পাচ্ছে না। এখানে হাসি (উপমেয়) চন্দ্রসূর্য্যতারা (উপমানে) পরিণত হয়েছে; উপমান উপমেয়ে পরিণত হয় নাই। তাছাড়া 'হওয়া' 'করা' বোঝায় এমন ক্রিয়ার অভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "আগ্রহে সমস্ত তার প্রাণমনকায়, একখানি বাহু হ'য়ে ধরিবারে ধায়"-তে হ'য়ে থাকা

সত্ত্বেও ঐ আগেরই মতন; কাজেই পরিণাম নয়। এমন উদাহরণ বাঙলা সাহিত্যে প্রচুর আছে:

(i) "**তোমাদেরে** তবে **বাঁশরী করিয়া বাজাইব** বনমাঝে"

—কালিদাস (তোমাদেরে = ললিতা প্রভৃতিকে)।

(ii) "**ফুলগুলো ধায় ফড়িঙ্‌ হ'য়ে** উড়নফুলের রূপ ধ'রে"

—সত্যেন্দ্রনাথ।

(iii) "তিলে তিলে **আমি তব মৃত্যু হবো, নিঃশেষ করিব** তোমা।"

—বুদ্ধদেব।

এইজাতীয় উদাহরণগুলিকে **রূপক** ব'লেই ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু বিদ্যাপতির "**রাহু মেঘ ভএ গরসল সুর**", **পরিণাম** অলঙ্কারের উদাহরণ। হিমালয়ে ওষধিরা স্বয়ং দীপ্তিমান্‌, (জোনাকী পোকার মতন phosphoric উপাদান থাকায়), প্রদীপ ওদের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে অন্ধকারনাশে ওদেরই উপকারী হয়েছে। এখানেও তেমনি মেঘ সূর্য্য গ্রাস করে; উপমান রাহু উপমেয় মেঘের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে সূর্য্যগ্রাসের ব্যাপারে মেঘেরই উপকারী হয়েছে। (ভএ = হ'য়ে; সুর = সূর্য্য)। ঠিক এমনি নিখুঁত উদাহরণ বাঙলায় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে, আমি পাই নাই।]

রূপকের প্রকারভেদ: (ক) **নিরঙ্গ**, (খ) **সাঙ্গ** এবং (গ) **পরম্পরিত**। **নিরঙ্গ** আবার দুরকম—**কেবল** এবং **মালা**।

২। (ক) নিরঙ্গরূপক

(I) **কেবল** (**একটি** বিষয় বা উপমেয়ের উপর **একটি** বিষয়ী বা উপমানের আরোপ):

(i) "**আত্মগ্লানির তুষানল** আজ তাহাকে আর তেমন করিয়া **দগ্ধ** করিতেছিল না।" —শরৎচন্দ্র।

—উপমেয় (বিষয়) 'আত্মগ্লানি', উপমান (বিষয়ী) 'তুষানল'। '**দগ্ধ**' পদটি **উপমানের অনুগামী**—আত্মগ্লানি দগ্ধ করে না, দগ্ধ করে তুষানল। উপমানই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং উপমেয়কে **অপহ্নব** (অস্বীকার, নিষে[illegible] না ক'রে গৌণভাবে রেখে দিয়েছে। 'দগ্ধ' কথাটি আমাদের মনকে আকর্ষণ করায় আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে 'তুষানল'-এ, 'আত্মগ্[illegible] উপমান উপমেয়কে একেবারে **গ্রাস** ক'রে ফেলে নাই; কিন্[illegible] অর্থাৎ বহুলাংশে আপনরূপে রূপায়িত করেছে। উপ[illegible]

করায় উপমেয় উপমান **সমমূল্য** হ'তে পারে নাই। উপমেয় উপমান **সমমূল্য** হ'লে হ'ত **উপমা** অলঙ্কার। উপমান উপমেয়কে **অপহ্নব** অর্থাৎ অস্বীকার করলে অলঙ্কার হ'ত **অপহ্নুতি**। উপমান উপমেয়কে **গ্রাস** ক'রে ফেললে হ'ত **অতিশয়োক্তি** অলঙ্কার। আমাদের উদাহরণে উপমেয় উপমানের রূপ ধ'রে কাজ করছে—আত্মগ্লানি তুষানলের রূপ ধ'রে দগ্ধ করছে। এই কারণে অলঙ্কার **রূপক**। পরের উদাহরণগুলিও এইভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বুঝে নিতে হবে: 'দুস্তর', 'ফুটে', 'বুনি', 'ফুটায়', 'বিঁধিতে', 'পার', 'বুনিছে', 'বিকসিত', 'মাড়িয়ে চলে'—প্রত্যেকটি **উপমানের অনুগত** হওয়ায় **রূপক** সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(ii) "**লজ্জার বারিধিও** আজ ততটা **দুস্তর** বলিয়া বোধ হইল না।"
—শরৎচন্দ্র।

(iii) "**শিশুফুলগুলি** তোমারে ঘেরিয়া **ফুটে**" —যতীন্দ্রমোহন।
(তোমারে = বঙ্গবধূকে)

(iv) "আসল কথাটা চাপা দিতে, ভাই,
কাব্যের জাল বুনি" —যতীন্দ্রনাথ।

(v) "**ফুটায়** মনে কি মন্তরে **খুসীর শতদল**" —সত্যেন্দ্রনাথ।

(vi) "**নয়নকটাখে বিষম বিশিখে**
পরাণ **বিঁধিতে** চায়।" —গোবিন্দদাস।
(বিশিখে = শরে)

(vii) "**বিরহপয়োধি পার** কিয়ে পাওয়ব" —বিদ্যাপতি।

(viii) "বসি কবিগণ
সোনার **উপমাসূত্রে বুনিছে** বসন।" —রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "**বিকসিত** বিশ্ব**বাসনার**
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার" —রবীন্দ্রনাথ।

(x) "**যৌবনেরি মৌবনে** সে **মাড়িয়ে চলে** ফুলগুলি"
যেমন
—মোহিতলাল।

বিধাতার (xi) "ব্যথিত ধরার হৃৎপিণ্ডটি
(উপমানে) পা। আমি যে রক্তজবা।" —সত্যেন্দ্রনাথ।

'হওয়া' 'করা' বো[illegible]রণগুলিকে **তিনটি** শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়: (১) **শিশুফুল**, সমস্ত তার প্রাণমনকা **উপমাসূত্র** এই তিনটিতে উপমেয়-উপমান সমাসবদ্ধ।

আচার্য্য দণ্ডীর কাব্যাদর্শ-মতে এগুলিতে **সমস্ত** (সমাসযুক্ত) **রূপক**। (২) **নয়নকটাখে বিষম বিশিখে**-তে উপমেয় উপমান সমবিভক্তিক স্বাধীন বিশেষ্যপদ, সমাসে বাঁধা নয়। দণ্ডিমতে এখানে **ব্যস্ত** (অসমাসবদ্ধ) **রূপক**। "ব্যথিত ধরার **হৃৎপিণ্ডটি** (উপমান) **আমি যে রক্তজবা**" (উপমেয়)—সত্যেন্দ্রনাথের এই চরণটিতে অমনি **ব্যস্ত রূপক**। (৩) **আত্মগ্লানির তুষানল, লজ্জার বারিধি, কাব্যের জাল, খুসীর শতদল, বিশ্ববাসনার অরবিন্দ** এবং **যৌবনেরি যৌবনে**—এ ছয়টিতে উপমেয় ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত। আমরা বাঙলা ব্যাকরণে এইজাতীয় ষষ্ঠীর নাম দিয়েছি রূপকষষ্ঠী বা অভেদষষ্ঠী (আমার **'সরল বাঙলা ব্যাকরণ'**-এ 'ষষ্ঠী বিভক্তি' দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃতে অভেদষষ্ঠী ব'লে কিছু নাই। এটি বাঙলার নিজস্ব। সংস্কৃতে উপমেয়কে তৃতীয়ান্ত ক'রে রূপকসৃষ্টির একটি পদ্ধতি আছে। সাহিত্যদর্পণে একে 'বৈয়ধিকরণ্যে' রূপক বলা হয়েছে—এর অর্থ উপমেয় উপমান যেখানে বিভিন্ন-বিভক্তিযুক্ত ; উদাহরণ দেওয়া হয়েছে "বিদধে মধুপশ্রেণীমিহ **ভ্রূলতয়া** বিধিঃ" ('**ভ্রূলতায়** বিধি রচিল.মধুপমালা'—শ. চ.) এই তৃতীয়াকে টীকাকার রামচরণ '**অভেদে** তৃতীয়া' বলেছেন, যদিও 'অভেদে তৃতীয়া' ব'লে কোনো তৃতীয়া পাণিনি প্রভৃতি স্বীকার করেন নাই। তবু অভেদে তৃতীয়া টীকাকারকে বলতে হয়েছে এই কারণে যে অন্য কোনো রকমের তৃতীয়ায় 'তাদাত্ম্য' (উপমেয়-উপমানের অভেদ) প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ("অন্যথা তাদাত্ম্যারোপো ন স্যাৎ")। টীকাকারকে আমরা অভিনন্দিত করি ; কারণ তাঁরই পন্থায় ব্যাকরণসম্মত না হ'লেও 'অভেদে ষষ্ঠী (রূপকষষ্ঠী)' আমরা মেনে নিয়েছি বাঙলাভাষার প্রকৃতি-বিচারে। এইভাবের রূপক বাঙলায় অত্যন্ত বেশী।

(II) **মালা** (একটি বিষয়ের উপর **বহু বিষয়ীর** আরোপ হ'লে **মালা-রূপক** হয়) :

(i) "শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না' ॥" —বিদ্যাপতি।
—বিষয় পিয়া ; বিষয়ী ওঢ়নী (গাত্রাবরণ),
বা (বাতাস), ছত্র (ছাতা) এবং না' (নৌকা)।
[গিরীষ=গ্রীষ্ম ; দরিয়া=সমুদ্র]

(ii) "মরুভূমে প্রবাহিনী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি,
তপনতাপিতা আমি জুড়ালে আমারে !

মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে !
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম, ভুজঙ্গিনীরূপী
এ কাল কনকলঙ্কাশিরে শিরোমণি !" —মধুসূদন।
(মোর=সীতার ; তুমি=সরমা)

(iii) "ছোট্ট নেবুর ফুল—
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা,
গুপ্তপ্রেমের সুপ্ত পিয়াসা,
বিরহের বুলবুল !" —যতীন্দ্রমোহন।

(iv) "হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার ;
দেহক সরবস গেহক সার ॥" —বিদ্যাপতি।

অনুবাদ ক'রে দিলাম—

"আমার করের মুকুর তুমি, মোর কবরীর ফুল,
আঁখির কাজল, আমার ঠোঁটের টুকটুকে তাম্বূল,
আমার বুকের মৃগমদ, আমার গলার হার,
দেহের আমার সকল তুমি, গেহের তুমি সার।"—শ. চ.

(গীম=গ্রীবা ; সরবস=সর্ব্বস্ব। 'ক' মৈথিলভাষার ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন)

(v) "অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্তশয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে" —রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্ন কাঁটা ?" —রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি, ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল,
আলাদীনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল।"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

(viii) "শেফালীসৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস, ভোরের ভৈরবী"

—বুদ্ধদেব।

২। (খ) সাঙ্গরূপক

অঙ্গসমেত অঙ্গী উপমেয়ের (বিষয়ের) উপর **অঙ্গসমেত অঙ্গী** উপমানের (বিষয়ীর) অভেদারোপ হ'লে **সাঙ্গরূপক** অলঙ্কার হয় ("অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ"—সাহিত্যদর্পণ)।

একটা উদাহরণ বিশ্লেষণ ক'রে ব্যাখ্যা করলেই সাঙ্গরূপকের তাৎপর্য্য সহজে বোঝা যাবে। ধরা যাক, চরণকে পঙ্কজ বলা হয়েছে অর্থাৎ উপমেয় (বিষয়) চরণে উপমান (বিষয়ী) পঙ্কজ আরোপ ক'রে রূপক করা হয়েছে। কিন্তু চরণ বলতে অঙ্গুলি ও নখের প্রশ্ন উঠতে পারে, যেহেতু এগুলি চরণের **অঙ্গ**। এই অঙ্গগুলি যার সে **অঙ্গী** (অঙ্গ+অস্ত্যর্থে ইন্); কাজেই **চরণ অঙ্গী** (অর্থাৎ উপমেয় বা বিষয় **অঙ্গী**)। তেমনি পঙ্কজ বলতে তার দল ও কেসরের প্রশ্নও উঠতে পারে; কারণ, এগুলি পঙ্কজের **অঙ্গ**। অতএব চরণের মতো **পঙ্কজও অঙ্গী** (অর্থাৎ উপমান বা বিষয়ী অঙ্গী)। তাহ'লে **চরণপঙ্কজ** বলতে উপমেয় **অঙ্গী** (চরণ)-র উপর উপমান **অঙ্গী** (পঙ্কজ)-র অভেদারোপজনিত রূপক বোঝাচ্ছে। এইবার অঙ্গগুলিরও রূপক করা যাক :

"**তাম্রাঙ্গুলি যার দল, নখজ্যোতিঃ কেশর যাহার,**
ধরে শিরে নৃপবৃন্দ সে **চরণপঙ্কজ** তোমার।"—শ. চ.

(এটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ।) তাম্র=আরক্তবর্ণ।

এই **সাঙ্গরূপক** মোটামুটি **দুরকমের**—(I) **সমস্তবস্তুবিষয়ক** এবং (II) **একদেশবিবর্ত্তি** :

(I) যে উপমানগুলি আরোপিত হয়, তাদের সবগুলিই যদি শব্দোপাত্ত (শব্দপ্রয়োগে প্রকাশিত) হয়, তাহ'লে **সমস্তবস্তুবিষয়ক সাঙ্গরূপক** পাওয়া যায়। এইমাত্র ব্যাখ্যাসূত্রে যে উদাহরণটি দিলাম, সেটি এই লক্ষণাক্রান্ত। আরও উদাহরণ :

(i) "কোদালে' মেঘের মউজ উঠেছে
আকাশের নীলগাঙে
হাবুডুবু খায় তারাবুদ্‌বুদ্।"—নজরুল ইস্‌লাম।

—আকাশ অঙ্গী উপমেয়; মেঘ, তারা আকাশের অঙ্গ এবং নীলগাঙ অঙ্গী উপমান; মউজ (ঢেউ), বুদ্‌বুদ্ নীলগাঙের অঙ্গ।

(ii) "নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়ে রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে।
দিয়ে হাস্যসুধাচার অঙ্গচ্ছটা আঠা তার।"—জগদানন্দ।

—কৃষ্ণকে ব্যাধরূপে কল্পনা ক'রে রূপক করা হয়েছে। উপমেয় 'নন্দের নন্দন' অঙ্গী; তার অঙ্গ রূপ, হাস্য, অঙ্গচ্ছটা। উপমান 'ব্যাধ' অঙ্গী; তার অঙ্গ ফাঁদ, চার (bait), আঠা (আঠাকাটি)—যেহেতু এগুলি বাদ দিলে ব্যাধের চলে না। অঙ্গী ও অঙ্গ সর্ব্বত্রই রূপক ব'লে এটি সাঙ্গরূপকের উদাহরণ।

(iii) "হৃদিবৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
মুক্তিকামনা আমারি হবে বৃন্দা গোপনারী
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥"—দাশরথি।

—হৃদয়কে বৃন্দাবন বলায় রূপক হয়েছে। রাধা, বৃন্দা, নন্দপুরী, যশোমতী—এগুলি কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অঙ্গ। কাজেই বৃন্দাবন অঙ্গী উপমান। হৃদয় উপমেয় অঙ্গী এবং তার অঙ্গ ভক্তি, মুক্তিকামনা, দেহ, স্নেহ। অঙ্গী ও অঙ্গ সর্ব্বত্রই রূপক হওয়ায় অলঙ্কার এখানে সাঙ্গরূপক হয়েছে।

(iv) "শোকের ঝড় বহিল সভাতে;
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন
নিশ্বাস প্রবলবায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।"—মধুসূদন।

—এখানে শোকের সঙ্গে ঝড়ের রূপক হয়েছে। শোকের আশ্রয় বা আধার বামাকুল এবং মুক্তকেশ (আলুথালু কেশ) শোকের অন্যতম প্রকাশচিহ্ন। বামাকুল, মুক্তকেশ, ঘন নিশ্বাস, অশ্রুবারিধারা, হাহাকার রব—এগুলি উপমেয় অঙ্গী শোকের অঙ্গ। তেমনি আবার ঝড় (উপমান অঙ্গী)-এর অঙ্গ সুরসুন্দরী (বিদ্যুৎ), মেঘমালা, প্রবলবায়ু, আসার (বর্ষণ), জীমূতমন্দ্র (মেঘগর্জ্জন)।

(v) "দেহদীপাধারে জ্বলিত লেলিহ যৌবন-জয়শিখা"—অচিন্ত্যকুমার।

—উপমেয় দেহ অঙ্গী এবং তার অঙ্গ যৌবন; দীপাধার (উপমান) অঙ্গী এবং তার অঙ্গ শিখা। অঙ্গীতে অঙ্গীতে এবং তাদের অঙ্গে অঙ্গে রূপক; কাজেই সাঙ্গরূপক।

(vi) "শঙ্খধবল আকাশগাঙে
শুভ্র মেঘের পালটি মেলে

জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?"—যতীন্দ্রমোহন।

(vii) "বক্ষবীণায় বেদনার তার
এই মত পুনঃ বাঁধিব আবার"—রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "অশান্ত আকাঙ্ক্ষাপাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর-পিঞ্জরে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "শোভে ভুজমৃণাল লাবণ্যসরোবরে।
পাণি-পদ্ম প্রকাশে নখর-রবিকরে॥"—মদনমোহন।

(x) "গৌর নাগর রসের সাগর
ভাবের তরঙ্গ তায়।" —উদ্ধবদাস।

(xi) "বিশ্বব্যাপী একখানা ঘননীল **ঘুমের নিকষ,**
তার বুকে দীপ্যমান একটি **স্বপ্নের স্বর্ণ-লেখা**—
তুমি!" —শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

['মেঘনাদবধ' কাব্যের ভূমিকায় দীননাথ সাঙ্গরূপকের উদাহরণ ব'লে উদ্ধৃত করেছেন—

"মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।"

কিন্তু এখানে সাঙ্গরূপক বলা যায় না; কারণ, অঙ্গী উপমেয় রথ উপমান মেঘের সঙ্গে রূপক হয় নাই। "মেঘবর্ণ রথ"=মেঘের বর্ণের **মতন** বর্ণ যার এমন রথ; অলঙ্কার এখানে **লুপ্তোপমা**। অঙ্গীতে যখন রূপক হ'ল না তখন অঙ্গের প্রশ্নই ওঠে না।]

i) "দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কালামাণিকের মালা গাঁথি নিজগলে।
কানুগুণযশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙাবসন পরিব।
কানুর কলঙ্কছাই অঙ্গেতে লেপিব॥"—চণ্ডীদাস।

"আমাদের জীবনের নদী—
মৃত্যুর সমুদ্রে মিশিয়াছে।" —বুদ্ধদেব।

(II) **একদেশবিবর্ত্তি সাঙ্গরূপক**—উপমানগুলির কোনোটি বা কোনো কোনোটি যদি ভাষায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হ'য়ে, অর্থে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়, তবেই হয় **একদেশবিবর্ত্তি সাঙ্গরূপক।**

প্রথমে একটি সংস্কৃত শ্লোকের* মুক্ত অনুবাদ ক'রে তার থেকে আলোচ্য রূপকের স্বরূপটি বুঝিয়ে দিচ্ছি—

(i) 'লাবণ্যের মধুভরা বিকশিত তন্বীর বয়ান
পুরুষের আঁখিভৃঙ্গ কেন বল না করিবে পান?'—শ. চ.

—মুখের লাবণ্যকে মধু বললে মুখকে ফুল বলতে হয়। কিন্তু কবি মুখকে ফুল বলেন নাই; তবু অর্থে তা চমৎকার বোঝা যাচ্ছে—'বিকশিত' হওয়া মুখের পক্ষে সম্ভব নয় ব'লে এটি ফুলের দিকেই নির্দ্দেশ দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, ফুল উপমান (বিষয়ী)।

(ii) "নীলপাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফ্‌রানীস্থান!"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

—নীলপাহাড়কে ফুলদানী করা হয়েছে। ফুলদানীতে ফুল থাকে; কাজেই জাফ্‌রানীস্থানে ফুল আরোপ করা হয়েছে—'প্রফুল্ল' শব্দটি ঐ নির্দ্দেশই দিচ্ছে। কবি ফুল শব্দটি ব্যক্ত করেন নাই; কিন্তু অর্থে বোঝা গেল।

(iii) "কেমনে
কবিতারসের সরে রাজহংসকুলে
মিলি করি কেলি **আমি**···?" —মধুসূদন।

(iv) "আকাশের সর্বরস **রৌদ্ররসনায়**
লেহন করিল **সূর্য**।" —রবীন্দ্রনাথ।

২। (গ) পরম্পরিত রূপক

যদি একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অন্য উপমেয়ে তার উপমানের আরোপের কারণ হয়, তবেই হয় **পরম্পরিত রূপক** ("যত্র কস্যচিদারো··· পরারোপণকারণম্। তৎ পরম্পরিতম···" —সাহিত্যদর্পণ)।

[এ অলঙ্কারে রূপকে রূপকে কার্য্যকারণভাবের পরম্পরা ··· ব'লে এর নাম পরম্পরিত। সাঙ্গরূপকের মতো অঙ্গের বা অ··· ওঠেই না।]

* "লাবণ্যমধুভিঃ পূর্ণমাস্যমস্যা বিকস্বরম্।
লোকলোচনরোলম্বকদম্বৈঃ কৈর্ন পীযতে॥"
—রোলম্ব—ভ্রমর, কদম্ব—সমূহ।

iii)

(i) "কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি,
আঁধারি **হৃদয়াকাশ তুই পূর্ণশশী**
আমার ?" —মধুসূদন।

—তুই (ইন্দ্রজিৎ)-তে পূর্ণশশীর আরোপই হৃদয়ে আকাশারোপের কারণ।

(ii) "চেতনার নটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন-নেপথ্যের অভিনয় কর প্রযোজন।"—বুদ্ধদেব।

—চেতনাকে নটমঞ্চ ব'লে রূপক করাই নিদ্রাকে যবনিকা এবং অচেতনকে নেপথ্য ব'লে রূপক করার কারণ।

(iii) "শ্যামশুকপাখী সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরিল নয়নফাঁদে।
হৃদয়পিঞ্জরে রাখিল তাহারে
মনহি শিকলে বেঁধে॥" —চণ্ডীদাস।

—শ্যামকে শুকপাখী ব'লে রূপক করাই নয়ন, হৃদয় এবং মনকে যথাক্রমে ফাঁদ, পিঞ্জর এবং শিকল ব'লে রূপক করার কারণ। এখানে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ না থাকায় সাঙ্গরূপক হ'ল না, কার্য্যকারণ-সম্পর্ক থাকায় পরম্পরিত রূপক হ'ল।

(iv) "**বিস্মৃতির পার** হ'তে **অবচেতনার**
ক্ষীণ-তোয়া **তটিনী**-উজানে
অতিদূর অতীতের **জীবনতরণী**খানি তার
ধীরে ধীরে আসিতেছে **স্মৃতিতট**পানে।" —শ্যামাপদ।

—বিষয় (উপমেয়) চারটি : বিস্মৃতি, অবচেতনা, অতীতের জীবন এবং স্মৃতি ; এদের যথাক্রমিক উপমান অর্থাৎ বিষয়ী : পার, তটিনী, তরণী এবং তট। জীবনকে তরণী ব'লে রূপক করাই অন্যরূপকগুলির কারণ। অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। রূপক পরম্পরিত।

(v) "এখনো যে দেহ রূপোর পাত রে,
হীরের টুকরো আঁখি ;
**মরণের শীত নিবারণ করে
বরফের কাঁথা ঢাকি !"**

—হাটে বিক্রীর জন্যে আনা বরফঢাকা মাছের কথা। স্থূলাক্ষর অংশে [প]রম্পরিত রূপক। প্রথমাংশের দুটিকে বলতে পারতাম প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা ; [কি]ন্তু 'যে' অব্যয়টি থাকায় রূপক ছাড়া অন্য কিছু বলা চলল না।

(vi) "যদিও সকল হাস্য-ফেনপুঞ্জতলে
জানি ক্ষুদ্ধ ব্যথাসিন্ধু দোলে।"—প্রেমেন্দ্র।

(vii) "ষড়ধ্যায়ের বিশ্বকাব্যে নবরসে মহামেলা,
মাঝখানে তার এই নিদাঘের বীররৌদ্রের খেলা।"
—কালিদাস।

—বিশ্বকে কাব্য ব'লে রূপক করায় নিদাঘ (গ্রীষ্ম)-কে বীররৌদ্র রস ব'লে রূপক করতে হয়েছে। প্রথম রূপকটি অপর রূপকের কারণ হওয়ায় অলঙ্কার পরম্পরিত রূপক হয়েছে।

(viii) "অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি শতদল"—রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "বীর্যসিংহ 'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া"—রবীন্দ্রনাথ।

—দয়াকে জগদ্ধাত্রী বলা হয়েছে। এই কারণে জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহকে বীর্য্যে আরোপিত ক'রে রূপক করা হয়েছে। কাজেই সমগ্রটি পরম্পরিত রূপক।

(x) "নয়নচকোর কানুমুখশশীবর
কয়ল অমিয়রসপান।" —বিদ্যাপতি।

(xi) "দুসহ বিরহ সাগরে বড়াঈ
তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা"—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
(তোহ্মেসি আহ্মার=তুমি হও আমার)

(xii) "সৌন্দর্য্য-পাথারে
যে বেদনাবায়ুভরে ছুটে মনোতরী
সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি,
ছিন্ন হ'য়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
ঝর্ঝর সঙ্গীতে,
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা—" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiv) "তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছো ভবিষ্যৎ আর
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা।"
—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য।

(xv) "জীবন মধুর! মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পায়,
যত দিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়!"
—মোহিতলাল।

২। (ঘ) অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপক

উপমানে কোনো অসম্ভব ধর্ম্মের কল্পনা ক'রে যদি সেই অসম্ভব ধর্ম্মযুক্ত উপমানটিকে উপমেয়ে আরোপ করা হয়, তবে এই অলঙ্কার হয়।

(i) "বয়ন শরদসুধানিধি **নিষ্কলঙ্ক**"—জ্ঞানদাস।

—(রাধার) বদন শরচ্চন্দ্র; কিন্তু চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, রাধামুখে নাই। চাঁদের পক্ষে নিষ্কলঙ্ক হওয়া তো সম্ভব নয়; তবু কবি এই অসম্ভবকে কল্পনা ক'রেই 'নিষ্কলঙ্ক' চাঁদকে আরোপ করেছেন রাধার 'বয়ন' (বদন)-এ।

(ii) "ও নব জলধর অঙ্গ;
ইহ **থির** বিজুরীতরঙ্গ।"—গোবিন্দদাস।

—'ও অঙ্গ' কৃষ্ণ, 'ইহ' রাধা। বিদ্যুৎতরঙ্গকে স্থির (থির) কল্পনা ক'রে তবে রাধায় আরোপ করা হয়েছে।

(iii) "নাহি কালদেশ তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি **অচপল** দামিনী" —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "অপরূব পেখনু রামা
...**হরিণহীন** হিমধামা"—বিদ্যাপতি।
(হরিণ=কলঙ্ক; হিমধামা=চন্দ্র; রামা=রাধা)

(v) "**থির বিজুরী** নবীনা গোরী পেখনু ঘাটের কূলে"
—চণ্ডীদাস।

৩। উল্লেখ

বহু গুণ থাকার জন্য একই বস্তু যদি (ক) বিভিন্ন লোকের দ্বারা বিভিন্ন-ভাবে গৃহীত হয় অথবা (খ) একই লোক যদি তাকে বহু দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে তাহ'লে **উল্লেখ অলঙ্কার** হয়। লক্ষ্য অবশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি।

(ক) (i) 'হে তন্বী, ভোগীর তুমি কামনার ধন,
তপস্বীর বিভীষিকা, কবির স্বপন।'—শ. বন্ধু মিত্র।

'তন্বী' বিভিন্ন ব্যক্তির (ভোগী, তপস্বী, কবি)

(খ) (ii) 'মহিমায় মহাসিন্ধু, গৌরবে উন্নত —দীনবন্ধু মিত্র।
তেজে বজ্র তুমি, রাজা, স্নেহে ...বিনার ...মোগলের রাজলক্ষ্মী।)

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা। সম্ভাবনার (উৎকট এ[কবোধ নিশ্চয়া]ককোটিক সংশয়ের) ভাব—এই কথাটি মূল্যবান্।

(i) "এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরষা,
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা
গীতময় তরুলতিকা—
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।"—রবীন্দ্রনাথ।

—ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা এসেছে। বিশ্বে আনন্দগান বেজে উঠেছে। এত গভীর, এত বিপুল, এত ব্যাপক সে সঙ্গীত যে মনে হচ্ছে যেন যুগ-যুগান্তরের সংখ্যাহীন কবি একসঙ্গে যুগযুগান্তরের গান ধ্বনিত ক'রে তুলেছেন। 'যেন'-র ভাবটি অর্থে পাওয়া যাচ্ছে ব'লে অলঙ্কার এখানে প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা। আরোপ অসম্ভব ব'লে এখানে রূপক হ'তে পারে না; বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের ('দৃষ্টান্ত' দ্রষ্টব্য) অভাবে 'দৃষ্টান্ত' হবে না, বিষয়নিগরণের (swallowing up of the উপমেয় by the উপমান) অভাবে অতিশয়োক্তি হবে না।

(ii) "মোগল-শিখের রণে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গসনে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "নির্বিষ সর্পের
ব্যর্থ ফণা-আস্ফালন, নিরস্ত্র দর্পের
হুহুংকার।" —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে" —রবীন্দ্রনাথ।

—সুন্দরী স্নানের জন্য সরসীতে নেমেছেন, কটির মেখলাখানি খুলে শিলাতলে রেখে গেছেন। সেখানে সে নিঃশব্দে প'ড়ে আছে। কবি বলছেন তার মৌনভাবের কারণ অপমান, যেহেতু তার মহিমময় আসন সুন্দরীর কটিতট হ'তে সে বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু মেখলার অপমানবোধ তো সম্ভব নয়, তাই উৎপ্রেক্ষা (যেন অপমানে মৌন)।

সাহিত্যদর্পণে প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার যে উদাহরণটি রয়েছে তার অর্থ—'তন্বীর স্তনদুটি মুখ প্রকাশ করছে না, গুণী হারকে স্থান দেওয়া হয় নাই এই লজ্জায়।' বিশ্বনাথ বলছেন, স্তনের পক্ষে লজ্জা তো সম্ভব নয়, তাই যেন লজ্জায় বুঝতে হবে ; কাজেই প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা। একটি বাচ্যোৎপ্রেক্ষার উদাহরণও এইরকম :—

'এই সেই স্থান, সীতা, যেখানে তোমার অন্বেষণ করতে করতে তোমার চরণচ্যুত একখানি নূপুর আমি মাটিতে প'ড়ে থাকতে দেখেছিলাম ; নূপুর ছিল মৌন, যেন তোমার চরণারবিন্দবিরহব্যথাতেই সে মৌন হ'য়ে ছিল' ("সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং দৃষ্টং ময়া নূপুরমেকমুর্ব্ব্যাম্। অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দ-বিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনম্"—রঘুবংশ)।

(v) "ওই দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্য্যাস্তের মূর্ত্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(vi) "সহজহি আনন সুন্দর রে ভঁউহ সুরেখলি আঁখি।
পঙ্কজমধু পিবি মধুকর রে উড়ইত পসারএ পাঁখি।"
—বিদ্যাপতি।

—(রাধার) সহজসুন্দর মুখ, ভ্রূরেখাযুক্ত নয়ন। (মনে হয়) পদ্মের মধুপান ক'রে ভ্রমর উড়ে যাবে ব'লে পাখনা মেলে দিয়েছে। 'মনে হয়' প্রকাশিত নয়, অর্থে এ ভাবটি রয়েছে।

(vii) "সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে ;—মলিন দোঁহে ; সারসন, স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি !—কবচ, ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগ !" —মধুসূদন।

(সারসন, কবচ, সরু কটি, সু-উচ্চ কুচযুগ সুন্দরী প্রমীলার)

—সারসন, কবচ তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং বর্ত্তমানে যে স্থান হ'তে তারা বিচ্যুত সেই সরু কটি এবং সু-উচ্চ কুচযুগের কথা ভেবেই যেন মলিন। আমাদের চতুর্থ (iv) উদাহরণটি এরই অনুরূপ।

(viii) "বাইরে আলো, দুষ্ট ছেলে—
মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে—

ধরার-নয়ন ভরে স্বপন-আবেশে,
হেথায় আলো, লক্ষ্মী-মেয়ে—
করুণ চোখে রয় সে চেয়ে,
যায় কি পারা থাকৃতে ভালো না বেসে!"
—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

('হেথায়' = কারাগারে)

৬। ভ্রান্তিমান্

সাদৃশ্যবশতঃ একবস্তুকে অপরবস্তু ব'লে যদি ভ্রম হয় এবং সেই ভ্রম যদি সাধারণ না হ'য়ে কবিকল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে, তাহ'লে হয় **ভ্রান্তিমান্** অলঙ্কার।

(রাত্রিতে দড়িকে সাপ ব'লে ভুল করলে অলঙ্কার হয় না, যেহেতু এটি সাধারণ ভ্রম।)

এ অলঙ্কারে ভ্রম বা ভ্রান্তিটি যে করে সে না জেনেই তা করে। উপমেয়কে উপমান ব'লে ভুল করা মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়, কোনো কারণবশতঃ (কারণ 'সাধর্ম্য'—Similarity of attributes) আপনিই তা সিদ্ধ হ'য়ে যায়।

(i) "দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন!"

—কমলনয়না সুন্দরী জলে আপন নয়নের প্রতিবিম্ব দেখে তাকে সত্যকার পদ্ম ব'লে ভুল ক'রে বার বার তাকে ধরবার চেষ্টা করছে। এই মধুর ভ্রান্তিই এখানে অলঙ্কারের সৃষ্টি করেছে। চোখের সঙ্গে উৎপলের সাদৃশ্যই এই ভুলের মূলে রয়েছে।

(ii) 'নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামে নিরখিয়া
ময়ূর নীরদভ্রমে উঠিল নাচিয়া।'—শ. চ.

(iii) "শোভিলা আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে

উদিলা [illegible] ফিঙা, আর পাখী যত…
বাসরে [illegible]শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে !"—মধুসূদন।

—অর্থে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে দেবযান অর্থাৎ ইন্দ্রের পরমজ্যোতির্ময় রথকে সকলেই সূর্য্য ব'লে ভুল করেছে। সংশয় নয়, একেবারে ভুল। কাজেই এটিকে উৎপ্রেক্ষা বলা চলবে না, বলতে হবে ভ্রান্তিমান্। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'বুঝি' শব্দটি থেকে উৎপ্রেক্ষা ব'লে মনে হ'তে পারে। শব্দটির প্রয়োগ অনুচিত হয়েছে। 'ভাবি' আর 'বুঝি' এদুটি যেন পরস্পরবিরোধী। আমার মতে 'বুঝি'-সত্ত্বেও এখানে উৎপ্রেক্ষা বলা চলবে না ; কারণ, সংশয় যত প্রবলই হোক না কেন, তবু সে সংশয়। এখানে সকলে জেগে উঠেছে এবং যে যার কাজ আরম্ভ করেছে বা করতে যাচ্ছে। একেবারে ভুল না হ'লে এ সম্ভব হয় না। 'বুঝি'-কে শুধু দুর্ব্বল নয়, নিরর্থক ব'লে ধরতে হবে। একটা কথা —'বুঝি'-কে অব্যয় না ধ'রে 'বুঝিয়া' ধরলে তো ভাবিয়া বুঝিয়া একার্থক হ'য়ে যায়। সে ক্ষেত্রে সহজেই ভ্রান্তিমান্ হয়।

"দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখীদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে…"—রবীন্দ্রনাথ।

—ঋষির জটার ছটায় ঘুমন্ত পাখীরা চমকে উঠেছে ; কিন্তু তাদের কোনো ভ্রান্তির আভাস এখানে নাই। কাজেই এটি ভ্রান্তিমানের উদাহরণ নয়।

(iv) "ফুয়ল কবরী উরহি লুঠাওত
কোরে করত তুয় ভানে।"—জ্ঞানদাস।

—হে কৃষ্ণ, আলুলিত ('ফুয়ল') কৃষ্ণকুন্তল রাধার বুকে লুটিয়ে পড়েছে। রাধা ওই কালো কুন্তলকে তাঁর নবঘনশ্যাম কৃষ্ণ ভেবে কোলে (কোরে) করছেন।

(v) "আঁখিতারা দুটি বিরলে বসিয়া
সৃজন করেছে বিধি।
নীলপদ্ম ভাবি লুবুধ ভ্রমরা
ছুটিতেছে নিরবধি ॥"—চণ্ডীদাস।

(vi) "ষট্‌পদগণ কটমদলোভে গণ্ডে তাদের বসে,
উৎপল-ভ্রমে নৃত্যবিতত শিখীর কলাপে পশে।"
—কবিশেখর কালিদাস রা—৩

(vii) "রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি তুয়া ...রে তরু দেই কোর।"

(কৃষ্ণ রাধা ভেবে তরুকে আলিঙ্গন করছেন)—গোবিন্দদাস।

(viii) "চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস

চন্দ্রকলাভ্রমে রাহু করিলা কি গ্রাস?"—কৃত্তিবাস।

—রামচন্দ্রের সন্দেহ এখানে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হওয়ার পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করে নাই। সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিমান্ হয়। **এখানে সীতার সঙ্গে শশিকলার সাদৃশ্য রাহুর ভ্রমের কারণ হওয়াতেই অলঙ্কার হয়েছে,** বক্তা রামের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই—ভ্রম রাহুর, রামের নয়। বাস্তব ভ্রান্তিতে (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম) অলঙ্কার হয় না একথা গোড়াতেই বলেছি। উদ্যোতকারের মতে—"**মর্ম্মপ্রহারকৃতচিত্তবিক্ষেপবিরহাদি-কৃতোন্মাদাদিজন্য**-ভ্রান্তেশ্চ নালঙ্কারত্বম্। সা চ কবিপ্রতিভানির্ম্মিতা এব। তেন রঙ্গে রজতম্ ইতি বুদ্ধেঃ ন অলঙ্কারত্বম্"। "**ন চ অসাদৃশ্যমূলা ভ্রান্তিঃ অয়ম্ অলঙ্কারঃ**" (অর্থ সহজেই বোঝা যায় ব'লে অনুবাদ করলাম না)। বিশ্বনাথ বলেছেন, "সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ। সঙ্গে সৈবা তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে" (মিলন এবং বিরহের মধ্যে বিরহই ভালো; মিলনে সে অর্থাৎ প্রিয়া সে-ই থাকে এবং একই থাকে, কিন্তু বিরহে ত্রিভুবনই তন্ময় অর্থাৎ প্রিয়াময় হ'য়ে যায়) এতে অলঙ্কার হয় নাই; কারণ সাদৃশ্যের অভাব। আমি এটির ব্যাখ্যা না ক'রে এরই ভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন, তারই বিচারে বোঝাচ্ছি কেন তাতে অলঙ্কার হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই; বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।"

এখানে, প্রথমতঃ সাদৃশ্যের কথাই নাই এবং দ্বিতীয়তঃ বিরহী নায়কের বিশ্বময় ব্যাপ্তরূপে প্রিয়াকে দেখারূপ যে ভ্রান্তি তা উদ্যোতকারের মতে বিরহাদিকৃত উন্মাদের ফল এবং তর্কবাগীশ-মতে (সাহিত্যদর্পণের টীকাকার) "ভাবনাতিশয়-জন্যা ভ্রান্তিঃ" অতএব নায়মলঙ্কারঃ। জয়দেবের "মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা মধুরিপুরহমিতি-ভাবনশীলা" অথবা বিদ্যাপতির এরই অনুসরণে "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই" এইজাতীয় অর্থাৎ ন অত্র অলঙ্কারঃ।

৭। অপহ্নুতি

প্রকৃত (উপমেয়)-কে অপহ্নব (নিষেধ, অস্বীকার) ক'রে যদি **অপ্রকৃত** (উপমান)-এর প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহ'লে **অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়।**

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অপহ্নুতিতে উপমেয়কে প্রতিষেধ ক'রে উপমানকে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করা হয়।

রূপকের সঙ্গে অপহ্নুতির পার্থক্যটুকু মনে রাখতে হবে। **রূপকে** উপমান উপমেয়কে বজায় রেখে আপন রূপে তাকে রূপান্বিত ক'রে তোলে ব'লে উপমেয় অতীব গৌণ হ'য়ে যায়। এতে **উপমেয় রূপ্য অর্থাৎ উপমানকর্তৃক বর্ণান্বিত হওয়ার যোগ্য** এবং **উপমান** প্রকৃতপক্ষে **রূপক অর্থাৎ রূপকার।** উভয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় কাল্পনিক অভেদ। **অপহ্নুতিতে**ও অভেদ কাল্পনিক কিন্তু রূপকের তুলনায় এতে অভেদের মাত্রা অনেক বেশী , কারণ উপমেয়কে অস্বীকার করার অর্থ ভেদটাকে অসম্ভব ক'রে তোলার প্রয়াস। ('অতিশয়োক্তি'-র 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।)

✓**অপহ্নুতিতে** উপমেয়কে নিষেধ বা অস্বীকার করা হয় দুইভাবে :

(ক) না, নয়, নহে ইত্যাদি নিষেধাত্মক অব্যয়-প্রয়োগে , (খ) ছল, ব্যাজ, ছদ্ম, ছলনা ইত্যাদি সত্য-গোপনবাচক শব্দ-প্রয়োগে। **প্রথম পন্থায় উপমান উপমেয় বিভিন্ন বাক্যে থাকে, দ্বিতীয়টিতে থাকে এক বাক্যে।**

এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি আমাদের বাঙলা সাহিত্যে প্রথম পন্থার অপহ্নুতিই বেশী পাওয়া যায়। দুরকমের দুটি উদাহরণ দিয়ে অপহ্নুতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করছি :

(ক) (i) 'ও **নহে** গগন, সুনীল সিন্ধু ,

তারার পুঞ্জ **নহে** ও, ফেনার রাশি।'—শ. চ.

—উপমেয় গগন, তাবার পুঞ্জকে প্রতিষেধ ক'রে উপমান সিন্ধু, ফেনার রাশিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। (এ প্রতিষ্ঠা কিন্তু উপমেয় উপমানের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে।) উপমেয় উপমান প্রত্যেকে পূর্ণ বাক্য (ও তারার পুঞ্জ নহে ; ও ফেনার রাশি)।

(খ) (i) 'ফিরে আসে রাম নয়নাভিরাম রজনী হাসিছে **জ্যোছনাছলে**।'

—শ. চ.

—রজনী জ্যোৎস্নাময়ী এই হ'ল আসল ব্যাপার। কিন্তু কবি বলেছেন—ও

জ্যোৎস্না নয়, হাসি (জ্যোৎস্না একটা ছলমাত্র—a camouflage)। লক্ষণীয় যে উপমেয় উপমান এক বাক্যে।

প্রথম শ্রেণীর অপহ্নুতির বৈচিত্র্য বেশী। এর উদাহরণ পরে দিচ্ছি। আগে

(খ) 'ছল' ইত্যাদিযোগে অপহ্নুতি :

(ii) "ষড়্ঋতুছলে ষড়রিপু খেলে
কাম হ'তে মাৎসর্য্য।"—যতীন্দ্রনাথ।

(iii) "বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা।"—মধুসূদন।

(iv) "দেবতা আশিস্ ছলে বরষে শিশির।"—অক্ষয় বড়াল।

এইজাতীয় অপহ্নুতিকে পীযূষবর্ষ জয়দেব তাঁর 'চন্দ্রালোক' গ্রন্থে **'কৈতব' অপহ্নুতি** বলেছেন।

এইবার **প্রথম শ্রেণীর উদাহরণ :**

(ক) নয়, নহে ইত্যাদিযোগে অপহ্নুতি :

(ii) "পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন।"—কবিশেখর।

(iii) "জ্বলিছে তাহারি তলে দীপাবলিসম
অযুত আলোকবিম্ব—নহে খদ্যোতিকা।"—মোহিতলাল।

(iv) "দীপালি ও নয়, দীপের মালায় দাঁড়ায়েছে উর্ব্বশী,
তাহারি দেহের বিদ্যুৎবিভা দিকে দিকে পড়ে খসি।"
—হেমেন্দ্রলাল।

(v) "অস্ত তো নয়, অস্তগিরির শিরে রবির বিয়ে
চেলিপরা সন্ধ্যাসাথে সিঁদুর ও ফাগ দিয়ে।"—প্যারীমোহন।

(vi) "ও কি ও—ঝিল্লী ? না, না, ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজে"
—কালিদাস।

(vii) "চোখে চোখে কথা নয় গো, বন্ধু, আগুনে আগুনে কথা।"
—অন্নদাশঙ্কর।

(viii) "তারাই আজি নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হ'য়ে অন্নহারা ;
দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা !"
—নজরুল ইস্‌লাম।

(ix) "হাসি যে রঙীন ধূলা ; **অশ্রু নয়, অভ্র** সে কঠিন।"
—মোহিতলাল।

(x) 'শোভিল বীরের করে ও নহে কৃপাণ,
ভুজঙ্গিনী হরি লয় অরাতির প্রাণ।'—শ. চ.

(xi) "নীরবিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশুনিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু।" —মধুসূদন।

—সোমের প্রতি তারার উক্তি। 'নয়' কথাটি উহ্য থাকায় অপহ্নুতি এখানে গূঢ়।

(xii) "বিভূতি।—এ ত স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।
ধনঞ্জয়।—নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।"

—রবীন্দ্রনাথ (মুক্তধারা)।

(xiii) "গৌরীর বদনশোভা লখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চাঁদ সেই শোকে, না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা "—কবিকঙ্কণ।

—চাঁদে ও কলঙ্ক নয়, ম্লানতা (লজ্জা ও দুঃখের ফলে মালিন্যের কালিমা)। নেতিবাচক শব্দের প্রয়োগ না থাকায় এটিকে **গূঢ় অপহ্নুতি** বলা যায়, যেহেতু 'নয়' অর্থটি ব্যঞ্জনায় পাওয়া যাচ্ছে। মতান্তরে অলঙ্কার এখানে **সাপহ্নব অতিশয়োক্তি**।

(xiv) "ফাগবিন্দু দেখি সিন্দুরবিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ॥"—চণ্ডীদাস।

—**গূঢ় অপহ্নুতির** এটিও চমৎকার উদাহরণ। কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকুঞ্জে রাত্রিযাপন ক'রে প্রভাতে রাধা-কুঞ্জে এলে রাধা কৃষ্ণ-অঙ্গে ভোগচিহ্ন দেখে যে অনুযোগ করেছিলেন, কৃষ্ণ তারই উত্তর দিচ্ছেন; আমার অঙ্গে এ চন্দ্রাবলীর সিঁদূরের দাগ নয়, ফাগবিন্দু; চন্দ্রার কাঁকণের দাগ নয়, তাড়াতাড়ি তোমার কাছে আসতে পথে কাঁটায় গা ছিঁড়ে গেছে, তারই দাগ। সিন্দুরবিন্দু এবং কঙ্কণদাগই এখানে প্রকৃত। এদের অস্বীকার ক'রে অপ্রকৃত ফাগবিন্দুর এবং কণ্টকের স্থাপনা হয়েছে।

আর একরকম অপহ্নুতির উদাহরণ দিচ্ছি জয়দেব তাঁর 'চন্দ্রালোক'-এ যার নাম দিয়েছেন **ছেকাপহ্নুতি**ঃ

(xv) 'লুটায়ে চরণে মোর স্তবনগুঞ্জনে অনিবার
ভুলাতে সে চাহে মোরে—দেখি নাই হেন চাটুকার!
কে সে সখী? কান্ত তব? না, না, সখী, নূপুর আমার।'—শ. চ.

(i) 'অনুক্ষণ চেয়ে রই, বন্ধু, তব ওই মুখপানে।
সূর্য্য হ'তে সূর্য্যমুখী কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে?'—শ. চ.

'কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে?'=কখনো চোখ ফিরিয়ে আনে না—দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ রাখে=অনুক্ষণ চেয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ ধর্ম্ম **একই, ভিন্ন** শুধু তার **প্রকাশরূপ** অর্থাৎ উপমেয়বাক্যের 'অনুক্ষণ চেয়ে রই' কথাটারই ভঙ্গীময় রূপান্তর 'কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে?'

এইবার ফিরে আসা যাক **অব্যয়ীভাব সমাসে—বস্তুতে বস্তুতে প্রতিবস্তু।**

'বস্তু' মানে **বাক্য।**

আমাদের প্রতিবস্তূপমার উদাহরণটিতে এইমাত্র কি দেখে এলাম? দেখে এলাম যে **সাধারণ ধর্ম্মের নির্দ্দেশ** প্রকৃতবাক্যেও রয়েছে, অপ্রকৃতবাক্যেও রয়েছে অর্থাৎ **বাক্যে বাক্যে** রয়েছে অর্থাৎ **বস্তুতে বস্তুতে** রয়েছে অর্থাৎ **প্রতিবস্তুতে** রয়েছে, ফলে সৃষ্ট হয়েছে **উপমা** (সাম্য)-দ্যোতক অলঙ্কার। সহজেই অলঙ্কারের নাম হয়েছে 'প্রতিবস্তু+উপমা'=**প্রতিবস্তূপমা।**

এখন তাহ'লে **অব্যয়ীভাবসমাসদৃষ্টিতে** এইভাবে নির্ম্মাণ করতে পারি **প্রতিবস্তূপমার সংজ্ঞা:**

বস্তুতে বস্তুতে অর্থাৎ প্রতিবস্তুতে একই সাধারণ ধর্ম্ম বিভিন্ন ভাষাভঙ্গীতে নির্দ্দেশিত থেকে যদি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে উপমার অর্থাৎ সাম্যের দ্যোতনা করে, তাহ'লে অলঙ্কার হয় **প্রতিবস্তূপমা।**

('বস্তু'=বাক্যার্থ, সংক্ষেপে বাক্য।)

প্রতিবস্তু:

(খ) **অন্যদৃষ্টিতে—**

বর্ত্তমান আলোচনায় **বস্তু=বাক্যাংশ** (পদ বা পদগুচ্ছ)। এ দৃষ্টিতে আমাদের **'অনুক্ষণ চেয়ে রই'** হ'ল **বস্তু** এবং **'কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে?'** হ'ল **প্রতিবস্তু; দুটিই পদগুচ্ছরূপী।** আবার,

(ii) 'সৌন্দর্য্য তোমার মতো **বিরল** ধরায়।
বৎসরে **কয়টি** রাত্রি লভে পূর্ণিমায়?'—শ. চ.

উদাহরণটিতে **'বিরল'** আর **'কয়টি' পদরূপী** বস্তু প্রতিবস্তু। এইভাবের বিচারে

প্রতিবস্তূপমার সংজ্ঞা :

দুই স্বতন্ত্র বাক্যের উপমায় প্রকৃতবাক্যে এবং অপ্রকৃতবাক্যে দুবার প্রকাশিত **সাধারণ ধর্ম্ম** যদি **বস্তু-প্রতিবস্তুভাবাপন্ন** হয়, তাহ'লে অলঙ্কার হয় **প্রতিবস্তূপমা**। (বস্তু=বাক্যাংশের অর্থাৎ পদ বা পদগুচ্ছের অর্থ।)

প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারে উপমেয়বাক্যে **উপমেয়ের যে ধর্ম্মটি** উল্লিখিত থাকে, **সেইটিই সত্যকার সাধারণ ধর্ম্ম** অর্থাৎ উপমেয় উপমান দুয়েরই ধর্ম্ম এবং **সেইটিই বস্তু**, কারণ উপমেয়বাক্যটিই **প্রকৃত**, কবির মূল বক্তব্য, অতএব **অপরিহার্য্য**। উপমানবাক্য অপ্রকৃত, গৌণ ; এর ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে উপমেয়েরই ধর্ম্ম, ভাষাটি শুধু ভিন্ন এবং এই কারণেই এটি **ওই বস্তুর প্রতি-বস্তু**। আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণে ('সৌন্দর্য্য তোমার......') **'কয়টি'**= বেশী নয়, ৩৬৫টি রাত্রির মধ্যে বারোটি= **'বিরল'**। তাৎপর্য্যে 'বিরল' অর্থাৎ **উপমান-সাধারণধর্ম্ম তাৎপর্য্যে উপমেয়-সাধারণধর্ম্ম—ভাষায় অন্য, অর্থে এক**। **'বিরল'** হ'ল **বস্তু** আর **'কয়টি'** হ'ল ওই বস্তুর **প্রতিবস্তু**। এরই নাম সাধারণ ধর্ম্মের **বস্তুপ্রতিবস্তুভাব**। **'প্রতিবস্তু'** কথাটিতে এখানে **নিত্যসমাস—বস্তুতে সমাহিত** ইতি **প্রতিবস্তু** নিত্যসমাস। এই দৃষ্টিতে উদাহরণদুটিকে বিশ্লেষণ করি—**বস্তুতে** অর্থাৎ উপমেয়-সাধারণধর্ম্মে (i—**'অনুক্ষণ চেয়ে রই'**, ii—**'বিরল'**) **সমাহিত** অর্থাৎ **তাৎপর্য্যে একরূপতা লাভ ক'রে ওই বস্তুরই মধ্যে লীন** যে **উপমান-সাধারণধর্ম্ম** (i—**'কভু আঁখি ফিরায়ে কি আনে ?'**, ii—**কয়টি**), সে **প্রতিবস্তু**।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে প্রতিবস্তূপমায় "উপমেয় ও উপমানে বস্তু-প্রতিবস্তু সম্বন্ধ থাকে" **না, থাকে শুধু সাধারণ ধর্ম্মে** এবং "প্রতিবস্তূপমা উপমার প্রতিবস্তু" **নয়**। অলঙ্কারের নাম প্রতিবস্তূপমা—প্রতিবস্তু+উপমা ; সমাস ভাঙলে হয় **প্রতিবস্তুর দ্বারা দ্যোতিত উপমা** (মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়)। অপ্রকৃতে ধর্ম্মটির ভিন্ন ভাষারূপ থাকায় সে যে প্রকৃতের ধর্ম্মের সঙ্গে এক, তা বুঝতে হয় তাৎপর্য্যে। ঐকরূপ্যটি বাচ্য নয়, গম্য ; পথটি ঋজু নয়, বক্র। এই প্রতিবস্তুরচনাতেই কবিমানসের লীলা-বৈচিত্র্যের প্রকাশ। **প্রতিবস্তুই ঔপম্যের নিয়ন্তা। এই কারণেই অলঙ্কারের নামকরণে প্রতিবস্তুকে মূল্য দিয়ে তারই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে 'উপমা' কথাটিকে।**

বস্তুর এবং বিভিন্নদৃষ্টির প্রতিবস্তুর ব্যাখ্যা এইখানে শেষ করলাম।

এখন উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিই

সাধারণ পূর্ণোপমা কেমন ক'রে ক্রমবিবর্ত্তনের পথে পরিণতি লাভ করে প্রতিবস্তূপমায় ঃ

(ক) **সাধারণ পূর্ণোপমা ঃ**

'সাধুর চিত্ত **চিরনির্ম্মল** যমুনাজলের মতো।'—শ. চ.

(একবাক্য)

(খ) **অসাধারণ পূর্ণোপমা**—নিম্ন শ্রেণীর ঃ

'**চিরনির্ম্মল** সাধুর চিত্ত **চিরসুবিমল** যমুনাজলের মতো।'—শ. চ.

(একবাক্য)

(গ) **অসাধারণ পূর্ণোপমা**—নিম্নমধ্যম শ্রেণীর ঃ

'**চিরনির্ম্মল** সাধুর চিত্ত **সদা**
নিষ্কলঙ্ক যমুনাজলের মতো।'—শ. চ.

(একবাক্য)

(ঘ) **অসাধারণ পূর্ণোপমা**—মধ্যম শ্রেণীর ঃ

'**চিরনির্ম্মল** সাধুর চিত্ততল,
নিত্য নিষ্কলঙ্ক যেমন রহে যমুনার জল।'—শ. চ.

(দুটি উপবাক্য, 'যেমন' এদের মিলিয়ে একবাক্য করেছে।)

(ঙ) **অসাধারণ পূর্ণোপমা**—উত্তম শ্রেণীর ঃ

'**চিরনির্ম্মল** সাধুর চিত্ততল,
কলঙ্কছায়ামুক্ত যেমন **নিত্য** যমুনাজল।'—শ. চ.

(দুটি উপবাক্য, 'যেমন'-যোগে একবাক্য।)

—(খ) থেকে (ঙ) পর্য্যন্ত প্রত্যেক উদাহরণটিতে স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত সাধারণ ধর্ম্ম বস্তু-প্রতিবস্তুভাবাপন্ন ;

এই কারণে এদের পূর্ণোপমাকে **অসাধারণ** বলেছি ('উপমা' অলঙ্কারের **ঘ** চিহ্নিত প্রকারভেদ দ্রষ্টব্য)।

উপরের (ঙ)-চিহ্নিত রূপটির স্বাভাবিক পরিণতি—

(চ) **প্রতিবস্তূপমা ঃ**

'নির্ম্মলতার নিত্যবসতি সাধুর চিত্ততলে।
কলঙ্ক কভু ছায়াও না ফেলে পুণ্য যমুনাজলে॥'—শ. চ.

—'**কলঙ্ক কভু ছায়াও না ফেলে**'=কখনো কলঙ্কের আভাসটুকু পর্য্যন্ত লাগে না=নিষ্কলঙ্কতার চিরবিরাজমানতা='**নির্ম্মলতার নিত্যবসতি**'।

দ্রষ্টব্য ঃ বস্তু-প্রতিবস্তু এবং বিম্ব-প্রতিবিম্বসম্বন্ধে যথাসম্ভব প্রমাণ-প্রয়োগসহকৃত একটি বিস্তৃত আলোচনা সংযোজিত করেছি 'নিদর্শনা' অলঙ্কারের পরে একটি পরিশিষ্টে, যার শিরোদেশে লেখা আছে **'তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের জন্য'**।

বিম্ব-প্রতিবিম্ব

সাধারণ উপমায় প্রকৃতের (উপমেয়ের) এবং অপ্রকৃতের (উপমানের) **একই ধর্ম্ম, একই ভাষায় তার প্রকাশ।**

অসাধারণ উপমায় পথ **তুটি :**

(ক) প্রকৃতের এবং অপ্রকৃতের **ধর্ম্ম একই**। প্রকৃতের সঙ্গে যে-ধর্ম্মটি দেখা যায়, অপ্রকৃতেরও ধর্ম্ম সেইটিই; অপ্রকৃতে ধর্ম্মের **ভাষারূপটি শুধু ভিন্ন**। প্রকৃতের ধর্ম্ম **বস্তু**, অপ্রকৃতের ভাষান্তরে ওই ধর্ম্মই **প্রতিবস্তু**। এইভাবের অসাধারণ উপমারই দ্বৈবাক্যিক পরিণতি **প্রতিবস্তূপমা**।

(খ) প্রকৃতের যা ধর্ম্ম, তার থেকে **সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন অপ্রকৃতের ধর্ম্ম**—শুধু ভাষারূপ নয়, **ধর্ম্ম স্বয়ংই স্বতন্ত্র**। প্রকৃতের ধর্ম্ম যদি হয় 'এক্স্', অপ্রকৃতের হবে 'ওয়াই'; উভয়ের **অর্থগত ঐক্য একেবারেই থাকে না; থাকে শুধু একটা ভাবগত সাদৃশ্য, তাও আবার আবিষ্কার ক'রে নিতে হয়** ব'লে আচার্য্যরা তাকে বলেছেন **'প্রণিধানগম্য সাম্য'**। **প্রকৃতের** সঙ্গে যে-ধর্ম্মটি থাকে, সে হ'ল **বিম্ব** আর **অপ্রকৃতের ধর্ম্মটি প্রতিবিম্ব**। এইভাবের অসাধারণ উপমারই দ্বৈবাক্যিক পরিণতি **দৃষ্টান্ত** অলঙ্কার ('উপমা' অলঙ্কারের **ঙ**-চিহ্নিত প্রকারভেদ দ্রষ্টব্য)।

'সাধারণ ধর্ম্ম' মানে প্রকৃত অপ্রকৃত তুয়েরই যা সাধারণ সম্পত্তি। তুয়েরই মধ্যে বর্ত্তমা[illegible] থেকে এই এক ধর্ম্ম তুটির সাদৃশ্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু যেখানে প্রকৃত অ[illegible]ত তুয়ের ধর্ম্ম তুরকম, সেখানে সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কার হয় কেমন ক'রে?) '[illegible]থা গেঁথে গেঁথে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না ক'রে **অসাধ[illegible] [illegible]মার** নূতন একটি উদাহরণের ব্যাখ্যার পথে চলি। পথটা অনেকটা স[illegible]না, তুলনাবাচক শব্দ উপস্থিত থাকায় প্রকৃত-অপ্রকৃত যে উপমেয়-উ[illegible] জয়দেব, তব[illegible] কষ্ট ক'রে বুঝতে হবে না; তাছাড়া, এখান থেকে **'দৃষ্টান্ত'** অ[illegible]নে সুধাবর্ষণ' আ[illegible]টিও অনেকটা সোজা।

(i) [illegible], কারণ প্রথমটির [illegible]বিন্দু

[illegible]টি ধ্বনিঝঙ্কার এবং অকেসরে শিশিরকণার মতো।'—শ. চ.

এক জায়গায়—হৃদয়ে এবং করছে একটি কাজ—আনন্দদান। হৃদয়ে এই আনন্দদানের ভিত্তিতে এরা হ'য়ে উঠেছে সদৃশ। এখন বলতে পারি: **'অমৃতধারা বরিষণ করি চলে মোর কানে'** এবং **'হরি' লয় আঁখির পলক মম' বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম,** উপমেয় 'গীতগোবিন্দ' এবং উপমান 'মল্লী'। তুলনাবাচক শব্দ—'যেমন তেমনি'। এরই স্বাভাবিক পরিণতি দুই স্বাধীন বাক্যের অলঙ্কার—

(iii) 'জয়দেব, তব **গীতগোবিন্দ**, না-ও যদি বুঝি মানে,
তবু **অমৃতের ধারা বরিষণ করি চলে মোর কানে।**
না-ও যদি দেয় মধুর তাহার সৌরভ অনুপম,
মল্লিকা তবু **হরি লয় দুটি আঁখির পলক মম ॥'** —শ. চ.

—(ii)-চিহ্নিত উদাহরণে 'যেমন-তেমনি' স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে 'মল্লী' উপমান, 'গীতগোবিন্দ' উপমেয়। এইটুকু জেনেই মন সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে সাধারণ ধর্ম্ম আবিষ্কার করতে। বর্ত্তমান উদাহরণে বাক্যদুটি স্বতন্ত্র হওয়ায় অলঙ্কার আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না। মনে যে প্রশ্নটি প্রথমেই জাগে সে হ'ল এই: কবি বলছেন গীতগোবিন্দের কথা; হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক 'মল্লিকা'কে তিনি আনলেন কেন? তখন মল্লিকার কাজটির (function) দিকে নজর পড়ল—'হরি লয় দুটি আঁখির পলক মম'; সঙ্গে-সঙ্গেই দৃষ্টি ফিরল গীতগোবিন্দের কাজের দিকে—সে 'অমৃতের ধারা বরিষণ করি চলে মোর কানে'। সহজ কথায়, একটি কান জুড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যটি চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ একটি কানের ভিতর দিয়ে এবং অন্যটি চোখের ভিতর দিয়ে কবির মরমে প্রবেশ ক'রে আকুল করছে তাঁর প্রাণ—কবিকে দিচ্ছে আনন্দ। মন এইটুকু যখন আবিষ্কার করল, তখন তার বুঝতে বাকী রইল না যে গীতগোবিন্দ আর মল্লিকার কবিপ্রকাশিত কাজদুটি যতই বিভিন্ন হোক, **এক জায়গায় ওদের মিল রয়েছে—আনন্দদান** অর্থাৎ **এক আনন্দ কবির কাছে আসছে বিভিন্ন পথে ও রূপে; সুতরাং পথ ও রূপ-দুটির বিভিন্নতাসত্ত্বেও একটা দূরগত প্রণিধানগম্য ভাবসাদৃশ্য রয়েছে ওদের মধ্যে। এই দৃষ্টিতে, 'অমৃতের ধারা……কানে' আর 'হরি লয়……পলক মম' বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। এই দুটিকে সাধারণ ধর্ম্ম ব'লে বুঝতে পারার পরে উপলব্ধ হ'ল এই দুই কাজের (ধর্ম্মের) কর্ত্তা-দুটিও অর্থাৎ গীতগোবিন্দ আর মল্লিকাও**

পরস্পরের সদৃশ অর্থাৎ গীতগোবিন্দ উপমেয়, মল্লিকা উপমান। সুতরাং গীতগোবিন্দ আর মল্লিকাও বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন—উপমেয়-উপমান। সংক্ষেপে, বাক্যদুটি বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন।

প্রতিবস্তুপমা আর দৃষ্টান্ত—পার্থক্য ঃ

প্রথমে দেখিয়ে দিই এদের **মিলটুকু**—

(১) দুটিই দুই স্বাধীন বাক্যের অলঙ্কার ;

(২) বাক্যদুটির মধ্যে যে উপমাত্মক সম্পর্ক আছে, তা স্পষ্ট নয়, বুঝে নিতে হয় অর্থাৎ বাচ্য নয়, প্রতীয়মান ;

(৩) সাদৃশ্য স্পষ্ট নয়, কারণ এদের মধ্যে তুলনাবাচক শব্দ থাকে না ; থাকলে বাক্য আর দুটি থাকে না ; একটি হ'য়ে যায় ;

(৪) সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ দুই বাক্যেই থাকে, তবে পৃথক্ ভাবে।

এইটুকুতে অলঙ্কারদুটির মিল।

পার্থক্য গুরুতর ঃ

প্রতিবস্তুপমা—প্রকৃতের যে ধর্ম্ম, অপ্রকৃতেরও সেই ধর্ম্ম অর্থাৎ **দুইয়েরই ধর্ম্ম এক**। প্রকৃতসূত্রে প্রকাশিত ধর্ম্মটিই অপ্রকৃতে ভিন্ন ভাষাভঙ্গীতে প্রকাশ করা হয়। **ধর্ম্মের ঐক্যই** এখানে বড়ো কথা।

দৃষ্টান্ত—প্রকৃতের যে ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম অপ্রকৃতের **নয় ; ধর্ম্ম দুটি**। এ অবস্থায় **ধর্ম্মদুটির ঐক্য কল্পনার অতীত**। তবু এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে একটা দূর সাম্য বা সাদৃশ্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে আবিষ্কার করা যায়। **প্রতিবস্তুপমায় ভিন্ন প্রকাশরূপে ধর্ম্মের ঐক্য ; দৃষ্টান্তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রণিধানগম্য ভাবসাদৃশ্য।**

(i) 'ভোগবিনিময়ে দান কে কোথায় করিয়াছে এ জীবন ?
কাচ ল'য়ে কেহ বিক্রয় নাহি করে কভু কাঞ্চন।' —শ. চ.

এই কবিতাটির প্রথম স্বাধীন বাক্যে **'বিনিময়ে দান'** আর দ্বিতীয় স্বাধীন বাক্যে **'বিক্রয়'** ভাষারূপে ভিন্ন কিন্তু **অর্থে এক**। কবির কাজ এখানে 'জীবন'কে নিয়ে, 'কাঞ্চন'কে নিয়ে নয় ; সুতরাং 'জীবন' প্রকৃত, 'কাঞ্চন' অপ্রকৃত। তবু কাঞ্চনকে যখন এনেছেন তিনি, তখন জীবনের সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ নিশ্চয় আছে। যদি তিনি বলতেন—

'ভোগবিনিময়ে দান করে কে জীবন ?
কাচবিনিময়ে দান কে করে কাঞ্চন ?' —শ. চ.

তাহ'লে অনায়াসে বুঝতে পারতাম যে 'বিনিময়ে দান' যখন দুটি বাক্যেই রয়েছে, তখন এইটি 'জীবন' আর 'কাঞ্চন' দুপক্ষের সাধারণ ধর্ম্ম (property common to both)। সহজেই 'জীবন' হ'ত উপমেয় আর 'কাঞ্চন' উপমান যদিও অলঙ্কার প্রতিবস্তূপমা হ'ত না। আমাদের উদাহরণেও যখন দেখতে পাচ্ছি যে বিনিময়ে দান=বিক্রয়, তখন প্রকৃতে অপ্রকৃতে যে উপমেয় উপমান সম্বন্ধ রয়েছে তা বুঝতে দেরী হয় না। **কিন্তু সমস্যা জাগে সাধারণ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করার ব্যাপারে :** এক বাক্যে 'বিনিময়ে দান', অন্য বাক্যে 'বিক্রয়' থাকায় এদের একটিকে বর্জ্জন ক'রে অন্যটিকে গ্রহণ করতেও যেমন পারি না, তেমনি, যে-ধর্ম্ম উপমেয় উপমান দুইয়েই বর্ত্তমান সে-ই সাধারণ ধর্ম্ম ব'লে, 'বিনিময়ে দান' আর 'বিক্রয়' দুটিকেই সাধারণ ধর্ম্ম বলতে পারি না। এই উভয়সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ কি? **পথ হচ্ছে দুটিকেই গ্রহণ করা, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নয়, একই অর্থের রজ্জুতে বেঁধে দুটিকে অচ্ছেদ্য ক'রে তুলে। এরই নাম বস্তুপ্রতিবস্তুভাবসম্পর্ক—'বিনিময়ে দান' বস্তু, এর সঙ্গে একার্থক 'বিক্রয়' প্রতিবস্তু।** দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উদাহরণটিতে অলঙ্কার **প্রতিবস্তূপমা।**

(ii) 'ভোগলিপ্সায় কে করে কোথায় নিষ্ফল এ জীবন ?
কাচমূল্যে কি বিক্রয় কভু করে কেহ কাঞ্চন ?'—শ. চ.

এখানেও অলঙ্কারনিরূপণের প্রথম স্তরগুলি আগেরটিতে যেমন, তেমনি। 'জীবন' প্রকৃত, 'কাঞ্চন' অপ্রকৃত। কবি 'জীবন'-সূত্রে বলেছেন **'ভোগলিপ্সায় নিষ্ফল করা'** আর 'কাঞ্চন'-সূত্রে বলেছেন **'কাচমূল্যে বিক্রয় করা'**। প্রথম অর্থাৎ প্রকৃত বাক্যটির সঙ্গে অর্থগত একটা সম্পর্ক না থাকলে কবি কখনই দ্বিতীয় বাক্যটি যোজনা করতেন না। 'জীবন' আর 'কাঞ্চন'-সূত্রে কবির উক্তিদুটির মধ্যেই ওই সম্পর্কের বীজ নিহিত আছে ব'লে দৃষ্টি প্রথমেই গেল উক্তিদুটির দিকে। দেখা গেল, **অর্থে এরা এক নয়** অর্থাৎ 'ভোগলিপ্সায় নিষ্ফল করা' আর 'কাচমূল্যে বিক্রয় করা' সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি ব্যাপার। অলঙ্কার তাহ'লে প্রতিবস্তূপমা হ'ল না। অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলব যে, সে পথও বন্ধ—বাক্যদুটির মধ্যে সমর্থনমূলক সামান্যবিশেষভাব নাই ('অর্থান্তরন্যাস' দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টিটাকে স্বচ্ছতর করতে হ'ল। একটু পরেই Eureka !—ধাতুর রাজা মহার্ঘ কাঞ্চন, কাচ তার কাছে কত নিকৃষ্ট ; মহাসম্ভাবনাময় মানবজীবন, ভোগলিপ্সা তার কাছে কত নিকৃষ্ট। এই নিকৃষ্টতায় ভোগলিপ্সা আর কাচ তুল্যমূল্য। আমাদের পূর্ব্বদত্ত এক উদাহরণের পদ্ম

আর শিরীষকেসরের মতন **সম্ভোগলিপ্সা-কাচ বিম্বপ্রতিবিম্ব**, অর্থাৎ একটা গূঢ় গুণের ভিত্তিতে পরস্পরসদৃশ। একটু ব্যাপকভাবে ধরলে, 'সম্ভোগলিপ্সায়-ব্যর্থ-করা' আর 'কাচমূল্যে-বেচা' বিম্ব-প্রতিবিম্ব যেহেতু এরা সম (এক নয়)-ভাবাপন্ন। এখন, **সাধারণ ধর্ম্ম বলতে এই দুটিকেই উল্লেখ করব; কিন্তু দূরগত ভাবসাদৃশ্যের রজ্জুতে বেঁধে দুটিকে অচ্ছেদ্য ক'রে তুলে অর্থাৎ বলব বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম**। এর পর বলব **'জীবন'** আর **'কাঞ্চন' বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমেয়-উপমান**। শেষে বলব **উপমেয়বাক্য** আর **উপমানবাক্য এরাও বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের**। সাধারণ ধর্ম্ম বাঁকা, ফলে উপমেয় উপমান বাঁকা, সুতরাং বাক্যদুটির সম্পর্কও বাঁকা—**সব বিম্বপ্রতিবিম্ব**। চলা বাঁকা, বলা বাঁকা, উরু বাঁকা, ভুরু বাঁকা, হাসি বাঁকা, বাঁশী বাঁকা—কেষ্টঠাকুরটিই বাঁকা। এমনটি প্রতিবস্তূপমায় হয় না। **অলঙ্কার এখানে দৃষ্টান্ত**।

প্রতিবস্তূপমা আর দৃষ্টান্তের এই বিশ্লেষণাত্মক উদাহরণব্যাখ্যা-দুটি মূল্যবান্।

নিদর্শনা অলঙ্কারেও **সাধারণ ধর্ম্ম বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন**; কিন্তু, এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকায় নিদর্শনার আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। সে হবে যথাস্থানে।

অবতরণিকা এইখানে শেষ হ'ল। এইবার অলঙ্কারতিনটির সরল সংজ্ঞা, উদাহরণ ইত্যাদি।

১। *প্রতিবস্তূপমা*

যে অলঙ্কারে

(ক) উপমেয় এবং উপমান দুটি পৃথক্ স্বাধীন বাক্যে থাকে, (খ) উপমেয় উপমান দুই বাক্যেই সাধারণ ধর্ম্ম উল্লিখিত থাকে, (গ) সাধারণ ধর্ম্ম একটি, তবে প্রকাশিত থাকে **বিভিন্ন অথচ একার্থক ভাষায়** অর্থাৎ **বস্তু-প্রতিবস্তুভাবে** এবং (ঘ) তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না, তার নাম **প্রতিবস্তূপমা**।

(i) 'বিশ্বমাঝে তোমার মতন নাইকো কেহই আর
ত্রিভুবনে একের বেশী হয় কি গো মন্দার?'—শ. চ.

—প্রথম বাক্যের 'তুমি' উপমেয়, দ্বিতীয় বাক্যের 'মন্দার' উপমান; সাধারণ ধর্ম্ম একটি—**অদ্বিতীয়ত্ব**, কিন্তু প্রকাশিত দুই ভাষাভঙ্গীতে: 'নাইকো

কেহই আর'=দ্বিতীয় নাই, 'একের বেশী হয় কি ?'=একের বেশী হয় না=দ্বিতীয় নাই—'নাইকো কেহই আর' এবং 'একের বেশী হয় কি ?' বস্তুপ্রতিবস্তু-ভাবাপন্ন। তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ নাই। অলঙ্কার **প্রতিবস্তূপমা।**

আগেও বলেছি, তবু আর একবার ব'লে রাখি: প্রতিবস্তূপমায় একই সাধারণ ধর্ম্ম দুই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত থাকলেও এদের অর্থগত **ঐক্যটি তাৎপর্য্যে** বুঝে নিতে হয়—পথটি বক্র। প্রতিবস্তুরচনাতেই কবি-মানসের লীলাবৈচিত্র্যের প্রকাশ।

(ii) "লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে ?
..............................কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ?"—মধুসূদন।

—'বর্ণিতে' 'গণিতে' তাৎপর্য্যে এক এবং সে তাৎপর্য্য হচ্ছে 'সীমা নির্দ্ধারণ করতে'। উপমেয় লঙ্কার বিভব, উপমান 'সাগরে রত্ন' আর 'আকাশে নক্ষত্র' দুটি। **মালা প্রতিবস্তূপমা।**

(iii) "যদি হ'তো দূরবর্ত্তী পর,
নাহি ছিল ক্ষোভ। শর্ব্বরীর শশধর
মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'দূরবর্ত্তী পর' পাণ্ডব, 'হ'তো' ক্রিয়ার কর্ত্তা 'ক্ষোভ' দুর্য্যোধনের। পাণ্ডব দূরবর্ত্তী পর হ'লে দুর্য্যোধন ক্ষোভ করতেন না। শর্ব্বরীর (রাত্রির) শশধর (দূরবর্ত্তী) মধ্যাহ্ন-তপনকে দ্বেষ করে না। **'ক্ষোভ'** আর **'দ্বেষ'** তাৎপর্য্যে এক—**বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। উপমেয়** দুর্য্যোধন (ক্ষোভের কর্ত্তা, উহ্য) আর 'দূরবর্ত্তী পর' (পাণ্ডব, উহ্য); **উপমান** যথাক্রমে 'শর্ব্বরীর শশধর' আর 'মধ্যাহ্নের তপন'। বাক্য দুটি। তুলনাবাচক শব্দ নাই। **প্রতিবস্তূপমা।** এই উদাহরণটি বৈচিত্র্যময়।

(iv) "গাভী যে তৃণটি খায়, করে জল পান,
তার সার দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান।
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গলহেতু করেন অর্পণ।"—রজনীকান্ত।

(v) "যে রমণী পতিপরায়ণা
সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার।" —মধুসূদন।

(vi) "যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই-যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লব-প্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে ?" —রবীন্দ্রনাথ।

—অর্জ্জুনের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি। 'আমি' (চিত্রাঙ্গদা) উপমেয়, 'শিশির' উপমান। প্রথম বাক্যের **'পরিচয়'** আর দ্বিতীয় বাক্যের **'নামধাম'** অর্থে এক—বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। ('কোনো নামধাম আছে ?' = কিছু পরিচয় নাই)। **প্রতিবস্তূপমা**।

(vii) "রবির উদয়মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাই পরিশ্রম,
নাই তাহে ক্ষতিবৃদ্ধি তার; জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনককিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়।" —রবীন্দ্রনাথ।

—রাজা বিক্রমদেবের প্রতি সভাসদের উক্তি। 'তুমি' (বিক্রমদেব) উপমেয়, 'রবি' উপমান। (তোমার অর্থাৎ রাজার) **'অবহেলে' (অবলীলা-ক্রমে) কৃপাবর্ষণ** আর (রবির) উদয়মাত্রে **বিনা চেষ্টায় বিনা পরিশ্রমে আলোকবিতরণ** তাৎপর্য্যে এক—বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। আবার, 'যে' অর্থাৎ রাজকৃপালাভকারী ব্যক্তি উপমেয়, (সূর্য্যালোকপ্রাপ্ত) 'বনফুল' উপমান। **ধন্য** হওয়া আর **আনন্দে** ফোটা তাৎপর্য্যে এক—বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। **প্রতিবস্তূপমা**।

নিম্নদত্ত কবিতাংশদুটি 'কাব্যশ্রী'-তে প্রতিবস্তূপমার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা যায় **দুটির একটিতেও প্রতিবস্তূপমা নাই**:

(১) "যার যাহা বল
তাই তার অস্ত্র পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।
ব্যাঘ্রসনে নখদন্তে নহিক সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায় ?" —রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—"'নখদন্ত' ব্যাঘ্রের অস্ত্র এবং 'ধনুঃশর' মানুষের অস্ত্র।

অতএব সাধারণ ধর্ম্ম ফলিতার্থে এক হইলেও ভিন্নরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। বাক্য দুইটি পৃথক্, কিন্তু উহাদের সাদৃশ্য স্ফুটপ্রতীয়মান, যথাদিশব্দ নাই। অতএব অলঙ্কার প্রতিবস্তূপমা।"

অন্তদৃষ্টিতে বাঘের 'নখদন্ত' আর মানুষের 'ধনুঃশর' সমপর্য্যায়ভুক্ত হ'লেও নখদন্ত আর ধনুঃশর সাধারণ ধর্ম্ম হ'তে পারে না এই কারণে যে নখদন্তী বাঘের সঙ্গে ধনুঃশরধারী মানুষের যুদ্ধে মানুষ বাঘকে হত্যা করলে, মানুষ উপমেয় আর বাঘ উপমান হয় না। সুতরাং উদ্ধৃত কবিতাংশটিতে প্রতিবস্তূপমার কথাই কল্পনাতীত।

উক্তিটি দুর্য্যোধনের এবং এর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ধৃতরাষ্ট্রের

"জিনিয়া কপটদ্যূতে তারে কোস্ জয়?
লজ্জাহীন অহঙ্কারী!"

এই ধিক্কারবাণীর প্রত্যুত্তর।

অলঙ্কার এখানে **অপ্রস্তুত-প্রশংসা**। দুর্য্যোধন বলতে চান: পাণ্ডবের বাহুবল আছে, আমার তা নাই; তাই চলেছি কপটতার পথে; কপটতাই আমার বল, আমার অস্ত্র। এই বলেই পাণ্ডবদের পরাজিত ক'রে জয়ী হয়েছি আমি; এতে লজ্জার কি আছে? দুর্য্যোধনের এইটিই অভিপ্রেত বক্তব্য—**প্রস্তুত**। ব্যাঘ্র, ধনুঃশর, নখদন্ত **অ-প্রস্তুত**। **প্রস্তুতটিই ব্যঞ্জিত** হয়েছে

"ব্যাঘ্রসনে নখদন্তে নহিক সমান,
তাই ব'লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ
কোন্ নর লজ্জা পায়?"—

এই অপ্রস্তুতটির দ্বারা।

(২) "সাধু কহে,—শুন মেঘ বরিষার
নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার,
সব ধর্ম্মমাঝে ত্যাগধর্ম্ম সার
ভুবনে।"—রবীন্দ্রনাথ।

'কাব্যশ্রী'-তে বলা হয়েছে—"এখানে উপমানবাক্যটি পূর্ব্বে বসিয়াছে। মেঘের বৃষ্টিধারা দেওয়া ও আত্মত্যাগ করা তাৎপর্য্যবিচারে একই"।

পূর্ব্বে বসা বাক্যটি উপমানবাক্য হ'লে উপমান বলতে হয় 'মেঘ বরিষার'-কে। পূর্ব্বের বাক্যটিকে উপমানবাক্য বললে পরেরটিকে ('সব ধর্ম্ম…ভুবনে') বলতে হয় উপমেয়বাক্য; কিন্তু এ বাক্যে উপমেয় কোন্‌টি? সহজ কথায়, উদ্ধৃতিটিতে সাদৃশ্যের অস্তিত্বই নাই। **অলঙ্কার** এখানে **অর্থান্তরন্যাস:**

'সব ধর্ম্মমাঝে ত্যাগধর্ম্ম সার ভুবনে'—এইটি কবির বর্ণনীয় **সামান্য** (general) সত্য ; একেই সমর্থন করা হয়েছে—'মেঘ বরিষার নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার' এই **বিশেষ** (particular) নজীরটির দ্বারা।

প্রতিবস্তূপমার সম্বন্ধে দুটো কথা অত্যন্ত মূল্যবান্‌ঃ

প্রথম—প্রতিবস্তূপমায় প্রকৃতে অপ্রকৃতে সামান্যবিশেষভাব একেবারেই থাকে না। প্রকৃত অপ্রকৃত দুইই হয় সামান্য, না হয় বিশেষ। সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারমাত্রেরই এটি সাধারণ লক্ষণ।

দ্বিতীয়—দুই বাক্যে উপমেয়-উপমান এবং বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও অলঙ্কার প্রতিবস্তূপমা সবক্ষেত্রে নাও হ'তে পারে। যেমন,

'অলকগুচ্ছ আলসে লুটায় তোমার ললাটতলে—
মধুর আবেশে ঝিমায় ভ্রমর স্বর্ণকমলদলে।'—শ. চ.

'আলসে লুটায়' আর 'মধুর আবেশে ঝিমায়' তাৎপর্য্যে এক—বস্তুপ্রতিবস্তু-ভাবের সাধারণ ধর্ম্ম ; উপমেয় 'অলকগুচ্ছ', উপমান 'ভ্রমর'। অতএব—অতএব প্রতিবস্তূপমা ? মনে তাই হয় ; কিন্তু অলঙ্কার এখানে **প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা**। আপাতদৃষ্টিতে বাক্য দুটি ; কিন্তু '**যেন**'-র বন্ধনে দুয়ে মিলে একটি—'**যেন**' উহ্য। একগুচ্ছ অলক তোমার কপালে লুটিয়ে রয়েছে, (**যেন**) একটি ভোমরা প'ড়ে রয়েছে স্বর্ণপদ্মের পাপড়িতে।

প্রতিবস্তূপমার আরও কয়েকটি উদাহরণ ঃ

(viii) "সাত্বিকের ঠিক উল্টোপিঠেই থাকে তামসিক, পূর্ণিমারই অন্যপারে অমাবস্যা।" —রবীন্দ্রনাথ।

(ix) "বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ?
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?"—রামনিধি গুপ্ত
(নিধুবাবু)।

(x) "জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে নিত্য কিরে ঝলঝলে ?"—মধুসূদন।

১০। দৃষ্টান্ত

যে অলঙ্কারে

(ক) উপমেয় এবং উপমান দুটি পৃথক্ স্বাধীন বাক্যে থাকে, (খ) **উপমেয় আর উপমানের ধর্ম্ম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রণিধানগম্য ভাবসাদৃশ্যে ধর্ম্মদুটি বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্মে পরিণত হয়** এবং (গ) তুলনা-বাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না, তার নাম **দৃষ্টান্ত**।

প্রতিবস্তূপমায় শুধু সাধারণ ধর্ম্মটিই বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন; কিন্তু **দৃষ্টান্তে** উপমেয়-উপমান বিম্বপ্রতিবিম্ব এবং সাধারণ ধর্ম্মও বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন। এই পার্থক্যটি মূল্যবান্।

(i) "কথাগুলো যদি **বানানো** হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।"
—রবীন্দ্রনাথ।

—'বানানো' আর 'হীরে-বসানো সোনার' যথাক্রমে 'কথা' আর 'ফুল'-এর সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য যে 'সোনার' কথাটি বিশেষণপদ (স্বর্ণনির্ম্মিত), 'ফুল'-এর বিশেষণ। ধর্ম্মদুটি যতই বিভিন্ন হোক, **'হীরে-বসানো সোনার** ফুল' **কৃত্রিম** ব'লে **'বানানো** কথা'-র সঙ্গে এর সুন্দর ভাবসাদৃশ্য রয়েছে। এই কারণে **বানানো** আর **হীরে-বসানো সোনার** বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম। অতএব 'কথা' আর 'ফুল' যথাক্রমে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমেয় উপমান। শুধু তাই নয়। **'চমৎকার'** আর **'তবুও কি সত্য নয়?'** এ দুটিও **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম**। 'তবুও কি সত্য নয়?' কাকুর দ্বারা প্রকাশ করছে—**তবুও সত্য**। কবি বলেছেন, হীরে-বসানো সোনার ফুল সত্য নয় তবু সত্য। এর তাৎপর্য্য কি? বস্তুগত দৃষ্টিতে সত্য নয়, কিন্তু ভাবদৃষ্টিতে সত্য। **মন যাকে সানন্দে স্বীকার ক'রে নেয়, তাই সত্য**; বস্তুগতভাবে যতই সে মিথ্যা হোক, তাতে কিছুই যায় আসে না। এই দৃষ্টিতেই কবি বলেছেন, 'কথাগুলো যদি বানানো হয় দোষ কী, কিন্তু **চমৎকার**।' এখন দেখা যাচ্ছে যে **বানানো কথার চমৎকারিত্ব** আর **হীরে-বসানো সোনার ফুলের সত্যত্ব** ভাবে সদৃশ। 'চমৎকার' কথাটার মানে "আস্বাদপ্রধানা বুদ্ধিঃ", বলেছেন আচার্য্য অভিনবগুপ্ত

(ধ্বন্যালোক ৪।১৬)। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাংশটি **দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের** মধুর উদাহরণ।

(ii) "বুঝনি এত কথা আঁখির মুখরতা ?—আছিলে নির্বোধ এত কি ?
গন্ধে বুঝনি কি গোপনে ফুটেছিল গুমরি কাঁটাবনে কেতকী।"
—কবিশেখর কালিদাস।

—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাই কিশোরীর উক্তি। কৃষ্ণের প্রতি কিশোরীর পূর্ব্বরাগ তাঁর মুখের ভাষায় প্রকাশমান ছিল না, নানাভাবে আভাসিত ছিল চোখের দৃষ্টিতে। কাঁটাবনে প্রস্ফুটিত কেতকী অদৃশ্য, গুপ্ত; কিন্তু বাতাসে ভেসে আসা তার গন্ধ সূচিত করে তার অস্তিত্ব। 'এত কথা'—গোপন প্রেমের (কুলবধূ রাধার পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগের) পরিচয়, মুখের ভাষায় যা প্রকাশিত করা যায় নাই, করতে হয়েছে আভাসিত চোখের ভাষার বহুমুখী ব্যঞ্জনায়।

উপমেয়—কিশোরীর গোপন প্রেম ('এত কথা'-র দ্বারা দ্যোতিত),
উপমান—গোপনে ফোটা কেতকী। **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম 'আঁখির মুখরতা' আর 'গন্ধ'**। অলঙ্কার **দৃষ্টান্ত**।

এই উদাহরণটিও চমৎকার। 'আঁখির মুখরতা' আর 'গন্ধ' সম্পূর্ণ বিভিন্ন হ'লেও সদৃশ, যেহেতু দুটিতেই রয়েছে গোপনবস্তুর ইঙ্গিত।

(iii) "সভাজন দুঃখী রাজদুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে।" —মধুসূদন।

—'সভাজন' উপমেয়, 'জগৎ' উপমান; বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম 'দুঃখী'-'আঁধার'। আবার, 'রাজা' উপমেয়, 'দিননাথ' উপমান; বিম্বপ্রতিবিম্ব সাধারণ ধর্ম্ম 'দুঃখ'-'ঘন' (মেঘ)।

(iv) "ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য্য আছে; আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। শস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হ'তে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।" —রবীন্দ্রনাথ।

(v) "ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে প'ড়ে মাতা চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি' ছুঁতে না পারে,
নামি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তারে।"—কালিদাস।

—শিশু, মাতা উপমেয়; সিন্ধু, গগন যথাক্রমে ওদের উপমান। 'নুয়ে

প'ড়ে' আর 'নামি' বস্তুপ্রতিবস্তু। তা হোক; এদের নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণ নাই, যেহেতু বর্ত্তমান আলোচনায় এরা গৌণ। 'উঠিতে না পারে মায়ের কোলে' আর 'কল্লোল তুলি' ছুঁতে না পারে' 'শিশু-সিন্ধু'-সূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম; আবার, 'চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে' আর 'দেয় পরশন তারে' 'মাতা-গগন'-সূত্রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। অলঙ্কার **দৃষ্টান্ত**।

(vi) "রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ;......
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি!
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা?"—মধুসূদন।

(vii) "মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি' ফেলিয়াছে আজি চারিধার।"—রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও 'ব্যাপ্ত' আর 'পূর্ণ' বস্তুপ্রতিবস্তু; তবু **দৃষ্টান্ত** অলঙ্কার অক্ষুণ্ণই আছে। বেশ মন দিয়ে এই উদাহরণটিকে বুঝতে হবে। **ধূপ=ধূপবর্ত্তি (ধূপকাঠি) যার সঙ্কীর্ণসীমায় মিলিয়ে থাকে গন্ধ (অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে)। উপমেয়—মিলনবন্ধন** (যা সঙ্কীর্ণসীমায় প্রিয়াকে সীমায়িত ক'রে রেখেছিল), **উপমান—ধূপ**; **'বিরহে টুটিয়া'** আর **'দগ্ধ হ'য়ে' বিম্বপ্রতিবিম্ব সাধারণ ধর্ম্ম**। আর **উপমেয়—'প্রিয়া', উপমান—'গন্ধবাষ্প'**; **'তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে'** আর **'পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার'** (দিগ্‌দিগন্তর থেকে গন্ধ এসে প্রবেশ করছে নাসারন্ধ্রে—এই হ'ল চরণটির ব্যঙ্গ্যার্থ) **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম**।

মন্তব্য: পঞ্চম আর সপ্তম উদাহরণে বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম দেখিয়েও তাদের উপেক্ষা করেছি তাদের স্থান উদাহরণদুটিতে গৌণ ব'লে। এদুটিতে প্রতিবস্তূপমা আর দৃষ্টান্তের সঙ্কর হয়েছে, তাও বলব না; কারণ দৃষ্টান্তলক্ষণই প্রবল, সমুজ্জ্বল। 'অলঙ্কারসর্ব্বস্ব' গ্রন্থে রুয্যক একটি উদাহরণ

দিয়েছেন দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের, যার উপমেয়বাক্যে 'জানীতে' আর উপমানবাক্যে 'জানাতি' আছে (দুটিই একার্থক—জানা বা জ্ঞান)। রুয্যক বলছেন, যদিও জানা (জ্ঞান)-রূপ একই ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট রয়েছে, তবু এরাই যে ঔপম্যের নিয়ন্তা তা নয় ("অত্র যদ্যপি জ্ঞানাখ্যঃ একঃ ধর্ম্মঃ নির্দ্দিষ্টঃ, তথাপি ন এতন্নিবন্ধনম্ ঔপম্যং বিবক্ষিতম্")। ব্যাখ্যাকার মন্তব্য করছেন, 'যদ্যপি' ইত্যাদি ব'লে অলঙ্কার এখানে যে **প্রতিবস্তূপমা নয়**, এইটুকু জানিয়ে দেওয়া হ'ল (অলঙ্কারসর্ব্বস্ব—২৬ সূত্র)।

(viii) "কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার,
সেই দাসীপুত্র হবে মেবারের রাজা?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা?
অসুরে অমৃতভাণ্ড করিবে হরণ?
কুকুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন?"—যদুগোপাল।

—এখানে **মালাদৃষ্টান্ত** হয়েছে।

(ix) "সবহুঁ মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী॥
সকল সময় নহ ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখনারী নহ গুণবন্ত॥"—বিদ্যাপতি।

এখানে উপমেয় (পুরুষনারী) শেষ বাক্যে। মোতির (মৌক্তিকের) মর্য্যাদা, কোকিলবাণীর মাধুর্য্য, বসন্তের সৌন্দর্য্য এবং পুরুষনারীর গুণবত্তা বিভিন্ন হ'লেও তাৎপর্য্যে সাম্য বোঝাচ্ছে। এটিও মালাদৃষ্টান্ত।

(x) "আমার জীবন যদি তোমাদের সুন্দর আননে
দিয়ে যায় কোনোদিন আনন্দের দীপ্তরেখা আঁকি,
তাহারে গ্রহণ ক'রো ফুল্লমুখে, শুধায়ো না মনে
সে আনন্দ জোগায়েছে জীবনের কত বড় ফাঁকি।
তোমার প্রিয়ার শুভ্র বাহুঘেরা সোনার কঙ্কণে
তাহারে মানালে ভালো, কতো বহ্নি দহিল সে সোনা—
সে খোঁজে কি কাজ?" —অজিত দত্ত।

—আমার জীবন যদি তোমাদের আনন্দ দিতে পারে, সেই আনন্দ নিয়েই তৃপ্ত থেকো, তোমার প্রিয়ার বাহুতে সোনার কাঁকন মানায় যদি, সেই তো

সুখের কথা—বিম্বপ্রতিবিম্ব। আবার, আমার জীবনের কত বড় ফাঁকি তোমাদের আনন্দ জোগাচ্ছে, তা জেনে লাভ কি ? তোমার প্রিয়ার কাঁকনের সোনা কতটা আগুনে পুড়ে তবে তার হাতে মানিয়েছে, সে খবরে কাজ কি ? —বিম্বপ্রতিবিম্ব।

অতিসুন্দর এই উদাহরণটি।

(xi) "তাদের তরাতে চাবকানো ছাড়া অন্য উপায় কই ?···
ফুলের বরাত খুলে,—
মাল্যরচনে বেছে বেছে তুলে চড়ালে স্ফীর শূলে।
বেঁচে যায় চন্দন,—
ক্ষয়রোগ বরি' তিলে তিলে মরি' রচি' পরপ্রসাধন।"
—যতীন্দ্রনাথ।

(xii) "একাকী গায়কের নহে তো গান,
গাহিতে হবে দুইজনে ;
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা,
আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "গঙ্গা আর রামায়ণ—কোন্ কীর্ত্তি বঙ্গে বরণীয় ?
আকাশের চন্দ্রসূর্য্য, কারে রাখি কারে দিব ছাড়ি ?"
—যতীন্দ্রমোহন।

(xiv) "মনোভাব
যতক্ষণ মনে থাকে, দেখায় বৃহৎ ;
কার্য্যকালে ছোট হ'য়ে আসে। বহু বাষ্প
গ'লে গিয়ে এক ফোঁটা জল।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xv) "অমিতা : তোমার কিছু ক্ষতি নাই, মোরে যদি দাও
এতটুকু ভালবাসা······
সমুদ্র কি রিক্ত হয়ে যাবে—আমি যদি এক মুঠো ফেনা নিয়ে যাই ?"
—বুদ্ধদেব।

['মেঘনাদবধ' কাব্যের ভূমিকায় দৃষ্টান্তের উদাহরণরূপে দীননাথ উদ্ধৃত করেছেন—

"যে বিধি, হে মহাবাহু, স্বজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি ; মৃগ-ইন্দ্র গজ-ইন্দ্ররিপু ;
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্র-বৈরী ; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ **অরি**।"—এখানে **দৃষ্টান্ত তো নয়ই** ; বরঞ্চ যা (নিদর্শনা) হ'তে পারত, তাও হয় নাই ; কারণ উপমেয়-উপমান এখানে বিম্বপ্রতিবিম্ব নয়, মাত্র বস্তুপ্রতিবস্তু (স্থূলাক্ষর অর্থাৎ 'সিন্ধু-অরি' অংশটি ছাড়া, যেহেতু ওখানে উক্ত সম্বন্ধদুটির একটিও নাই)। তবু, প্রতিবস্তূপমা হয় না, এরা একবাক্য ব'লে ('যে বিধি' ও 'তাঁর' এদের একবাক্যগত করেছে।)]

(xvi) "**অঙ্কুর তপনতাপে যব জারব**
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিফলে গোঁয়ায়ব
কি করব সো পিয় নেহে॥"—বিদ্যাপতি।

(xvii) "তব যোগ্যা কন্যা মোর, তারে লহ তুমি।
সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xviii) "আঁধারে ফুটিল আলোকদীপ্তি—কাঁটায় কনকফুল,
অন্ধ অকূল সিন্ধুর পারে দেখা দিল উপকূল,
মৃত্যুকপিশ মূর্চ্ছিত মুখে ফুটিল প্রাণের হাসি,
পাপের চক্ষে সহসা উঠিল পুণ্যের জ্যোতি ভাসি!
উলু উলু উলু দে' রে পুরনারী, ওরে তোরা শাঁখ বাজা
অন্ধকারায় জনমিল আজ মুক্তিদেশের রাজা।"—যতীন্দ্রমোহন।
—কংসকারায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। **মালাদৃষ্টান্ত।**

(xix) "হোমারের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্য-রচনার যে আদর্শটা আছে, যেহেতু তা সার্বভৌমিক, এইজন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীককাব্য প'ড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশেই বিদেশী ; কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার ক'রে নিতে বাধা পায় না।"—রবীন্দ্রনাথ।

১১। নিদর্শনা

যে অলঙ্কারে **দুটি 'বস্তু'র 'অসম্ভব' বা 'সম্ভব' সম্বন্ধ** ব্যঞ্জনায় বস্তুদুটির মধ্যে বিম্বপ্রতিবিম্বভাব অর্থাৎ উপমেয়-উপমানভাব দ্যোতিত করে, তার নাম **নিদর্শনা**।

এই অলঙ্কারটির সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা বুঝবার আছে। একে একে সব বলছি। তাই ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে অলঙ্কারটি কঠিন। কঠিন মোটেই নয়। আমাদের সকল যুগের বাঙলা সাহিত্যে, এমন কি মধ্যবিংশ-শতাব্দীর এই প্রখর আলোর যুগেও, কি গদ্যে কি পদ্যে, নিদর্শনার প্রয়োগ এত বেশী যে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। কথাগুলি বলি একে একে।

প্রথম—'বস্তু' মানে যে বাক্যের, উপবাক্যের, পদগুচ্ছের বা পদের অর্থ, এ তো আগেই বলেছি ; তবু আর একবার মনে করিয়ে দিলাম। **নিদর্শনায় 'বস্তু' উপবাক্যের, পদগুচ্ছের, বা পদের অর্থ। নিদর্শনা একবাক্যের অলঙ্কার, দুই স্বাধীন বাক্যের নয়।**

দ্বিতীয়—**'বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ'** মানে কবির যা মূল বর্ণনীয় বিষয়, যাকে **আমরা আলঙ্কারিক ভাষায় বলি 'প্রকৃত', তার সঙ্গে কবির যা বর্ণনীয় নয় তবু আনা হয়েছে অলঙ্কারসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেই 'অপ্রকৃতে'র সম্পর্ক।**

তৃতীয়—**'অসম্ভব সম্বন্ধ'** মানে **সেইরকম সম্পর্ক যা লোকের পরিচিত নয় ব'লে সহজস্বীকৃতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।**

চতুর্থ—**'সম্ভব সম্বন্ধ'** হ'ল **সেই সম্পর্ক যা লোকের সংস্কারের মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় সহজেই স্বীকৃত হয়।**

পঞ্চম—বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ অসম্ভবই হোক আর সম্ভবই হোক, সূক্ষ্ম দৃষ্টির আলোকে বস্তুদুটির মধ্যে আবিষ্কৃত হয় একটা সাম্য (ঔপম্য, সাদৃশ্য)।

অসম্ভব সম্বন্ধের নিদর্শনাতেই সৌন্দর্য্য বেশী। আমাদের সাহিত্যে (সংস্কৃতেও) **এইভাবের নিদর্শনাই অজস্র।**

(ক) অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধের নিদর্শনা :

(i) "রাই কিশোরীর **রূপগুণ হরে**
আমার কিশোরী বধূ।"—মোহিতলাল।

—এখানে 'আমার কিশোরী বধূ'-র 'রূপগুণ'-বর্ণনা একটি **বস্তু**—কবির মূল বর্ণনীয় এইটিই, তাই **প্রকৃত**, অতএব **প্রকৃত বস্তু**। অলঙ্কারসৃষ্টির উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে 'রাই কিশোরীর রূপগুণ', এটি দ্বিতীয় বস্তু—**অপ্রকৃত বস্তু**। কিন্তু দুটির **সম্বন্ধ** স্থাপিত হয়েছে **'হরে'** এই ক্রিয়াপদটির দ্বারা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এক **কিশোরীর রূপগুণ আর-এক কিশোরীর পক্ষে হরণ করা কি সম্ভব? তা যখন নয়, তখন 'হরে' ক্রিয়াপদটির দ্বারা 'কিশোরী বধূর রূপগুণ' বস্তুটির সঙ্গে 'রাই কিশোরীর রূপগুণ' বস্তুটির যে সম্বন্ধ ঘটানো হয়েছে, তা অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ**।

এই অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের দ্যোতনা এই যে কিশোরী বধূ রূপে-গুণে রাই কিশোরীর তুল্য। এরই নাম অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের উপমা-পরিকল্পনা—"অভবন্ বস্তুসম্বন্ধঃ উপমা-পরিকল্পকঃ" ('কাব্যপ্রকাশে' মম্মটভট্ট)।

(ii) "চাঁপা কোথা হ'তে এনেছে **হরিয়া** অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া?"

—রবীন্দ্রনাথ।

মন্তব্যঃ হরণ বা চৌর্য্যক্রিয়ার দ্বারা অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের নিদর্শনাসৃষ্টি এদেশের সুপ্রাচীন প্রথা। 'অলঙ্কারসর্ব্বস্ব'-ব্যাখ্যায় জয়রথদত্ত উদাহরণঃ

'লক্ষ্মী যে মত্তমাতঙ্গের গতিটি **চুরি** ক'রে আনলেন নিজের চরণে, এটা কি প্রশংসার কথা?'

("পাদদ্বন্দ্বস্য মত্তেভগতি**স্তেয়ে** তু কা স্তুতিঃ?")

মনে রাখতে হবে যে **'অসম্ভব'** বা **'সম্ভব'** **বিশেষণপদ**; কিন্তু **'বস্তু'র নয়**, বস্তু **'সম্বন্ধের'** বিশেষণ। এই কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান্।

(iii) **"হাওয়ায় হাজার সাপের হিম-ছোবল, কানের দুপাশে অগণন শিস্"**।

—সন্তোষকুমার ঘোষ।

—পশ্চিমে শীতের রাতে উত্তুরে হাওয়ার বর্ণনা। 'হাওয়া'তে সাপের 'হিম-ছোবল' এবং সাপের 'শিস্' (ফোঁসফোঁসানি) **অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ**। সাপের সারা দেহ কনকনে ঠাণ্ডা ব'লে তার ছোবলটিও ঠাণ্ডা, তার সঙ্গে আছে জ্বালা। হাওয়ার তীক্ষ্ণতীব্র স্পর্শ কনকনে ঠাণ্ডা আর জ্বালাকর। সুতরাং দ্যোতনাটুকু এইঃ **মানুষের সর্ব্বাঙ্গে হাওয়ার তীক্ষ্ণ হিমস্পর্শ একসঙ্গে হাজার সাপের হিম-ছোবলের মতন এবং হাওয়ার শাঁশাঁ শব্দ হাজার সাপের শিসের মতন**। অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের দ্বারা পরিকল্পিত এই উপমার (সাম্যবোধের) জন্য অলঙ্কার **নিদর্শনা**। **'হাওয়া' উপমেয়, ('হাজার) সাপ' উপমান; হাওয়ার তীক্ষ্ণ তীব্র স্পর্শ ('ছোবল' কথাটার**

ব্যঞ্জনায় লব্ধ) আর 'ছোবল' 'হিম'-বিশেষণের বলে বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবের সাধারণ ধর্ম্ম। প্রথম উদাহরণদুটির চেয়ে এটি অনেক বেশী উপভোগ্য, কারণ এখানে ব্যঞ্জনার খেলা বেশী। এমনি আর একটি চমৎকার উদাহরণ :

(iii) "**রায়ের**·· **বসন্ত-চিহ্নিত হলদে মঙ্গোলীয়ান মুখে চিতাবাঘের হিংস্রতা** হিংস্রতর হ'য়ে উঠেছে—যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু অপেক্ষা করছে তার পিছনে।" —নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্থূলাক্ষর অংশে **নিদর্শনা। মানুষের মুখে চিতাবাঘের হিংস্রতা—অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ। চিতাবাঘের হিংস্রতার মতন হিংস্রতা—পরিকল্পিত উপমা।** শুধু 'বাঘের' বললেই হ'ত ; কিন্তু তা তো নয়, '**চিতা**বাঘের' —ওই যে রায়ের মুখ **'বসন্ত-চিহ্নিত', 'চিতা'-র মুখ না হ'লে বিম্বপ্রতিবিম্ব হ'ত না যে**—সুন্দর। 'হিংস্রতর' কথাটাকে স্থূলাক্ষরের বাইরে ফেলেছি **'ব্যতিরেক'** অলঙ্কারের লক্ষণ পেয়েছি **ব'লে নয়** ; 'ব্যতিরেক' এখানে নাই। স্বভাব-হিংস্র বাঘ, স্বভাব-হিংস্র 'রায়'। শিকার মুখের কাছে পেলে বাঘ হিংস্রতর হ'য়ে ওঠে ; রায় মুখের কাছে শিকার পেয়েছে—**সঙ্গী** 'ঘাটে'-কে, তাই রায় বাঘও হ'য়ে উঠেছে হিংস্রতর। এই পর্য্যন্ত নিদর্শনা। 'যেন……তার পিছনে' উৎপ্রেক্ষা। 'তার' মানে 'ঘাটে'-র।

উপরের তিনটি উদাহরণে, বিশেষ ক'রে শেষের দুটিতে, উপমেয় উপমান সাধারণ ধর্ম্ম পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় আছে। এখন যে উদাহরণগুলি দিচ্ছি সেগুলিতে উপমেয়বাক্যাংশ এবং উপমানবাক্যাংশ চেনা খুব কঠিন নয়। আগের মতন এরাও **অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের** উদাহরণ। **এই সম্বন্ধটাই সাহিত্যে আমরা বেশী পাই।**

প্রথমেই ব'লে এসেছি **নিদর্শনা একবাক্যের অলঙ্কার।** আগের উদাহরণতিনটিতে এ লক্ষণের পরিস্ফুট রূপ দেখা গেছে। পরবর্ত্তী উদাহরণগুলিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেব, যাতে পরিস্ফুট একবাক্য, অপরিস্ফুট হ'তে হ'তে শেষে এমন অবস্থায় পৌঁছুবে যে বাক্য একাধিক ব'লে ভ্রান্তি হবে। কিন্তু **বাক্য সকল অবস্থাতেই একটি।**

(iv) "অবরেণ্যে বরি'
কেলিনু শৈবালে ভুলি' কমলকানন।"—মধুসূদন।

—অবরেণ্য=যা বরণ করার যোগ্য নয়। মধুকবি বরেণ্য মাতৃভাষাকে ঘৃণায় ত্যাগ ক'রে অবরেণ্য পরের ভাষাকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন ; কিন্তু

সত্য-সত্যই তিনি পদ্মবনকে উপেক্ষা ক'রে শেওলায় খেলা করেছিলেন নাকি? —'কেলিষু' বলতে তাই তো বোঝাচ্ছে। মধু অবরণীয়কে বরণ ক'রে শেওলায় তো খেলা করেন নাই; কাজেই 'অবরেণ্যে বরি'-র সঙ্গে 'কেলিষু শৈবালে'-র অর্থাৎ দুটি বাক্যাংশরূপ বস্তুর সম্বন্ধটা অসম্ভব। দ্যোতনা এই: (বরেণ্যকে অবহেলা ক'রে) অবরেণ্যকে বরণ করা ('পদ্মবন'কে ভুলে) 'শৈবালে কেলি' করার সাদৃশ। অলঙ্কার **নিদর্শনা**। 'বরি' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার বলে বাক্য সহজেই একটি।

(v) 'আসল সীতায় বনে দিয়ে
বক্ষে ধরি সোনার সীতা,
নির্ঝরিণী ত্যজি হে রাম
মরীচিকার হ'লে মিতা।'—শ. চ.

—বিশ্লেষণ ঠিক আগেরটির মতন। এখানে দুটি উপমেয় ('আসল সীতা', 'সোনার সীতা'), যথাক্রমিক দুটি উপমান ('নির্ঝরিণী', 'মরীচিকা'); বনে প্রেরণ আর বক্ষে ধারণ বিম্ব এবং ত্যাগ আর মিত্রতা এদের যথাক্রমিক প্রতিবিম্ব। (বনে) 'দিয়ে' আর 'ধরি' অসমাপিকা ক্রিয়া—বাক্য এক।

(vi) "কিম্বা কণ্টকিত, হায়! যে বিধি করিল
গোলাপকমল,
সে বিধি পাষাণমনে দহিতে সুকবিগণে
কবিত্ব-অমৃতে দিলা দারিদ্র-অনল"—নবীনচন্দ্র।

—'কমল' পর্য্যন্ত একটি এবং 'অনল' পর্য্যন্ত একটি এই দুটি উপবাক্যকে 'যে-সে' একবাক্যে পরিণত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে বিধাতা স্রষ্টা, গোলাপফুলে কাঁটা আর কবির দারিদ্র্য তাঁর পরস্পরনিরপেক্ষ দুই স্বতন্ত্র সৃষ্টি, এই দুই বস্তুর মধ্যে কোনো সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু পর্য্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে দুইয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে—কবিত্ব-অমৃতে দারিদ্র্য-অনল (মধুভরা) গোলাপকমলে কাঁটার মতো। লক্ষণীয় যে কাঁটা ফুলে থাকে না, থাকে ফুল প্রসব করে যে সেই গাছে, তেমনি দারিদ্র-অনল কবিত্ব-অমৃতে থাকে না, থাকে তার স্রষ্টা কবির জীবনে। শুধু 'যে সে' থাকলেই নিদর্শনা হয় না। —'যে বিধি সৃজিল ব্যোম সমীর অনল, সেই বিধি সৃজিয়াছে জল আর স্থল' অলঙ্কারহীন। আমাদের উদাহরণটি তো এমন নয়।

(vii) 'সহজসুষমাময়ী এই তনুখানি
তপঃকুশল করিবারে যেবা চায়,
নীলোৎপলের পত্রের ধারা হানি
চাহে **সেই ঋষি** ছেদিতে শমীলতায়।'—শ. চ.

(এটি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের
"ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু-
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং **য** ইচ্ছতি।
ধ্রুবং **স** নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি ॥"—
কবিতার বঙ্গানুবাদ।)

বিশেষ এক আলোচনার উদ্দেশ্যে নিদর্শনার এই বিখ্যাত উদাহরণটিকে এখানে স্থান দিলাম। আলোচনাটি এই—

কালিদাসের এই কবিতাটির **ছায়ামাত্র** নিয়ে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে? **ফুলদল দিয়া**
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে?"

রায়বাহাদুর দীননাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর সম্পাদিত মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় নিদর্শনা অলঙ্কারের উদাহরণরূপে—

"ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে?"—

মাত্র এইটুকু উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন, "এখানে বীরবর বীরবাহু ও শাল্মলী-তরুবরের পতনে সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য ফুলদলে কর্ত্তনশক্তি (এই অবাস্তব ধর্ম্ম) আরোপ করা হইয়াছে।"

'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'-র প্রথম সংস্করণে আমি এটিকে নিদর্শনার উদাহরণ ব'লে গ্রহণ করতে পারি নাই প্রধানতঃ দুটি কারণে—(১) উদ্ধৃত অংশটুকুতে রয়েছে শুধু উপমান ; এ অবস্থায় নিদর্শনা হয় না ; (২) 'অমরবৃন্দ' থেকে 'তরুবরে' পর্য্যন্ত সবটুকু উদ্ধৃত করলেও নিদর্শনা হয় না, যেহেতু 'ফুলদল' হ'তে 'তরুবরে' পর্য্যন্ত অংশটি ছেঁটে বাদ দিয়ে দিলেও, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে ওটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বাক্য ব'লে ; নিদর্শনায় এরকম হয় না।

কিন্তু 'কাব্যশ্রী' গ্রন্থে সুধীরকুমার 'অমরবৃন্দ' থেকে 'তরুবরে' পর্য্যন্ত সবটুকু উদ্ধৃত ক'রে মন্তব্য করেছেন,—"এখানে দুইবাক্যগত নিদর্শনা।......বস্তুসম্বন্ধ অসম্ভব—কারণ, ফুলদল দিয়া শাল্মলীতরুবরের ছেদনের প্রশ্ন উঠে না।"

তাঁর এই সিদ্ধান্ত এবং অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের ব্যাখ্যা কোনোটিই ঠিক নয়। এখানে বাক্যদুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন; শেষের বাক্যটি অনায়াসে বর্জ্জন করা চলে। **আপাতদৃষ্ট দুই বাক্য অর্থপরিণামে একবাক্যে পর্য্যবসিত না হ'লে অর্থাৎ তথাকথিত বাক্যদুটির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন না থাকলে নিদর্শনা হয় না।** এখানে সে বন্ধন একেবারেই নাই; কারণ, বীরবাহুকে বধ করার **কর্ত্তা 'রাঘব ভিখারী'** এবং শাল্মলীতরুবরকে কাটার **কর্ত্তা বিধাতা**—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি বাক্য। সাদৃশ্য নিশ্চয়ই আছে—বীরবাহু শাল্মলীতরুবরের সদৃশ, **রাঘব ভিখারী ফুলদলের সদৃশ**; কিন্তু **লক্ষণীয় যে প্রথম বাক্যের কর্ত্তা 'রাঘব ভিখারী' দ্বিতীয় বাক্যের কর্ত্তা বিধাতার হাতে করণকারকে পরিণত হয়েছে** ('ফুলদল দিয়া'—দিয়া= দ্বারা)। **এ অবস্থায় নিদর্শনা হয় না; সুতরাং 'এখানে নিদর্শনা' বলা ভুল। নিদর্শনায় কারক-সাম্য একটি মূল্যবান্ লক্ষণ।** রুয্যকের 'অলঙ্কার-সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে উদ্ধৃত নিদর্শনার একটি উদাহরণের অলঙ্কার-ব্যাখ্যাটি আমাদের কাজে লাগবে ব'লে তার মুক্ত বাঙলা অনুবাদ দিলাম :

(viii) 'অলক্তে রঞ্জিছ এই যে সযত্নে
তোমার চরণ-নখ-রত্নে,
এ তো, সখী, চন্দনপঙ্কে
করিছ শুভ্র তুমি রাকামৃগ-অঙ্কে।'—শ. চ.
(রাকামৃগাঙ্ক=পূর্ণিমার চাঁদ)

রুয্যক বলছেন, অলঙ্কার এখানে নিদর্শনা, কারণ প্রকৃতের উপর অপ্রকৃতের অধ্যারোপ হওয়ায় দুটিতেই বিভক্তিপ্রয়োগ একইভাবে হয়েছে। ব্যাখ্যাকার সমুদ্রবন্ধ এই কথাটিকে বিশদ করেছেন—**প্রকৃতে (উপমেয়ে) অলক্ত করণকারক, চরণনখরত্ন কর্ম্মকারক, রঞ্জিত করা ক্রিয়া এবং অপ্রকৃতে (উপমানে) চন্দনপঙ্ক করণকারক, মৃগাঙ্ক কর্ম্মকারক, (শুভ্র) করা ক্রিয়া।** (এই) যে আর এ (তো) প্রকৃত অপ্রকৃত বাক্যদুটিকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ক'রে একবাক্যে পর্য্যবসিত করেছে। **সুধীরকুমারের উদ্ধৃতিতে নিদর্শনা নাই।**

এইবার **অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের কথা** ঃ

ফুলের পাপড়ি দিয়ে শিমুলগাছ কাটা যে অসম্ভব একথা সবাই জানে। কিন্তু **অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষায় ফুলের পাপড়ির সঙ্গে শিমুলগাছ কাটার আজগবী সম্পর্কের নাম অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ নয়। প্রকৃতের (উপমেয়ের) সঙ্গে অপ্রকৃতের (উপমানের) অসম্ভব সম্বন্ধের নাম অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ** ('রাই কিশোরী' ইত্যাদি প্রথম উদাহরণটির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের দীননাথকৃত ব্যাখ্যাই সুধীরকুমার গ্রহণ করেছেন। দীননাথও ফুলদলে কর্তনশক্তির আবোপকেই অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ মনে করেছেন। সুধীরকুমার তাঁর দ্বিতীয় উদাহবণটিব ('ভবভোগে গেল' ইত্যাদি) ব্যাখ্যাতেও এই একইভাবের কথা বলেছেন—**"বস্তুসম্বন্ধ অসম্ভব, চিন্তামণি কেহ কাচমূল্যে বেচে না।"** 'কাব্যপ্রদীপ' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বৈদ্যনাথ বলেছেন, বস্তুদ্বয়ের অর্থাৎ পূর্ব্বার্দ্ধ আর অপরার্দ্ধের (প্রকৃতে-অপ্রকৃতে) যে সম্বন্ধ বা অন্বয়, তার নাম বস্তুসম্বন্ধ—"বস্তুসম্বন্ধ ইতি। বস্তুনোঃ পূর্ব্বার্ধাপরার্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ অন্বয়ঃ"। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে দুটি বাক্য, সেখানে তাদের আমি বলেছি **উপবাক্য**, কাব্যপ্রদীপে গোবিন্দঠাকুর বলেছেন **"অবান্তরবাক্য"**।

মালা নিদর্শনায় এই অবান্তরবাক্যের অর্থাৎ উপবাক্যের সংখ্যা দুইয়ের বেশী; কিন্তু ফলশ্রুতি একবাক্যের। নিদর্শনাব উদাহরণ শেষ ক'রে 'দৃষ্টান্ত' আর 'নিদর্শনা'র তুলনামূলক আলোচনা করব; একবাক্যের রহস্যটি সেখানে আরও পরিস্ফুট হবে।

এইবার আমাদের সপ্তম উদাহরণ (vii 'সহজসুষমা' ইত্যাদি)। এখানে 'যে—সেই' (ঋষি) উপবাক্যদুটিকে একবাক্য করেছে। যে ঋষি কণ্ব কোমলাঙ্গী তন্বী শকুন্তলাকে কঠিনকঠোর তপশ্চরণের যোগ্যা ক'রে তুলতে চাইছেন তিনি নিশ্চয়ই নীলোৎপলের পাপড়ি দিয়ে শমীবৃক্ষ ছেদন করতে চাইছেন না।

সহজসুষমাময়ী তনুকে তপস্যার যোগ্য করা আর নীলপদ্মেব পাপড়ি দিয়ে শমীবৃক্ষ ছেদন করা যথাক্রমে প্রকৃত বস্তু আর অপ্রকৃত বস্তু। কিন্তু দুটির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন তো বাচ্যার্থের পথে সম্ভব নয়। এই অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধই পরিষ্কার ক'রে দিলে ব্যঞ্জনার পথ। দেখা গেল—**অতিকোমলতাসুকুমারতার ভিত্তিতে** 'সহজসুষমাময়ী তনু' আর 'নীলোৎপলের পত্রের ধারা' যথাক্রমে উপমেয়-উপমান, আবার **অতিকাঠিন্যের ভিত্তিতে** 'তপঃকুশলতাসাধন' আর

'শমীলতাছেদন' যথাক্রমে উপমেয়-উপমান। **ফলশ্রুতিতে** যে **একবাক্যগত উপমাটি** পরিকল্পিত হ'ল সেটি হচ্ছে—**কণ্বঋষি চাইছেন নীলোৎপল-পত্রধারার মতন সহজসুষমাময়ী তনু দিয়ে শমীলতাছেদনের মতন তপঃকুশলতাসাধন।** অলঙ্কার নিদর্শনা। উক্তিটি দুষ্মন্তের।

(ix) মা, তুমি কাঞ্চন ফেলে কাঁচে গেরো দিয়েছ, মান খুইয়ে প্রাণের দরদ করেছ।" —গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(x) "সুখে মোড়া দুখে ভরা কত বড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকালফল।
**সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শ াস কালো ব'লে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।"**
—যতীন্দ্রনাথ।

(xi) "কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। **এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।"** —রবীন্দ্রনাথ।

'এখন'=আধুনিক; 'সে'='কাব্য'; 'সমস্তকে'='প্রাত্যহিক…বাস্তবতা'-কে। প্রকৃত বস্তু অপ্রকৃত বস্তু দুটিতেই 'এখন সে'—একই 'সে'। আধুনিক কাব্যকর্তৃক 'সমস্তকেই আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চাওয়া' আর 'স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে না ছাড়া'—**অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধ।** দ্যোতিত সাদৃশ্য এই: (যুধিষ্ঠিরকর্তৃক) স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে নিতে চাওয়ার মতন আধুনিক কাব্য আপন রসলোকে সমস্তকেই উত্তীর্ণ করতে চায়। 'সময়েও'—'ও' অব্যয়টির মধ্যে স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ করার ব্যঞ্জনা।

(xii) "হাসিখানি মুখেতে মিশায়;
নবীন মেঘের কোরে বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতিকুল মজাইল তায়।" —জ্ঞানদাস।

—'হাসিখানি' কৃষ্ণের; উক্তিটি রাধার। পূর্ব্বরাগের পদ। 'মিশায়' আর 'প্রকাশ করে' দুয়েরই কর্তা 'হাসিখানি'। নবীন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ প্রকাশ করা হাসির পক্ষে অসম্ভব। নবীন মেঘের কোরে বিজুরীপ্রকাশের মতন কালো মুখে হাসিখানি মিশায়। 'নবীন মেঘ' ব্যঞ্জিত করছে শ্রীকৃষ্ণের মুখের চিকন কালো বর্ণটিকে।

(xiii) "হাসি আসে ভেবে,—ব্রজপল্লীতে গোয়ালার সাজে নেমে
ঢালি দুধে জল, দেবতার লীলা ঢালি মানুষের প্রেমে।"

—যতীন্দ্রনাথ।

—দুধে জল ঢালার মতন মানুষের প্রেমে দেবতার লীলা ঢালি: এই হ'ল পরিকল্পিত উপমা (সাদৃশ্য, সাম্য)। **দুধের** মতন **মানুষের প্রেম** যথাক্রমে উপমান উপমেয় আবার **জলের** মতন **দেবতার লীলা** যথাক্রমে উপমান উপমেয়। মানুষের প্রেম খাঁটি, দেবতার লীলা ভেজাল—এই হ'ল ব্যঙ্গ্যার্থ। উক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের।

(xiv) 'এই যে সঁপিছ অর্ঘ্য মূর্খের চরণে সেবাঞ্জলি—
করিতেছ অরণ্যে রোদন,
প্রসাধন রচিতেছ শবদেহে অগুরুচন্দনে,
সিঞ্চন করিছ বারি উষর মরুর দগ্ধ বুকে,
কঠিন কঙ্করাকীর্ণ মৃত্তিকায় রোপিছ পঙ্কজ,
যতনে কুক্কুরপুচ্ছ করিছ সরল,
তুলিছ বধিরকর্ণে মধুময় বাণীগুঞ্জরণ,
রচিতেছ পত্রলেখা অন্ধের কপোলে।'—শ. চ.

(সংস্কৃত কবিতার মুক্তানুবাদ)

—উপমেয় প্রথম চরণে, বাকী সাতটির প্রত্যেকটিতে উপমান। মূর্খের সেবা অরণ্যে রোদন, শবদেহে অগুরুচন্দনে প্রসাধন-রচনা ইত্যাদির মতন। এইগুলিও যেমন নিষ্ফল, মূর্খের সেবাও তেমনি নিষ্ফল—এই হ'ল ব্যঙ্গ্যার্থ। এই উদাহরণটিতে **মালা নিদর্শনা**।

এবার দিচ্ছি একটা **বিচিত্র** উদাহরণ। **বিচিত্র এই কারণে যে এতে প্রসিদ্ধ উপমেয়টি হয়েছে উপমান এবং উপমানটি হয়েছে উপমেয়** —'প্রতীপ' অলঙ্কারের মতন।

(xv) "উঠি দেখ, শশিমুখী, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" —মধুসূদন।

—উষায় প্রমীলাকে বলছেন ইন্দ্রজিৎ। ফুলের পক্ষে প্রমীলার কান্তি চুরি করা অসম্ভব। দ্যোতিত সাদৃশ্য—প্রমীলার কান্তির মতন কান্তি যাদের সেইসব ফুল। ফুলের কান্তির মতন প্রমীলার কান্তি নয়, প্রমীলার কান্তির মতন ফুলের কান্তি—উপমানের মতন উপমেয় নয়, উপমেয়ের মতন উপমান ('প্রতীপ' দ্রষ্টব্য)।

অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের নিদর্শনার উদাহরণ এইখানে শেষ করলাম। এই লক্ষণের নিদর্শনাই আমাদের সাহিত্যে অজস্র মেলে। এইবার

(খ) সম্ভব বস্তুসম্বন্ধের নিদর্শনা ঃ

ব'লে রাখা ভালো যে এও অসম্ভবেরই দলে; ব্যাকরণের (তাও আবার পাণিনি-ব্যাকরণের পতঞ্জলিকৃত 'মহাভাষ্যে'র) সূক্ষ্ম তর্কযুক্তিতে অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে। তবে ভয় নাই, তর্কারণ্যে প্রবেশ আমি করব না, বোঝাব সরলতম উপায়ে।

(xvi) 'উদয় হ'লেই পতন হবে'—এই কথাটি শ্রীমান্ জনে
নিত্য জানান মলিন তপন অস্তাচলে যাওয়ার ক্ষণে।'—শ. চ.

—সূর্য্যের পক্ষে শ্রীমান্ (সমৃদ্ধিমান্) মানুষদের কোনো কিছু জানিয়ে দেওয়া বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব, কারণ সূর্য্য অচেতন পদার্থ ব'লে কথা বলা, এমন কি ইঙ্গিত করারও শক্তি তার নাই। 'জানা' সাধারণ ক্রিয়া, 'জানানো' প্রেরণার্থক ক্রিয়া (causative verb); জানায় যে সে **প্রযোজক** বা **হেতুকর্ত্তা**। এই জানানোর হেতুকর্ত্তা অচেতন সূর্য্য হ'তে পারে না, জ্ঞানী মানুষ মাষ্টার মশায় হ'তে পারেন। কিন্তু মাষ্টার মশায় যখন জানান 'উদয় হ'লেই পতন হবে', তখন সে হয় নিছক একটা উপদেশমাত্র। সূর্য্যের প্রতিদিনের জীবনে মানুষ উদয় আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অস্তগমন দেখছে; মাষ্টার মশায়ের জীবনে তো এমনটি ঘটে না। সূর্য্যের এই উদয় অস্ত দেখে দেখে আমাদের শিক্ষা হ'য়ে গেছে যে উদয় হ'লেই পতন হবে, উন্নতি চিরস্থায়ী নয়। এ অবস্থায় '**সূর্য্য** আমাদের **জানিয়ে** দিচ্ছে' ব'লে সূর্য্যকে যদি হেতুকর্ত্তা করি, তাহ'লে অন্যায় হয় না, যেহেতু তার প্রতিদিনকার **আচরণ** থেকে 'উদয়ের (উন্নতির) পরিণাম যে পতন' এই জ্ঞানটা আপনা হ'তেই আমাদের উৎপন্ন হচ্ছে। সূর্য্যের আপন আচরণেরই **সামর্থ্য** রয়েছে আমাদের মনে এই জ্ঞান সঞ্চারিত ক'রে দেওয়ার, যদিও সূর্য্য একেবারে চুপচাপ। 'জানান' কথাটার এই হ'ল তাৎপর্য্য। অচেতন পদার্থ যখন এইভাবের হেতুকর্ত্তা (প্রযোজক কর্ত্তা) হয়, তখন তাকে বলা হয় **'তৎসমর্থাচরণবান্ হেতুকর্ত্তা'** ('ন অবশ্যং সঃ প্রযোজয়তি। কিং তর্হি? তূষ্ণীম্ অপি আসীনঃ যঃ **তৎ-সমর্থানি আচরতি** সঃ অপি প্রযোজয়তি'—পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য')। তৎসমর্থাচরণবান্ = তৎ অর্থাৎ প্রযোজনা (causing others to do something) করতে সমর্থ এমন আচরণ যার আছে সে। আমাদের উদাহরণে 'তপন' 'জানান'-রূপ প্রযোজন

(causing others to know) করতে সমর্থ এমন 'উদয় আর অস্তগমন'রূপ আচরণযুক্ত।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে সূর্য্যের পক্ষে আমরা যে 'জানানো' ক্রিয়াকে গোড়ায় **অসম্ভব** ভেবেছিলাম, ব্যাকরণ বিশেষ বিচারে তাকে **সম্ভব** বলছে। সুতরাং **আলোচ্যমান উদাহরণটিতে নিদর্শনা সম্ভব বস্তুসম্বন্ধের।** পরিকল্পিত উপমাটি এই : **যেমন সূর্য্যের উদয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম অস্তগমন, তেমনি মানুষের উন্নতির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম পতন। 'শ্রীমান্ জন' উপমেয়, 'তপন' উপমান।** (মানুষের) উন্নতিপতন আর (সূর্য্যের) উদয়াস্ত বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম।

(আমি যে উদাহরণটি দিলাম, তা ষষ্ঠ শতাব্দীর আচার্য্য ভামহপ্রদত্ত—বোধ হয়, রচিত—সংস্কৃত উদাহরণের অনুবাদ। পরবর্ত্তী বহু আলঙ্কারিক এইটিকেই নানাভাবে রূপান্তরিত ক'রে উদাহরণরূপে দেখিয়েছেন। এর থেকে মনে হয়, সংস্কৃতসাহিত্যেও সম্ভব বস্তুসম্বন্ধের উদাহরণ বিরল। বাঙলাসাহিত্য-সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো। ভামহের উদাহরণ :

"অয়ং মন্দদ্যুতির্ভাস্বানস্তং প্রতি যিযাসতি।
উদয়ঃ পতনায়েতি শ্রীমতো বোধয়ন্নরান্ ॥")

দৃষ্টান্ত আর নিদর্শনা—পার্থক্য

(ক) **দৃষ্টান্তে** অপ্রকৃত অংশটি অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়। বাদ দিলে অলঙ্কার থাকে না, কিন্তু প্রকৃত অর্থাৎ কবির মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ণ থাকে। **নিদর্শনায়** অপ্রকৃতকে বর্জ্জন করা একেবারে অসম্ভব, প্রকৃতের সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

(খ) **দৃষ্টান্তে** প্রকৃত অপ্রকৃত পরস্পরনিরপেক্ষ দুটি স্বাধীন সম্পূর্ণ বাক্যে থাকায় **বাক্যদুটি শেষ হওয়ার পর** তাদের দূর ভাবসাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয় স্বতন্ত্র বাক্যার্থদুটির প্রণিধানের ফলে ; সংক্ষেপে, **আগে বাক্য শেষ, পরে উভয়ের মধ্যে ভাবসাদৃশ্য-প্রতীতি।** কিন্তু **নিদর্শনায় আগে সাদৃশ্য-বোধের জন্ম, পরে বাক্য শেষ। নিদর্শনায়** কবি যে ভাববিহঙ্গটি পাঠকের মনের আকাশে উড়িয়ে দিতে চান, তার দুটি পক্ষ—উপমেয় আর উপমান।

তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের জন্য

'প্রতিবস্তু' কথাটার গঠনে **'প্রতি'**-র ভূমিকা কি ?

এর উত্তর খুব সহজ নয়। 'বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম' ব'লে যে কয়জন আলঙ্কারিক 'প্রতিবস্তূপমা'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন তাঁরা 'প্রতি' কি অর্থে এবং কিভাবে 'বস্তু'-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করেন নাই। সাধারণ ধর্ম্মের এই বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের কথা অল্প কয়জন আলঙ্কারিক বললেও এটিকে প্রতিবস্তূপমার একটি মূল্যবান্ লক্ষণ ব'লে মনে হ'ল। বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের অলঙ্কার 'দৃষ্টান্ত'; ওতে উপমেয়, উপমান সাধারণ ধর্ম্ম সবই বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন। কিন্তু 'দৃষ্টান্তে'রই মতন দুই স্বাধীন বাক্যের অলঙ্কার 'প্রতিবস্তূপমা'য় উপমেয় উপমানে বস্তুপ্রতিবস্তুভাব নাই, আছে শুধু সাধারণ ধর্ম্মে। পার্থক্যটুকু স্মরণীয়। কাজেই, 'প্রতিবস্তু' কথাটার সম্ভাব্য গঠনটি কেমন, একটু বিচার ক'রে দেখতে চাই।

প্রথমেই চলি **'নেতি'-র পথে** :

(i) 'প্রতিবস্তু'-র **'প্রতি' উপসর্গ নয়**। প্র, পরা, প্রতি ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে **অব্যয়। এদের উপসর্গ নাম হয় তখন, যখন ক্রিয়ার সঙ্গে এরা যুক্ত হয়**। 'বস্তু' কথাটি সাধারণ 'কৃৎ'প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দ নয়, 'উণাদি তুন্' প্রত্যয়যোগে সিদ্ধ (√বস্+উণাদি তুন্=বস্তু)। উপসর্গযুক্ত 'বস্'-ধাতুর উত্তর এই 'তুন্' প্রত্যয় হয় না।

(ii) 'প্রতিবস্তু' **অব্যয়ীভাব সমাসে গঠিত নয়**, কারণ সাধারণ ধর্ম্মের প্রতিবস্তু অব্যয় নয়, বিশেষ্যপদ।

(iii) 'প্রতি' **কর্ম্মপ্রবচনীয় নয়**। 'হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী'-র 'প্রতি'-র মতন 'বস্তুর প্রতি'র 'প্রতি'-কে যদি কর্ম্মপ্রবচনীয় বলি, তাহ'লে সমাস ক'রে 'প্রতিবস্তু' রূপ দেওয়া যায় না, কারণ কর্ম্মপ্রবচনীয়দের সমাসে বাঁধা নিষিদ্ধ ("কর্ম্মপ্রবচনীয়ানাং প্রতিষেধঃ"—কাত্যায়ন)।

(iv) 'প্রতিবস্তু'কে প্রাদিসমাসের পথে সিদ্ধ করা যায় না। গত, ক্রান্ত ইত্যাদি অর্থে প্র, অতি ইত্যাদির নির্দ্দিষ্ট বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে হয় প্রাদিসমাস। ক্ষেত্র অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। প্রতিবস্তুকে এখানে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না।

এই সব দেখে-শুনে একমাত্র সম্ভাব্য আশ্রয় ব'লে মনে হয়েছে নিত্যসমাস।

নিত্যসমাসে প্রতিবস্তু :

একরকম নিত্যসমাস আছে, যাকে বলা হয় **অ-স্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস।** স্বপদ অর্থাৎ সমস্তপদটির (compound word) নিজস্ব পূর্ব্বপদ এবং উত্তরপদ থেকে ব্যাসবাক্য হয় না, বাইরের থেকে বিশেষভাবের পদ এনে ব্যাসবাক্য ক'রে সমাসে সেটি লুপ্ত ক'রে দিতে হয় ; এই কারণে এর নাম অ-স্বপদবিগ্রহ। 'প্রতিবস্তু'কে এই পথে বিশ্লেষণ করা যাক :

'প্রতি' অব্যয়টির বহু অর্থ পাই 'শব্দরত্নাবলী'তে ; তাদের মধ্যে **একটি অর্থ 'সমাধি'**। 'সমাধি' মানে লীন হওয়া, অন্য সত্তার সঙ্গে আপন সত্তাকে এক ক'রে তোলা। **বস্তুতে সমাহিত ইতি প্রতিবস্তু, নিত্যসমাস।** 'প্রতি'র **অর্থ** 'সমাধি'কে নিয়ে ব্যাসবাক্য করতে হ'ল। আগে বলেছি প্রতিবস্তূপমায় উপমেয়বাক্যের সাধারণ ধর্ম্ম 'বস্তু' এবং উপমানবাক্যের, 'প্রতিবস্তু'। এইবার দেখা যাক, **বস্তুতে সমাহিত** এই ব্যাসবাক্যের নিত্য-সমাস 'প্রতিবস্তু' প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কারে কিভাবে কাজ করছে :

'সৌন্দর্য্য তোমার মতো **বিরল** ধরায়।
বৎসরে **কয়টি** রাত্রি লভে পূর্ণিমায় ?'—শ. চ.

—'**কয়টি**'=বেশী নয়, ৩৬৫টি রাত্রির মধ্যে মাত্র বারোটি='**বিরল**'। 'কয়টি' তাৎপর্য্যে 'বিরল' অর্থাৎ উপমানসাধারণধর্ম্ম তাৎপর্য্যে উপমেয়সাধারণধর্ম্ম—ভাষায় বিভিন্ন, অর্থে এক। **নিত্যসমাসের পথে : বস্তুতে** অর্থাৎ উপমেয়-সাধারণধর্ম্মে ('বিরল') **সমাহিত** অর্থাৎ তাৎপর্য্যে একরূপতা লাভ ক'রে ওরই মধ্যে লীন যে উপমানসাধারণধর্ম্ম ('কয়টি'), সে **প্রতিবস্তু।**

এই হ'ল সাধারণ ধর্ম্মের বস্তু-প্রতিবস্তুভাব।

বিম্ব, প্রতিবিম্ব :

'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কারের স্রষ্টা অষ্টম শতাব্দীর কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক আচার্য্য উদ্ভট ; সংজ্ঞায় 'প্রতিবিম্ব' কথাটির প্রয়োগ তিনিই করেন। 'বিম্ব' শব্দটি পরবর্ত্তী কালের যোজনা।

বিম্ব-প্রতিবিম্ব শব্দদুটির ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা কোনো আলঙ্কারিক বা টীকাকার করেন নাই। পথটি অবশ্য খুবই কঠিন।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে শব্দদুটির বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই। শাঙ্কর-দর্শনের জলতরঙ্গবৎ প্রতীয়মান মরীচিকায় সূর্য্যকিরণের প্রতিবিম্বের মতন ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জগৎ ; প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের পরমশিবের সংবিৎ-মুকুরে সৃষ্টিরূপ

আত্মপ্রতিবিম্ব; মাধ্বদর্শনের ইন্দ্রধনুতে সূর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিম্ববৎ জগৎ নিরুপাধিক ব্রহ্মের সোপাধিক প্রতিবিম্ব—সবগুলিতেই বিম্বেরই প্রতিস্থত রূপ প্রতিবিম্ব।

অলঙ্কারের প্রতিবিম্ব তা নয়। দর্শনে বিম্বই সত্য (ultimate reality), তাই অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টই হোক আর অবিশিষ্টই হোক; অলঙ্কারে বিম্ব প্রতিবিম্ব দুই-ই সত্য, তাই দ্বৈতবাদ। দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিবিম্ব অন্তর্ধান করে, থাকে শুধু বিম্ব; আলঙ্কারিক তত্ত্বজ্ঞানে একটা গূঢ় অর্থে পারস্পরিক সাদৃশ্য লাভ ক'রে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে বিম্ব-প্রতিবিম্ব। বরঞ্চ, প্রতিবিম্বগত কল্পনা-সৌন্দর্য্যে অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব ব'লে প্রতিবিম্বটারই মূল্য রসিকের কাছে বেশী।

ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ের প্রয়াস এখন থাক। আচার্য্যদের প্রতিবিম্ব-**ধারণার** একটা পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি।

'দৃষ্টান্ত'-সংজ্ঞায় উদ্ভট বলছেন:

"ইষ্টস্যার্থস্য বিস্পষ্ট-প্রতিবিম্বপ্রদর্শনম্।
যথেবাদিপদৈঃ শূন্যং বুধৈর্দৃষ্টান্ত উচ্যতে॥"

—**ইষ্ট অর্থের 'যথা'-ইত্যাদিপদবর্জ্জিত প্রতিবিম্বপ্রদর্শন** ('বুধ'গণের মতে) **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার**। চুপিচুপি একটা কথা ব'লে নিই—'বুধ' (পণ্ডিত) কথাটি অর্থহীন, কারণ 'দৃষ্টান্তে'র স্রষ্টা উদ্ভট স্বয়ং; যেটা সম্পূর্ণরূপে নিজের মত বা পথ তাকে প্রাচীনতর আচার্য্যদের মত ব'লে ঘোষণা করা বিশেষ ক'রে কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিকদের একটা অভ্যাস, যেমন করেছেন 'ধ্বনি'কার সম্পূর্ণ নিজস্ব মত "কাব্যস্য আত্মা ধ্বনিঃ"-কে "**বুধৈঃ** সমাম্নাতপূর্ব্বঃ" ব'লে, অথচ তাঁর পূর্ব্বে 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি' বলা তো দূরের কথা, কাব্যসূত্রে 'ধ্বনি' কথাটারই প্রয়োগ কেউই করেন নাই। ফিরে আসি মূল কথায়:

'ইষ্ট অর্থ' মানে কবির বর্ণনীয় **প্রকৃত বা প্রস্তুত; প্রতিবিম্বটি** ইষ্ট অর্থ নয় ব'লে **অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত**। প্রকৃত আর অপ্রকৃত পাশাপাশি থাকবে, তুলনাবাচক পদ **ইত্যাদি** থাকবে না, **অপ্রকৃতটি** হবে প্রকৃতের **প্রতিবিম্ব**। ব্যাখ্যাকার অভিনবগুপ্তগুরু প্রতীহারেন্দুরাজ বলছেন "প্রতিবিম্বং সদৃশং বস্তু" —প্রতিবিম্বব্যাখ্যা এইটুকুতেই সমাপ্ত। 'সদৃশ বস্তু' যদি প্রতিবিম্ব হয়, তাহ'লে সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারমাত্রেরই উপমানটি (যেমন, 'ভোমরার মতন কালো চুলে'র **ভোমরা**) প্রতিবিম্ব হ'য়ে যায়; তবে শুধু দৃষ্টান্তের বেলায় প্রতিবিম্ব বলার সার্থকতা কি? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে ইন্দুরাজ বলছেন, 'যথা ইত্যাদিপদশূন্য'—এই কথাটার **আদি** মানে **সাধারণ ধর্ম্ম**

("উপমাদৌ অপি এবংবিধস্য রূপস্য সম্ভবঃ, তন্নিরাকরণার্থম্ উক্তম্—'যথেবাদিপদৈঃ শূন্যম্' ইতি। '**আদি**'-গ্রহণেন অত্র **সাধারণধর্ম্মস্য** অপি পরিগ্রহঃ")। তাহ'লে, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই: দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে প্রস্তুত (কবির অভীষ্ট) এবং অপ্রস্তুত ভাষায় ব্যক্তরূপে পাশাপাশি থাকে, তুলনাবাচক শব্দ থাকে না, **সাধারণ ধর্ম্ম থাকে না**, অথচ অপ্রস্তুতটি হয় প্রস্তুতের প্রতিবিম্ব। এখন নূতন একটা প্রশ্ন জাগে: '**ভোমরাচুলে** কুন্দ-ফুলের মালা'—'ভোমরাচুলে' লুপ্তোপমা, তুলনাবাচক শব্দ নাই, সাধারণ ধর্ম্ম নাই; তবে 'ভোমরা' কি চুলের প্রতিবিম্ব? এর উত্তর—**না**; যেহেতু, তুলনাবাচক শব্দ আর সাধারণ ধর্ম্ম (মতো, কালো) আছে, কিন্তু **সমাসে** লুপ্ত অবস্থায়।

একাদশ শতাব্দীর মম্মটভট্ট প্রতিবিম্বকে জটিল ক'রে তুললেন এই কথা ব'লে যে দৃষ্টান্তে সাধারণধর্ম্মাদি সবকিছুরই প্রতিবিম্বন ("দৃষ্টান্তে পুনরেতেষাং সর্ব্বেষাং প্রতিবিম্বনম্। এতেষাং সাধারণধর্ম্মাদীনাম্")। কিন্তু দৃষ্টান্তে যখন সাধারণ ধর্ম্মই নাই, তখন সাধারণ ধর্ম্মের প্রতিবিম্বন হয় কেমন ক'রে? মম্মটের কঠিন নীরবতার মধ্যে কি অর্থ গুহাহিত হ'য়ে আছে, তিনিই জানেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর রুয্যক অনেকটা স্পষ্ট—"সাধারণধর্ম্মস্য......বিম্বপ্রতিবিম্ব-ভাবঃ দৃষ্টান্তবৎ"। লক্ষণীয় যে এখানে প্রতিবিম্বের সঙ্গে **বিম্ব** কথাটা যুক্ত হয়েছে; নিশ্চয় নূতন সংবাদ। পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকরা 'বিম্ব-প্রতিবিম্ব' কথাটা প্রয়োগ করেছেন রুয্যকেরই **অনুসরণে**। আমাদের উদ্ধৃতিটুকুর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে টীকাকার সমুদ্রবন্ধ যা বলেছেন তাতে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, **বিম্বপ্রতিবিম্ব** মানে **পারস্পরিক সাদৃশ্য**; এই **বিম্বপ্রতিবিম্ব ধর্ম্ম আর ধর্ম্মী দুয়েরই** ("বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ **মিথঃ** সাদৃশ্যম্, অয়ং তু ধর্ম্মধর্ম্মিণোঃ উভয়োঃ অপি ভবতি"।)। **ধর্ম্ম** মানে **প্রস্তুতের ধর্ম্ম** (বিম্ব) এবং **অপ্রস্তুতের ধর্ম্ম** (প্রতিবিম্ব)। **ধর্ম্মী** মানে **ধর্ম্মযুক্ত প্রস্তুত অর্থাৎ উপমেয়** (বিম্ব) এবং **ধর্ম্মযুক্ত অপ্রস্তুত অর্থাৎ উপমান** (প্রতিবিম্ব)। এর নিষ্কর্ষ এই যে **দৃষ্টান্তে ধর্ম্মদুটি পরস্পরের সদৃশ**। অতীব মূল্যবান্ এই কথাটি। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বিশ্বনাথও এই ধর্ম্মদুটির সম্পর্ক-সম্বন্ধে বলেছেন, "সাম্যম্ এব, ন তু ঐকরূপ্যম্"—শুধু সাদৃশ্য, (প্রতিবস্তূপমার মতন) একার্থকতা নয়।

বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন **অসাধারণ** উপমার দুটি সুন্দর উদাহরণ পাচ্ছি—একটি রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' কবিতায় আর একটি রুয্যকের 'অলঙ্কার-

সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে। আশ্চর্য্য এই যে দুই কবিই এক কথা বলেছেন। প্রথমে সংস্কৃত কবিতাটির মূলশব্দ যথাসম্ভব বজায় রেখে অনুবাদ করি; এতে সুবিধা হবে এই যে এর ভিতরকার বিম্বপ্রতিবিম্বভাবটি টীকাকারের চোখ দিয়েই দেখতে পাব। পরে দেব এর তরল (অবশ্য যথাসম্ভব মূলানুগত) অনুবাদ। (মূলটুকু হ'ল—

"বলিতকন্ধরমাননম্ আবৃত্তবৃন্তশতপত্রনিভম্"।)

'বলিতকন্ধর ওই তোমার আনন,
সুন্দরি, আবৃত্তবৃন্ত পদ্মের মতন।'—শ. চ.

—'বলিত'=ভঙ্গীভরে বাঁকানো, 'কন্ধরা'=গ্রীবা; 'আবৃত্ত'=উল্‌টে পড়া। অলঙ্কার পূর্ণোপমা: উপমেয় 'আনন', উপমান 'পদ্ম'। বলিত কন্ধরা যার সেই আননখানি আবৃত্ত বৃন্ত যার সেই পদ্মের মতন—এই হ'ল সমাসভাঙা সরল রূপ। এখানে কবি শুধু পদ্মের সঙ্গে মুখের তুলনা করছেন না; করছেন **বৃন্তলগ্ন পদ্মের** সঙ্গে **গ্রীবালগ্ন মুখের**। সুতরাং **বৃন্তের সঙ্গে গ্রীবার প্রচ্ছন্ন তুলনা রয়েছে**। গ্রীবা, বৃন্ত দুটিই বিশেষ্যপদ; কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে **বৃন্ত আর গ্রীবা যথাক্রমে পদ্ম আর মুখের বিশেষণ-ভাবাপন্ন**। ফলে বৃন্ত হ'যে উঠেছে পদ্মের ধর্ম্ম, গ্রীবা মুখের ধর্ম্ম। মূলে 'বলিতকন্ধর' আর 'আবৃত্তবৃন্ত' বহুব্রীহি সমাসের ফলে বিশেষণ। আবার, 'বলিত' 'কন্ধরা'র এবং 'আবৃত্ত' 'বৃন্তের' বিশেষণ—ভাষায় ভিন্ন, অর্থে এক; তাই 'বলিত-আবৃত্ত' বস্তুপ্রতিবস্তুভাবাপন্ন। পরিশেষে পরস্পরসদৃশ **গ্রীবা আর বৃন্ত** যথাক্রমে **মুখ আর পদ্মের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে** (relatively to the face and the lotus) **বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম** ("কন্ধরাবৃন্তয়োঃ মুখশতপত্রাপেক্ষয়া সাধারণধর্ম্মত্বাভিপ্রায়েণ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ এব"—অলঙ্কারসর্ব্বস্বব্যাখ্যায় সমুদ্রবন্ধ)। সহজ কথায়, গ্রীবা আর বৃন্ত হ'ল মুখ আর পদ্মের সাধারণ ধর্ম্ম—গ্রীবা বিম্ব, বৃন্ত প্রতিবিম্ব। এই আলোকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশটুকু দেখলেই বিম্বপ্রতিবিম্ব মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়াবে। এর পাশেই দিচ্ছি সংস্কৃতটির তরল অনুবাদ।

(i) "নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো।" —রবীন্দ্রনাথ।

(ii) 'বাঁকিয়ে তোলা গ্রীবায় তোমার আননখানি
উল্‌টে পড়া বৃন্তে কমলসম, রানি।' —শ. চ.

—রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশটিতে 'নবস্ফুট পুষ্পসম মুখখানি' এইটুকু হ'ল সরল উপমার রূপ। কিন্তু 'এহো বাহ্য'। কবির চিত্রখানির ষোলোকলায় পূর্ণ সৌন্দর্য্য হেলায়ে, গ্রীবা, বৃন্ত, পুষ্প, মুখ সবকিছুর সমগ্রতায়। এখানে **গ্রীবাবৃন্তহীন** মুখপুষ্প আকাশকুসুম, রসদৃষ্টিতে **অসুন্দর**। হেলানো বঙ্কিম গ্রীবায় নবস্ফুট (লক্ষণায়, যৌবনে সন্ত-উদ্ভিন্ন) মুখ হেলানো নিরুপম বৃন্তে নবস্ফুট পুষ্পের মতন—পরিপূর্ণ চিত্র। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এখানেও (সংস্কৃতটির মতন) **উপমার ভিতর উপমা রয়েছে**—মুখ আর পুষ্পকে নিয়ে যে মুখ্য উপমা তারই সহকারী হ'য়ে গৌণ উপমা রয়েছে গ্রীবা আর বৃন্তকে নিয়ে—বৃন্তের মতন গ্রীবায় পুষ্পের মতন মুখ। এইজাতীয় উপমার পীযূষবর্ষ জয়দেব তাঁর 'চন্দ্রালোকে' নাম দিয়েছেন '**স্তবকোপমা**'। গৌণ উপমাটিতে উপমেয় 'গ্রীবা', উপমান 'বৃন্ত', বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের সাধারণ ধর্ম্ম 'বঙ্কিম-নিরুপম'। 'নিরুপম' মানে, এখানে, উপমাহীন নয়, কোনো কিছুর উপমা দিয়ে তাকে আর 'নিরুপম' বলা চলে না; 'নিরুপম'=অত্যন্ত সুন্দর। 'গ্রীবা বৃন্ত'-কে রূপক অলঙ্কার বলা ভুল, মুখকে ফুলের **মতন** বললে গ্রীবায় বৃন্তের অভেদ-আরোপ অসঙ্গত হয়। এখানেও **গ্রীবাবিশিষ্ট** মুখের **বৃন্তবিশিষ্ট** পুষ্পের সঙ্গে তুলনা ব'লে 'গ্রীবা' **আর 'বৃন্ত' যথাক্রমে মুখ আর পুষ্পের সম্পর্কে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন সাধারণ ধর্ম্ম**।

এইবার দেখা যাক সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'রসগঙ্গাধরে' কি বলছেন বিম্বপ্রতিবিম্ব-সম্বন্ধে। তাঁর একটি উদাহরণঃ "চলদ্‌ভৃঙ্গমিবাম্ভোজমধীরনয়নং মুখম্"। বাঙলায়

'চলৎ-ভৃঙ্গ পঙ্কজসম অধীরনয়ন মুখ'—শ. চ.

—বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ 'চলৎ-ভৃঙ্গ' আর 'অধীরনয়ন' যথাক্রমে পঙ্কজ আর মুখকে বিশিষ্ট করছে। জগন্নাথ বলছেন, 'চলৎ' 'অধীর' বিশেষণদুটির অর্থ এক হ'লেও প্রকাশের ভাষা বিভিন্ন ব'লে এদের বস্তুপ্রতিবস্তুভাব (রবীন্দ্রনাথে এবং রুয্যকেও এই ব্যাপার দেখিয়ে এলাম)। এদের দ্বারা বিশিষ্ট বিশেষ্যপদ **ভৃঙ্গ আর নয়নের বিম্বপ্রতিবিম্বভাব** ("অত্র চলনাধীরত্বয়োঃ বিশেষণয়োঃ বস্তুতঃ একরূপয়োঃ অপি শব্দদ্বয়েন উপাদানাৎ বস্তুপ্রতিবস্তুভাবঃ। তদ্বিশেষণকয়োঃ চ **ভৃঙ্গনয়নয়োঃ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ**")। জগন্নাথের মন্তব্য থেকে মনে হ'তে পারে যে উপমান পঙ্কজের ধর্ম্ম ভৃঙ্গ হ'ল বিম্ব আর উপমেয় মুখের ধর্ম্ম নয়ন প্রতিবিম্ব। বস্তুতঃ তা নয়। তিনি উদাহরণে আগে দিয়েছেন উপমান (অম্ভোজ=পদ্ম), পরে দিয়েছেন উপমেয় (মুখ)। তাই উপমানের ধর্ম্ম

ভৃঙ্গকে আগে দিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সমাস করেছেন উপমেয়ের ধর্ম্ম নয়নের। এ অবস্থায় লিখতে হয় 'ভৃঙ্গনয়নয়োঃ প্রতিবিম্ববিম্বভাবঃ', কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাসে অল্পস্বর-বিশিষ্ট পদ আগে বসে ; তাই প্রতিবিম্বকে পরে দিয়ে বিম্বকে তিনি আগে বসিয়েছেন। **উপমেয়ের ধর্ম্ম বিম্ব** আর উপমানের ধর্ম্ম প্রতিবিম্ব একথা জগন্নাথই বলেছেন—'**উপমেয়ের ধর্ম্ম** এবং **উপমানের ধর্ম্ম অ-সাধারণ** (not common to both উপমেয় and উপমান, different) হ'লেও **তাদের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে** অভেদ-অধ্যবসায়ের দ্বারা **সাধারণত্ব কল্পনা করা হয়** এবং এই কল্পনা থেকেই হয় উপমাসিদ্ধি। **একেই প্রাচীনগণ বলেছেন বিম্বপ্রতিবিম্বভাব**' ("উপমেয়গতানাম্ উপমানগতানাং চ অসাধারণানাম্ অপি ধর্ম্মাণাং সাদৃশ্যমূলেন অভেদাধ্যবসায়েন সাধারণত্বকল্পনাৎ উপমাসিদ্ধিঃ। অয়ম্ এব বিম্বপ্রতিবিম্বভাবঃ ইতি প্রাচীনৈঃ অভিধীয়তে")।

তিনটি উদাহরণেই দেখলাম মূল বিম্বপ্রতিবিম্বের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বস্তুপ্রতিবস্তু। এটা দোষ নয়, গুণ; বড়ো কবিদের রচনায় এরকম হ'য়েই থাকে। জগন্নাথ নিজে কবি ; দেখে-শুনেই তিনি বলেছেন—"...ধর্ম্মঃ ক্বচিৎ চ **কেবলং** বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্নঃ, **ক্বচিৎ বস্তুপ্রতিবস্তুভাবেন করম্বিতঃ** বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবঃ..."।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে : বস্তুপ্রতিবস্তুভাবের বিশেষণ সাধারণ ধর্ম্মের কাজ ক'রে বিম্বধর্ম্ম আর প্রতিবিম্বধর্ম্ম যে সদৃশ তা যখন স্পষ্টই দেখিয়ে দিচ্ছে, তখন সাদৃশ্যকে প্রণিধানগম্য বলেন কেমন ক'রে ?

একটা উদাহরণ তৈরী ক'রে এর উত্তর দিচ্ছি—

একটু আগেই বলেছি যে প্রকৃতের ধর্ম্ম অপ্রকৃতের ধর্ম্ম সদৃশ হ'লে তবেই ওরা হয় বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্ম ; আবার, দুই ধর্ম্ম সদৃশ হ'লে ওরা স্বয়ং উপমেয় উপমানের মতন হ'য়ে পড়ে। জগন্নাথের উদাহরণটির বিম্ব-প্রতিবিম্ব সাধারণ ধর্ম্ম অংশকে উপমার মতন সাজালে হয়—'**চপল মধুকরের মতো নয়ন চঞ্চল**' (শ. চ.)। এর 'মধুকর'-এর জায়গায় বসিয়ে দিই 'প্রজাপতি' :

'চপল প্রজাপতির মতো নয়ন চঞ্চল' (শ. চ.)।

দেখা যাচ্ছে যে স্বভাব-চঞ্চল মধুকরের মতন স্বভাবচঞ্চল প্রজাপতিকে নিয়েও চোখের চাঞ্চল্যের মাত্রা ঠিকই আছে। নয়ন-প্রজাপতি সদৃশ যখন তখন বিম্বপ্রতিবিম্ব বলতে হবে বই কি। কিন্তু এই **ভাবিত** সাদৃশ্যের অন্তরালে তো কোনো **আভাসিত** সাদৃশ্যের সন্ধান দিচ্ছে না প্রজাপতি, যা পাচ্ছি মধুকরের

কাছে—**মধুকর কালো, চোখের তারা কালো**; প্রজাপতি অসার্থক, কারণ চোখের চাঞ্চল্য মানে ছানিপড়া চোখের পিটপিট করা নয়।

'**প্রতিবিম্ব**' মানে কি? সাধারণ আলোচনায় ব'লে এসেছি বিম্ব, প্রতিবিম্ব দুইয়েরই এক **অর্থ**—সদৃশ বস্তু। কিন্তু **'বিম্ব' মানে কোনো-কিছুর সদৃশ এবং 'প্রতিবিম্ব' মানে বিম্বের বিম্ব অর্থাৎ সদৃশের সদৃশ অলঙ্কারসূত্রে এই কথাটা প্রথম শুনলাম সাহিত্যদর্পণের ব্যাখ্যাকার রামতর্কবাগীশ (১৭০০ খৃঃ) মশায়ের** মুখে। তিনি বললেন—প্রতিবিম্ব হ'ল "**বিম্বস্য সদৃশস্য অনুবিম্বত্বম্**।" একদিকে জটিলতা বেড়ে গেল বটে, তবে লাভের ঘরও একেবারে শূন্য থাকল না। **বিম্ব স্বয়ং যার সদৃশ, সেই বস্তুটি কি**? দেখা যাচ্ছে যে শুধু বিম্ব প্রতিবিম্ব নয়, আরও একটি আছে—(i) একটা **অজ্ঞাত** কিছু, (ii) এই **অজ্ঞাতের** সদৃশ **বিম্ব**, (iii) এই **বিম্বের** সদৃশ **প্রতিবিম্ব**। প্রথমটি থাকে দূরে গোপনে আবিষ্কৃত হওয়ার প্রতীক্ষায়; ইনিই আমাদের স্থূলাক্ষর প্রশ্নের '**বস্তু**'। এই মূলটি যতক্ষণ না চোখে পড়বে, ততক্ষণ দ্বিতীয়-তৃতীয়কে বিম্বপ্রতিবিম্ব ব'লে চেনা যাবে না। আমাদের আগের অনুচ্ছেদের 'কালো' হ'ল প্রথম, 'নয়ন' দ্বিতীয়, 'মধুকর' তৃতীয় অর্থাৎ 'কালো'র বিম্ব নয়ন, নয়নের অনুবিম্ব (প্রতিবিম্ব) মধুকর। বেশ লাগছে; কিন্তু…। কিন্তু জটিল সমস্যা এই যে নিজের বিম্ব ফেলতে পারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু; কালোত্ব গুণ, তার তো বিম্ব সম্ভব নয়। তবে? তবে আর কি? অবাঙ্মানসগোচরং ব্রহ্ম যদি বিম্ব বা প্রতিবিম্ব ফেলতে পারেন, 'কালোত্ব' পারবে না কেন? বেদান্তে ব্রহ্মের বিম্বপ্রতিবিম্ব যেমন **ঔপচারিক**, কালোত্বেরও তাই—শুধু কল্পনা। ধ'রে নেওয়া যাক, ভাবসত্তা আশ্রয়হীন কালো **যেন** আপনাকে রূপায়িত করছে **চোখের তারার** আশ্রয়ে, এরই আবার সদৃশ রূপায়ণ জাগছে **মধুকরে**—বিম্ব প্রতিবিম্ব।

১২। সমাসোক্তি

প্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুতের **ব্যবহার** আরোপিত হ'লে হয় **সমাসোক্তি** অলঙ্কার।

(প্রস্তুত, প্রকৃত, প্রাকরণিক, বিষয় প্রভৃতি সমপর্য্যায় শব্দ)

'রূপক' এবং 'সমাসোক্তি' দুটিতেই রয়েছে প্রস্তুতের উপর **আরোপের** কথা। পার্থক্য এই যে **রূপকে** আরোপিত হয় **অপ্রস্তুত স্বয়ং** আর **সমাসোক্তিতে**

অপ্রস্তুতের **শুধু ব্যবহার; রূপকে অপ্রস্তুত আপন রূপের আরোপে প্রস্তুতের রূপটিকে করে আচ্ছন্ন আর সমাসোক্তিতে অপ্রস্তুত আপন রূপটি ঢেকে রেখে প্রস্তুতের উপর শুধু নিজের ব্যবহারটুকু আরোপ ক'রে প্রস্তুতকে দান করে মধুর বৈশিষ্ট্য।**

সমাসোক্তিতে প্রস্তুতটি বাচ্য, অপ্রস্তুতটি প্রতীয়মান। আরোপিত ব্যবহার থেকে হয় অপ্রস্তুতের প্রতীতি।

'ব্যবহার' মানে আচরণ, স্বভাব (behaviour, nature) ইত্যাদি। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই যে 'ব্যবহার' সীমাবদ্ধ নয়, একটু পরেই তা দেখা যাবে।

আলঙ্কারিক পরিভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ব্যবহার-আরোপ ঘটে প্রস্তুত অপ্রস্তুত দুপক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য এমন কার্য্য, লিঙ্গ আর **বিশেষণের** প্রয়োগে। উদাহরণের পথে চলি—

(i) 'তটিনী চলেছে অভিসারে'—শ. চ.

এখানে, 'অভিসার' **কার্য্যটি** হ'তে হচ্ছে অপ্রস্তুত নায়িকার প্রতীতি অর্থাৎ নায়িকার অভিসারক্রিয়াটি অচেতনা তটিনীর উপর আরোপিত হওয়ায় এর থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে তটিনী নায়িকা।

(ii) 'জগৎ ভ্রমিয়া শেষে
সন্ধ্যার পাশে তপন দাঁড়াল এসে।'—শ. চ.

এখানে, ব্যাকরণগত **লিঙ্গ**বিচারে তপন-সন্ধ্যা পুরুষ-নারী; এর থেকে প্রতীয়মান তপন-সন্ধ্যা নায়ক-নায়িকা।

(iii) 'দেখিলাম কালবৈশাখীর
ভ্রূকুটিকুটিল কালো কঠোর কাঠিন্যভরা মুখ।'—শ. চ.

এখানে, 'ভ্রূকুটি' থেকে 'মুখ' পর্য্যন্ত সবটাই 'কালবৈশাখী'র **বিশেষণ**। এ বিশেষণ ব্যাকরণমতের বিশেষণপদ নয়, 'কালবৈশাখী'কে **বৈশিষ্ট্য** দান করেছে ব'লে বিশেষণ (এমনি বিশেষণ 'একাবলী' অলঙ্কারে পাব। "গাছে গাছে ফুল......" উদাহরণব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। এই বিশেষণ থেকে প্রতীতি হচ্ছে যে কবি (প্রস্তুত) কালবৈশাখীকে (অপ্রস্তুত) হিংসাপরায়ণা কোপন-স্বভাবা রমণী ব'লে কল্পনা করেছেন।

মন্তব্য: (ii)-চিহ্নিত উদাহরণটিতে লিঙ্গবিচার করেছি সংস্কৃত-অলঙ্কারিকদের মতে ব্যাকরণের পথে। আধুনিক ভাষায় সাহিত্যের অলঙ্কারে লিঙ্গবিচার সর্ব্বত্র এইভাবে চলে না। ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি রাখতে গেলে বিদ্যাপতি ক্লীবলিঙ্গ বস্ত্রের উপর নায়কব্যবহার আরোপিত ক'রে সমাসোক্তি

করতে পারতেন না ("ও মুকি করতহি……"একটু পরেই দেখা যাবে), মধুকবি ক্লীবলিঙ্গ 'কমল'-কে দিয়ে গ্রাস করিয়ে সীতার অতিশয়োক্তি করতে পারতেন না ("রঘুকুলকমলেরে"), রবীন্দ্রনাথ পুংলিঙ্গ সমুদ্রের উপর মাতৃত্ব আরোপ ক'রে—"হে আদি জননী সিন্ধু……" ব'লে রূপক করতে পারতেন না।

ব্যবহার-আরোপ হয় এইভাবে ঃ

(ক) লৌকিক বস্তুর উপর লৌকিক বস্তুর ব্যবহার-আরোপ—

(উপরের তিনটি উদাহরণই এই লক্ষণাক্রান্ত।)

(iv) "ও মুকি করতহি দেহা।
অবহুঁ ছোডব মোহি তেজব নেহা॥
ঐসন রস নহি পাওঅব আরা।
ইথে লাগি রোএ গলএ জলধারা॥" —বিদ্যাপতি।

বাঙলায় অনুবাদ ক'রে দিলাম :—

রাধার বসন লুকাইতে চায় দেহে—
এখনি ছাড়িবে বঞ্চিত হব স্নেহে,
এইমত রস নাহি যে পাইব আর,
তাই সে কাঁদিছে গলিছে সলিলধার।

—শ্রীমতী স্নান ক'রে উঠেছেন। সিক্ত বসন তাঁর অঙ্গে লেপ্টে লেগে আছে এবং তার থেকে ঝরছে জলধারা। কবি বলছেন, রাধা এখনি ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলবেন, কাপড়খানি তাই তাঁর অঙ্গে লুকিয়ে পড়তে চাইছে ; রাধার স্নেহে সে বঞ্চিত হবে, শ্রীঅঙ্গের স্পর্শরস ভোগ সে করতে পাবে না এই বেদনায় সে কাঁদছে ব'লে তার অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। প্রস্তুত বসনের উপর অপ্রস্তুত নায়কের ব্যবহার আরোপিত হয়েছে। অতএব অলঙ্কার সমাসোক্তি। (ও=সিক্তবাস)।

লক্ষণীয় ঃ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাবানুষঙ্গই এইজাতীয় সমাসোক্তির উপাদান। **'লৌকিক'** কথাটার সার্থকতা এইখানে।

(v) "ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে
যৌবন-লাবণ্য যেন লইতে চাহে কেড়ে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—সদ্যঃস্নাতা সুন্দরীর সিক্ত বসনখানি দেহে তার এমনভাবে লেপ্টে লেগে আছে যেন তার যৌবনলাবণ্যটুকু নিঃশেষে কেড়ে নিতে চায়। অলঙ্কারব্যাখ্যা পূর্ববৎ। বিদ্যাপতির কবিতাটিই সুন্দরতর।

(vi) "রাত্রি গভীর হ'লো,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোলো গো যন্ত্র তোলো।
ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে,
দেখ গো হোথায় হাফর হাঁফায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি"—যতীন্দ্রনাথ।

—কামারের হাতে ভোর থেকে এরা কাজ আরম্ভ করেছে। এখন গভীর রাত, এরা আর পারছে না। নেহাই, আগুন, শাঁড়াসি, হাফর, হাতুড়ি সকলেরই উপর ক্লান্ত শ্রমিকের ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

(vii) "ঘুরে ঘুরে ঘুম্‌তী চলে ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে!
বেলচামেলীর চুম্‌কিচুলে, ফুলেল হাওয়ায় চোখ ঢোলে!"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

—ঘুম্‌তী নদীতে আরোপিত হয়েছে নর্ত্তকীর ব্যবহার।

(viii) "নয়নে তব, হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া হায় রতন-মুকুট
তোমার⋯ " —মধুসূদন।

—শোকতপ্তা নারীর ব্যবহার লঙ্কাপুরীর উপর আরোপিত হয়েছে।

(ix) "চাহিয়া ঈর্ষ্যার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।" —যতীন্দ্রমোহন।

—নায়কসঙ্গসুখবঞ্চিত নায়িকার ব্যবহার পদ্মদলে আরোপিত হয়েছে।

(x) "শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই।" —নজরুল ইস্‌লাম।

(xi) "বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xii) "বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম-অবসানে,
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "বাতাসে শ্বসি বেতসীবন হুতাশে মরে হুতাশ মন"
—কালিদাস।

(xiv) "বেলচামেলীমল্লীহেনাযূথী
এদের মুখে সঞ্চিত যে সুধা,
শোনাই যদি একটুখানিক স্তুতি
পিয়ায় মোরে মিটায় আমার ক্ষুধা;
গোলাপ হ'ল দুর্লভাদের দলে…" —শ্যামাপদ।

(xv) "এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যে'তো ছোটো কলসীটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া;
সোহাগে জল উথলে উঠি পড়তো প্রিয়ার বক্ষে লুটি"
—কুমুদরঞ্জন।

(xvi) "কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্ব্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবনবনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি'
প্রণয়ে বিকশি ?" —রবীন্দ্রনাথ।

—এ উদাহরণটির বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে **মানসসুন্দরী**র উপর **লতার** ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

(xvii) "অপলক নেত্র তার আলোকসুষমা
গণ্ডুষে সাগরসম করিল নিঃশেষ।" —মোহিতলাল।

—'নেত্রে' **অগস্ত্যের** ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

(xviii) "সুন্দরী,
সুন্দর তোমার দেহ **গণ্ডুষে** লইব পান করি।" —বুদ্ধদেব।

—এখানেও **উহ্য 'আমি'**-র উপর **অগস্ত্য**-ব্যবহার আরোপিত হয়েছে।

(খ) **লৌকিক বস্তুর উপর শাস্ত্রীয় বস্তুর ব্যবহার-আরোপ—**

(xix) "ক্রিয়াহীন কর্ত্তা আজি আমি এ জগতে;
কর্ম্ম ভাই চারিজন;
কর্ত্তা-কর্ম্মে করি যোগ, ক্রিয়া হ'য়ে তুমি
সংসার-ধর্ম্মের মন্ত্র করিও রচনা।" —অমৃতলাল।

—এটিতে **লৌকিক** ব্যাপারের উপর **ব্যাকরণশাস্ত্রের ব্যবহার** আরোপিত হয়েছে। উক্তিটি দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের।

(xx) "পীতবাস বড় **তাপিত,** দেখিলাম **উদর স্ফীত**—
উদরী সন্দেহ তাতে নাই।
হয় বা বঁধুর প্রাণদণ্ড, পথ্য তাতে **মানখণ্ড**
ব্যবস্থা হয়েছে ওগো রাই॥
আছে যেন প্রস্তুত ঘরে, শীঘ্র **মান** চূর্ণ ক'রে
অগ্রে দাও···।" —দাশরথি।

—এখানে **লৌকিকের** উপর **আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ব্যবহার** আরোপিত হয়েছে। মানিনী রাধার প্রতি সখীর উক্তি। রাধার দুর্জ্জয় মানের ফলে দুঃসহ বিরহতাপে তপ্ত কৃষ্ণ, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে তাঁর পেট উঠছে ফুলে ফুলে; অবস্থা শোচনীয়, কৃষ্ণ বাঁচেন কিনা সন্দেহ। রাধা মান বর্জ্জন করলেই কিন্তু সব ঠিক হ'য়ে যায়। সখী রাধাকে এই কথাই বলছেন।

লক্ষণীয় যে 'মান' আর 'মানখণ্ড' কথাদুটিতে রয়েছে শব্দশ্লেষ আর রয়েছে 'তাপিত' আর 'উদরী'তে। জ্বরযুক্ত উদরীরোগে আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবস্থা 'মানখণ্ড' (সত্যই একটা ওষুধের নাম); কৃষ্ণপক্ষে, বিরহতাপ আর দীর্ঘশ্বাসে উদর-স্ফীতিরও প্রতীকারের উপায় 'মানখণ্ড' অর্থাৎ রাধাকর্ত্তৃক আপন মানের খণ্ডন (বর্জ্জন)।

এইবার একটি অতিসুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি সংস্কৃত থেকে—

(xxi) 'নয়ন-সীমার বাহিরে তাহার বাসা,
পরশিতে তারে পারেনি কখনো ভাষা,
উপমান তার কিছু নাই এ নিখিলে,
অর্থে তাহার আভাসও কভু না মিলে,
প্রমাণবিহীন সংবিৎ-ঘন নিত্যানন্দময়
পরম সত্তা—তরুণীর তনুলাবণ্য জয় জয়!' —শ. চ.

('অলঙ্কারসর্ব্বস্ব'র "সীমানং ন জগাম যৎ নয়নয়োঃ······লাবণ্যং জয়তি প্রমাণরহিতং চেতশ্চমৎকারকম্॥" কবিতার অনুবাদ।)

—এখানে **লৌকিক বস্তুর** ('তরুণীর তনুলাবণ্য') উপর **বেদান্তের ব্যবহার** আরোপিত: **'নয়ন' থেকে 'সত্তা' পর্য্যন্ত ব্রহ্মস্বরূপকথা।**

সংস্কৃতে আর দুটি প্রকারভেদ আছে—শাস্ত্রীয় বস্তুর উপর শাস্ত্রীয় বস্তুর

ব্যবহার-আরোপ আর শাস্ত্রীয় বস্তুর উপর লৌকিক বস্তুর ব্যবহার-আরোপ। বাঙলায় এদুটি নিষ্প্রয়োজন—অনেক অনুসন্ধান ক'রেও উদাহরণ পেলাম না।

আগে বলেছি, 'ব্যবহার' কথাটার অর্থ শুধু 'আচরণ' 'স্বভাব' ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার নিদর্শন দেখা গেল (খ) শ্রেণীর উদাহরণগুলিতে। **শাস্ত্রীয় বস্তুর ব্যবহার-আরোপ মানে, প্রকৃতপক্ষে, শাস্ত্রীয় পরিভাষার** (technicalities) **আরোপ**। এই শ্রেণীর সমাসোক্তির Personification বা Pathetic Fallacy-র সঙ্গে কোনো মিল নাই। কিন্তু (ক) শ্রেণীর সমাসোক্তির পাশ্চাত্ত্য Figure-দুটির সঙ্গে সর্ব্বাংশে না হ'লেও বহুলাংশে মিল রয়েছে। Pathetic Fallacy-র সংজ্ঞা হ'ল attribution of human emotion to inanimate objects (অপ্রাণীর উপর মানবীয় অনুভবের আরোপ)। আমাদের (ক) শ্রেণীর (xvi) আর (xviii) উদাহরণদুটির ("কার এত দিব্যজ্ঞান…" আর "সুন্দরী…") প্রথমটিতে নারীর উপর inanimate লতার ব্যবহার এবং দ্বিতীয়টিতে আধুনিক মানুষের উপর পৌরাণিক মানুষের অলৌকিক ব্যবহার আরোপিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যমতে এদুটি Metaphor-এর উদাহরণ।

'Pathetic Fallacy' নামটা Ruskin-এর সৃষ্টি—সত্যকথা বলতে গেলে **অপসৃষ্টি**। ভাবাবেগে কবিদের যখন "reason is unhinged" তখন ঝাপ্‌সা চোখে তারা প্রকৃতির রাজ্যে যা কিছু দেখে সব 'false' অর্থাৎ fallacious। এইহেতু Ruskin এর নাম দিলেন Pathetic **Fallacy**। 'Reason'-কে 'hinged' রাখলে Art হয় না, Arithmetic হয়।

এই Pathetic Fallacy-জাতীয় সমাসোক্তিই রবীন্দ্রনাথের বহু অত্যুৎকৃষ্ট কবিতার আত্মা—'বলাকা'র কবিতা, বৃক্ষবন্দনা ইত্যাদি ইত্যাদি স্মরণীয়।

১৩। *অতিশয়োক্তি*

উপমার চরম পরিণতি অতিশয়োক্তিতে। সাধারণ ধর্ম্মের ভিত্তিতে দুই বিজাতীয় বস্তুর সজাতীয় হ'য়ে ওঠা উপমাজাতীয় সকল অলঙ্কারেরই সাধারণ লক্ষণ। সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কার উপমায় যাত্রা আরম্ভ ক'রে চলতে থাকে অতিশয়োক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে—ওইখানেই তার যাত্রাসিদ্ধি। দুই বিজাতীয় বস্তুর সজাতীয়তাসাধনের অর্থ বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্যের প্রতিষ্ঠা। এই সাদৃশ্যের নামান্তর সাম্য, সাধর্ম্ম্য, ঔপম্য। সাম্য-প্রতিষ্ঠা করা যায় নানাভাবে—

একপ্রান্তে আংশিক, অন্যপ্রান্তে সম্পূর্ণ, মাঝখানের স্তরগুলি প্রান্তিক বৈশিষ্ট্য-দুটির নানানতর যোগে বিভাগে আলোছায়ায় বিচিত্র। সাম্যপ্রতিষ্ঠার এই প্রকারভেদে অলঙ্কারের নামভেদ। জাতিতে এক হ'লেও ব্যক্তিরূপে এরা উপমা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহ্নুতি, অতিশয়োক্তি (এবং আরও কত কি)।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি কবিতা থেকে পূর্ণোপমার একটি উদাহরণ নিয়ে তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং প্রয়োজনমতো রূপান্তরিত ক'রে সাম্যপ্রতিষ্ঠার কয়েকটি প্রকারভেদ দেখাতে চেষ্টা করি :

(i) **পূর্ণোপমা**—"দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত।"

—রৌদ্র আর ঝিঁঝিপোকার পাখনা দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। এই বিভিন্নতা বজায় রেখে মাত্র ক্রিয়াগত সাধারণ ধর্ম্ম 'কাঁপিছে'-র ভিত্তিতে বস্তুদুটি যথাক্রমে উপমেয়-উপমানরূপে অভিন্ন হ'য়ে গেছে। আপন স্বাতন্ত্র্য কেউ হারায় নাই, যেহেতু চোখ পড়ছে দুটিরই উপর, এবং সমানভাবে। অভিন্ন অথচ ভিন্ন উপমেয় উপমান—ব্র্যাকেটে ফার্স্ট হওয়া দুটি পরীক্ষার্থীর মতন। এ যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অচিন্ত্য ভেদাভেদের দ্বৈতাদ্বৈত। উপমেয় উপমানে ভেদ এবং অভেদ দুইই তুল্যমূল্য (**"সাধর্ম্যম্** উপমা **ভেদে**"—মম্মট ; "দ্বয়োঃ (ভেদাভেদয়োঃ) তুল্যত্বম্"—রুয্যক)।

(i) **ব্যতিরেক**—'দূরে বালুচরে রোদ কাঁপে থর' থর',
ঝিঁঝির পাখার চেয়ে সে তীব্রতর।'

—উপমান ঝিঁঝির পাখা কম্পনধর্ম্মে হার মেনেছে উপমেয় রৌদ্রের কাছে। রয়েছে দুটিই ; কিন্তু দৃষ্টিটা বেশী ক'রে আকর্ষণ করছে 'রোদ'। কম্পনধর্ম্ম দুপক্ষে থাকা সত্ত্বেও তার তারতম্য ঘটায় উপমেয় উৎকৃষ্ট, উপমান নিকৃষ্ট হ'য়ে ভেদটাকেই বড়ো ক'রে তুলেছে। ব্যতিরেক ভেদপ্রধান অলঙ্কার।

(iii) **রূপক**—'দূরে বালুচরে কাঁপে থর'থরে **রৌদ্র-ঝিল্লীপাখা**।'

—আগে বলেছি যে কম্পন-ক্রিয়াটি উপমেয় উপমানের সাধারণ ধর্ম্ম। আলোচ্যমান রূপটিতে 'কাঁপে' আকারে সে বর্ত্তমান রয়েছে। এই কারণে 'রৌদ্র-ঝিল্লীপাখা'-কে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস বললে ভুল হবে—এ সমাসে সাধারণ ধর্ম্মের ('সামান্যে'র) প্রয়োগ নিষিদ্ধ ("উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে"—পাণিনি)। **সমাস এখানে রূপক কর্ম্মধারয়, যাতে সাধারণ ধর্ম্ম হয় উপমানের অনুগত—'কাঁপে' রৌদ্র নয়, ঝিল্লীপাখা।** এই কথাটি মূল্যবান্। রৌদ্রের উপর ঝিল্লীপাখা অভেদে আরোপিত হওয়ায় উপমেয় রৌদ্র নিষ্ক্রিয়, উপমান ঝিল্লীপাখা সক্রিয়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় হ'লেও

রৌদ্রের অস্তিত্ব-লোপ ঘটে নাই, ঝিল্লীপাখার আড়ালে তাকে দেখা যাচ্ছে। অভেদ তাই পরিপূর্ণ হ'তে পারে নাই। এই কারণেই বলা হয় **রূপক অভেদ-প্রধান অলঙ্কার, অভেদ-সর্ব্বস্ব নয়।**

(iv) **অপহ্নুতি**—'দূরে বালুচরে রৌদ্র নয় সে, কাঁপিছে ঝিঁঝির পাখা।'

—উপমেয় রৌদ্রকে অস্বীকার ক'রে একেবারে নেপথ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং মঞ্চে উজ্জ্বলভাবে দাঁড় করানো হয়েছে উপমান ঝিঁঝির পাখাকে। এখানেও রূপকের মতন অভেদ-আরোপ ; পার্থক্য শুধু এই যে ভেদটাকে অসম্ভব ক'রে তোলা হয়েছে উপমেয়কে অস্বীকারের দ্বারা, যা রূপকে হয় না। এই কারণে অভেদের মাত্রাটা রূপকের চেয়ে বেশী। কিন্তু অস্বীকৃত বস্তুর নামোল্লেখের মধ্যেই কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি প্রচ্ছন্ন থাকে ; বস্তুটি গৌণ হ'য়ে যায়, মিথ্যা হয় না।

অভেদ সম্পূর্ণ হয় তখনই, যখন উপমান উপমেয়কে গ্রাস ক'রে নিঃশেষে আত্মসাৎ ক'রে ফেলে। এই গ্রাসের আলঙ্কারিক নাম 'নিগরণ'। এ কাজ সুসিদ্ধ করে—

(v) **অতিশয়োক্তি**—'বোশেখী দুপুরে দূরে বালুচরে কাঁপিছে ঝিঁঝির পাখা।'

—অভেদ সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে উপমান ঝিঁঝির পাখা উপমেয়কে উদরসাৎ ক'রে স্বয়ং একমেব অদ্বিতীয়ম্ হ'য়ে ওঠায়।

পূর্ণোপমার স্বাভাবিক চরম বিবর্ত্ত রূপ অতিশয়োক্তি, প্রথমেই এই কথা ব'লে বর্ত্তমান আলোচনা আরম্ভ করেছি। এখন তা প্রতিপন্ন হ'য়ে গেল। দেখলাম, যে-অভেদ উপমায় ছিল আংশিক, অতিশয়োক্তিতে সে হ'ল পূর্ণ।

একটা প্রশ্ন এখানে অনিবার্য্যভাবে জেগে ওঠে :

সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারে বড়ো কে? উপমেয়? না, উপমান? রূপক অপহ্নুতি ইত্যাদিতে প্রাধান্য লাভ করতে করতে এসে উপমান অতিশয়োক্তিতে হ'য়ে উঠল উপমেয়-গ্রাসী। তবে কি উপমানের আসন উপমেয়ের উর্দ্ধে? উপমেয় 'প্রকৃত'—কবির মূল বর্ণনীয় বিষয়, অপরিহার্য্য। উপমান 'অপ্রকৃত', শুধু অলঙ্করণেই তার প্রয়োজনীয়তা, অন্যথায় সে অনাবশ্যক। উপমেয় মুখ্য, উপমান গৌণ। গৌণ এসে মুখ্যকে গ্রাস করবে, অপ্রকৃত করবে প্রকৃতের উচ্ছেদ, কবির অভীপ্সা এই নাকি?

আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু **বড়ো উপমেয়,** উপমান নয়। উপমান উপমেয়কে যতই আপন বর্ণানুরঞ্জনে স্ব-রূপে রূপায়িত করুক, তাকে

অপহ্নব ক'রে পিছনে ঠেলে দিয়ে স্বয়ং সামনে এসে দাঁড়াক, অথবা তাকে নিঃশেষে গ্রাস ক'রে নিজে নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করুক, তবু উপমেয়েরই আজ্ঞাবহ উপমান; যতই নিজস্ব মহিমা এই উপমানের থাকুক না কেন, এ হ'ল প্রবরনৃপ এবং এর সিদ্ধি হ'ল আপন মুকুটমণির মরীচিচয়ে সার্ব্বভৌম উপমেয়ের চরণ চর্চ্চিত করায়। উপমানের স্থান উপমেয়ের পদতলে, "লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন"।

উপমানের চরম মহিমা অতিশয়োক্তিতে—উপমেয়ের এখানে সর্ব্বগ্রাস। কিন্তু 'গ্রাস' মানে উপমেয়ের অস্তিত্বলোপ নয়, তাকে অপ্রকাশ রেখে ব্যঞ্জনায় তারই স্ফুটতর প্রকাশসাধন। রৌদ্রের নামগন্ধ না ক'রে ঝিঁঝির পাখাকে যতই কাঁপাই না কেন, দ্রুতকম্পিত স্বচ্ছপাখায় বোশেখী দুপুরে বালুচরে মরীচিকার আশ্চর্য্যসুন্দর স্বপ্নমোহময় ঝিলিমিলিই দেখতে পাই মানসনয়নে। সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারমাত্রেই উপমেয়েরই প্রাধান্য। **সৌন্দর্য্যের দিক্ থেকে উপমেয়ের অনন্ত সম্ভাবনা। চোখকে** ধরা যাক **উদাহরণ**স্বরূপে। চোখের গড়ন, বিস্তার, সাদা অংশ, কালো তারা, পাতা, তার প্রান্তের রোম, ভুরু, টানা চোখ, ভাসা-ভাসা চোখ, ফালা চোখ, সোজা বাঁকা আধবাঁকা চাহনি, তারাকে একেবারে কোণায় ঠেলে দেওয়া চাহনি, তার ওপর প্রসন্ন বিষণ্ণ, স্থির, চঞ্চল, হাসিমাখা, জলভরা, স্নিগ্ধ, জ্বালাময় শান্ত ক্লান্ত রুষ্ট তুষ্ট পলে পলে নূতন ভঙ্গীর চাহনি—এই তো চোখের সামান্য একটু পরিচয়। এমন উপমান স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে কোথাও নাই যা চোখের পাশে এসে দাঁড়াবে সর্ব্বাংশে তার সমধর্ম্মা হ'য়ে। চোখ তার আপন মহিমার এক একটি অণুকণাকে উজ্জ্বল ক'রে দেখাবার জন্য ডাকবে সম্ভবকে, যাকেই সে যোগ্য ব'লে ভাববে—পদ্মের পাপড়ি, হরিণ, খঞ্জন, তোমরা, আগুন, বর্শা, আলো, অন্ধকার, কেসর, বিদ্যুৎ, চাঁদের কিরণ, কেউটে সাপ, ধনুক, অমৃত, বিষ, ছুরি, বাণ, লতা, অরুণ, কামান ("কামিনীর কমনীয় কটাক্ষের পর আর বড় **কামানের** প্রয়োজন নাই"—বঙ্কিমচন্দ্র), জবা, পটোল ইত্যাদি। এত সব উপমান এসেও যার অন্ত পায় না, সেই উপমেয়ের চেয়ে উপমান বড়ো হ'য়ে যাবে একি সম্ভব? 'উপমেয় যেখানে উপমানের চেয়ে নিকৃষ্ট হ'য়ে যায়, সেখানেও হয় **ব্যতিরেক** অলঙ্কার', বলেছেন রুদ্রট। মম্মটভট্ট বলছেন, কি অসঙ্গত কথা! 'ব্যতিরেক' মানে আধিক্য (প্রাধান্য, উৎকর্ষ) এবং এ আধিক্য উপমেয়ের [("উপমেয়স্য ব্যতিরেকঃ আধিক্যম্।...উপমানস্য উপমেয়াৎ আধিক্যম্ ইতি কেনচিৎ যৎ উক্তম্, তৎ অযুক্তম্")। গোবিন্দঠাকুর তাঁর কাব্যপ্রদীপে বলছেন, উপমানের উৎকর্ষে ব্যতিরেক হয় এই যে কথাটা

এ একেবারে অন্তঃসারশূন্য ("উপমানস্য উৎকর্ষে ব্যতিরেকঃ ইতি রিক্তং বচঃ")]।

এইবার ফিরে আসা যাক অতিশয়োক্তিতে। তুলনাত্মক অলঙ্কারাবলীর পূর্ব্বপ্রান্তে উপমা, মাঝখানে রূপক, উত্তরপ্রান্তে অতিশয়োক্তি। রূপকের মতো আরোপের প্রশ্ন অতিশয়োক্তিতেও আছে; রূপকে শুধু আরোপ, এখানে আলঙ্কারিক ভাষায় **'উৎকট আরোপ'** (মহেশচন্দ্র)। 'উৎকট' মানে বিদ্‌ঘুটে নয়, সুনিশ্চিত।

আরোপের প্রশ্ন থাকায় উপমাশ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় অলঙ্কার অতিশয়োক্তির নাম রূপক-অতিশয়োক্তি। এইটিই সত্যকার অতিশয়োক্তি।

এ ছাড়া, অন্যরকমের অতিশয়োক্তিও আছে। রূপকাতিশয়োক্তির কথা শেষ ক'রে, তাদের কথা বলব। রূপকাতিশয়োক্তির সঙ্গে গুরুতর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অতিশয়োক্তি নামে তাদেরও অভিহিত করা হয় কেন, সে কথা ব'লে তবে তাদের বিশদ পরিচয় দেব।

(ক) রূপকাতিশয়োক্তি

বিষয়ীর সিদ্ধ অধ্যবসায়ের নাম **রূপকাতিশয়োক্তি**।

এখানে 'বিষয়ী' উপমান, কাজেই 'বিষয়' উপমেয়। **অধ্যবসায়** কথাটার মানে বিষয় অর্থাৎ উপমেয়কে গ্রাস ('নিগরণ') ক'রে বিষয়ী অর্থাৎ উপমানকর্ত্তৃক উপমেয়ের সঙ্গে অভেদপ্রতিপাদন। অন্যভাষায়, বিষয়নিগরণের দ্বারা অভেদ-প্রতিপত্তির নাম বিষয়ীর অধ্যবসায়। এই **গ্রাস সুনিশ্চিত** হ'তে পারে, আবার **অনিশ্চিত অথচ নিশ্চিতের কাছাকাছি** হ'তে পারে। উপমেয়ের সুনিশ্চিত গ্রাস মানে উপমেয়ের অনুপস্থিতি অর্থাৎ ভাষায় অপ্রকাশ; থাকে শুদ্ধ উপমান। উপমেয় নাই, একা উপমান রয়েছে—এর থেকে কল্পনা করা হয় উপমান উপমেয়কে করেছে উদরসাৎ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গ্রাস বা নিগরণ কথাটার অর্থ লাক্ষণিক। উপমানকর্ত্তৃক উপমেয়ের গ্রাস যখন অনিশ্চিত অথচ নিশ্চিতের কাছাকাছি, তখন একটি **'যেন'**-র ভাব থাকে। 'যেন'-র ভাব মানে প্রবল সংশয়ের দ্যোতনা। এ সংশয় উপমান-কোটিক অর্থাৎ উপমান-পক্ষপাতী। সহজ কথায়, মনের ঝোঁক প্রায় চৌদ্দ আনা রকম পড়ে উপমানের দিকে; কিন্তু বাকী দু আনার সুযোগ নিয়ে উপমেয়টিও থেকে যায়। **অভেদ-প্রতিপাদনে বিষয়ীর (উপমানের) দ্বারা বিষয়ের (উপমেয়ের) পূর্ণ-গ্রাসরূপ**

যে অধ্যবসায়, তার নাম সিদ্ধ অধ্যবসায় এবং প্রায়নিশ্চিত গ্রাসরূপ যে অধ্যবসায়, তার নাম সাধ্য অধ্যবসায়। অধ্যবসায় **সিদ্ধ** অতিশয়োক্তিতে, **সাধ্য** উৎপ্রেক্ষায়। অতিশয়োক্তিতে বিষয়ীর জয় আত্মশক্তিতে, আর উৎপ্রেক্ষায় 'benefit of doubt'-এ। অতিশয়োক্তিতে উপমান সত্য, উৎপ্রেক্ষায় সত্যবৎ ; প্রথমটিতে উপমানের দীপ্তি শুভ্র, দ্বিতীয়টিতে একটু পাণ্ডুর।

দুটি সহজ উদাহরণে রূপকাতিশয়োক্তি এবং উৎপ্রেক্ষার পার্থক্যটুকু দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। তুলনার সুবিধার জন্য প্রথম উদাহরণটিকে ভেঙে দ্বিতীয়টি গ'ড়ে নিয়েছি।

(i) "তমালপাশে কনকলতা হেরে নয়ন জুড়ালো রে।
নবীননীরধর বামে দামিনী হেসে দাঁড়ালো রে ॥"

—গোবিন্দ অধিকারী।

—রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বর্ণনা করছেন পদকর্তা। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ কই ? এ তো কনকলতা-তমাল আর দামিনী-নবীননীরধর। ওই তমাল-নীরদের মাঝে কৃষ্ণ আর কনকলতা-দামিনীর মাঝে রাধা নিলীন হ'য়ে গেছেন। বর্ণসাদৃশ্যে শ্যাম শ্যামতমালের এবং শ্যামনীরদের কুক্ষিগত হ'য়ে গেছেন আর তপ্তকাঞ্চনবর্ণা রাধাকে উদরসাৎ করেছে কনকলতা এবং দামিনী। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ আর মূর্তিমতী হ্লাদিনীর এই অবস্থা। তবু কবির ভাষায় বলতে হয়— "হেরে নয়ন জুড়ালো রে"! কিন্তু রসের গোলোক থেকে অবতরণ করতে হচ্ছে অ-রসের গো-লোকে—উপমেয় রাধা এবং কৃষ্ণ যথাক্রমিক উপমান কনকলতা-দামিনীর এবং তমাল-নীরধরের দ্বারা নিঃসংশয়ে নিগীর্ণ (গ্রস্ত) হওয়ায় উপমানগুলির **অভেদ-অধ্যবসায়** হয়েছে **সিদ্ধ**। অতএব অলঙ্কার **রূপকাতিশয়োক্তি।**

এই উদাহরণের উৎপ্রেক্ষারূপ :

'শ্যামের বামে রাইকিশোরী হেরে নয়ন জুড়াল রে।
যেন নবীননীরদবামে দামিনী হেসে দাঁড়াল রে ॥'—শ. চ.

—এখানে,

উপমা অলঙ্কারের মতন কোনো সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে শ্যাম-কিশোরীর নবনীরদ-দামিনীর সঙ্গে তুলনা **সম্ভব হয় নাই**, '**যেন**' সে পথের **বাধা** ;

রূপক অলঙ্কারের মতন নবনীরদ-দামিনীর ধর্ম শ্যাম-কিশোরীর উপর আরোপ করা **সম্ভব হয় নাই**, পথের কাঁটা '**যেন**' ;

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মতন নবনীরদ-দামিনীর দ্বারা শ্যাম-কিশোরীকে নিশ্চিতরূপে গ্রাস করিয়ে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নাই, পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে '**যেন**'।

কি হচ্ছে তাহ'লে? '**যেন**' প্রবলভাবে মনকে টানছে উপমান নবনীরদ-দামিনীর দিকে; বলছে, 'ওই উপমানই সত্য, শ্যাম কিশোরী সত্য নয়'। বুঝছি যে 'যেন'-র কথাটা মায়া, তবু চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না নবনীরদ-দামিনীর দিক্ থেকে। এই যে প্রায়-সর্ব্বগ্রাস, এর নাম **সাধ্য** অধ্যবসায়। প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষায় গ্রাসের মাত্রা আরও একটু বেশী।

(ii) "**কণ্টক**মাহ **কুসুম** পরকাশ।
ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ত বাস॥"—বিদ্যাপতি।
'কাঁটার মাঝে ফুলের পরকাশ।
ভোমরা বিকল পায় না সেথায় বাস॥' —শ. চ.

—কণ্টক, কুসুম, ভ্রমর এই উপমান তিনটি; কিন্তু এদের যথাক্রমিক উপমেয় জাতিকুল, রাধা, কৃষ্ণ নাই—উপমানগুলি এদের সম্পূর্ণরূপে গ্রাস ক'রে এদের সঙ্গে নিজেদের নিশ্চিত অভেদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

(iii) "**যমুনার সুবাসিত জলে**
ডুবি থাকে **কালফণী** দুরন্ত দংশক!
সুখে থাকে বিশ্ববাসী।" —মধুসূদন।

—উপমান "যমুনার সুবাসিত জলে" এবং "কালফণী"; এদের দ্বারা গ্রস্ত যথাক্রমিক উপমেয় 'প্রমীলার পবিত্রমধুর অতল প্রেম' এবং ইন্দ্রজিৎ।

(iv) "**গলিত-রজতধারা** ফেনায়ে ফেনায়ে ছুটে চলে,
সহস্র **হীরকচূর্ণ** ঝলসিয়া ওঠে পলে পলে"—রাধারানী।

—'গলিত-রজতধারা': জ্যোৎস্নায় শুভ্র তটিনী; 'হীরক-চূর্ণ': কৌমুদীদীপ্ত শীকরনিকর, জলকণা।

(v) "ধনুর্দ্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত।"—রবীন্দ্রনাথ।

ব্যাধ উপমান (বিষয়ী)। উপমেয় (বিষয়) অর্জ্জুন অনুল্লিখিত। চিত্রাঙ্গদার উক্তি। 'আমার'=চিত্রাঙ্গদার।

(vi) "বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি,
ত্যজিয়া **যুগলস্বর্গ** কঠিন পাষাণে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—যুগলস্বর্গ উপমান; উপমেয় স্তনযুগল অনুল্লিখিত।

(vii) "**সাগরে** যে **অগ্নি** থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।"—সত্যেন্দ্রনাথ।

—উপমান সাগর এবং অগ্নি ; উপমেয় ঈশ্বরচন্দ্র এবং মনের তেজ। [যদি কেউ মনে করেন যে সাগর বিদ্যাসাগরের সাগর, কাজেই শ্লেষ, তাহ'লে একে শ্লেষগর্ভ অতিশয়োক্তি ব'লে ধরতে হবে।]

(viii) "মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী **শ্যামা**
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা।"—রবীন্দ্রনাথ।

শ্যামা=রণরঙ্গিণী কালী। উপমেয় কালবৈশাখী অনুক্ত।

(ix) "জানে না সে কিসের কারণ
নারীর অধরে হায় পান করে **কালকূট** মানে না বারণ।"
—মোহিতলাল।

—উপমেয় চুম্বনরস অনুক্ত।

(x) "দক্ষিণাগত **দেহহীন দূত** ঘরে ঘরে বাতায়নে—
এসেছে সে আজ, এসেছে সে আজ, জানাইল জনে জনে।"
—যতীন্দ্রমোহন।

উপমেয় মলয়সমীরণ (বসন্তানিল) অনুল্লিখিত। 'সে'=বসন্তকাল।

(xi) "আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি, ঝুলিছে সর্ব্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি,—
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক শাদা।"—যতীন্দ্রনাথ।

—'সর্ব্বনাশী'=কেয়াফুল (ঘরে টাঙিয়ে রাখা) ; 'নীলাম্বরী'=পর্ণপুট ; 'অলকগুচ্ছ'=পরাগকেসর।

(xii) "ষোলটি বছরে জমানো অশ্রু
জমাট পাথরে হতেছে গাঁথা,
প্রেয়সীর শেষ-শয়ন বিছা'তে
মাটিতে বেহেশ্‌ত্‌ তুলেছে মাথা।"—মোহিতলাল।
—তাজমহল। 'বেহেশ্‌ত্‌'=স্বর্গ।

সাদৃশ্যাত্মক অলঙ্কারাবলীর শীর্ষস্থানীয় পূর্ণ উপমেয়গ্রাসের রূপকাতিশয়োক্তি এইখানে শেষ করলাম। এই **রূপকাতিশয়োক্তি** নামকরণটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর **পীযূষবর্ষ জয়দেবের** ; তাঁর 'চন্দ্রালোক' থেকে এই নামটি নিয়েছি।

তিনি বলেছেন **রূপ্য যদি রূপকের মধ্যগত হয় তাহ'লে হয় রূপকাতিশয়োক্তি** ("রূপকাতিশয়োক্তিশ্চেৎ রূপ্যং রূপকমধ্যগম্")। অতিসুন্দর এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাটি। **'রূপকের মধ্যগত রূপ্য'** কথাটার মানে **উপমেয় বা বিষয়ের ('রূপ্য') উপমান বা বিষয়ীর ('রূপকে'র) কুক্ষিগত হ'য়ে যাওয়া।**

অতিশয়োক্তির প্রকারভেদ পাঁচটি: (ক) **ভেদে অভেদ**; (খ) **অভেদে ভেদ**; (গ) **সম্বন্ধে অসম্বন্ধ**; (ঘ) **অসম্বন্ধে সম্বন্ধ**; (ঙ) **কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়।**

এদের মধ্যে, **রূপকাতিশয়োক্তিতে 'ভেদে অভেদ'** ব'লে এইটিকে (ক)-চিহ্নিত করেছি। এইটিই একমাত্র সাদৃশ্যাত্মক অতিশয়োক্তি; ইংরিজিতে Metaphor-এরই রূপবিশেষ ব'লে এটিকে স্বীকার করা হয়।

বাকী চারটিতে সাদৃশ্যলক্ষণ নাই। যদি কোথাও দেখা যায়, অতিশয়োক্তির কারণ সেখানে সাদৃশ্য নয়, অন্য কিছু।

'অতিশয়োক্তি' নামটি প্রথম পাই ষষ্ঠ শতাব্দীর আলঙ্কারিক আচার্য্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন, বস্তুবিশেষ-সম্পর্কে কবির অভীষ্ট উক্তিটি যদি লৌকিক দৃষ্টিসীমা অতিক্রম ক'রে অলৌকিক মহিমা লাভ করে ("লোকসীমাতি-বর্ত্তিনী"), তাহ'লে উক্তিটি হয় অতিশয়োক্তি। এটি "অলঙ্কারোত্তমা"। শুধু তাই নয়, অতিশয়োক্তি অন্যান্য সকল অলঙ্কারের একমাত্র পরমাশ্রয় ("অলঙ্কারান্তরাণাম্ অপি একং পরায়ণম্") এবং **'অতিশয়'**-নাম্নী এই উক্তি বাচস্পতিরও পূজিতা ("বাগীশমহিতাম্ উক্তিম্ ইমাম্ **অতিশয়া**হ্বয়াম্")। (দণ্ডীর শ্লোক সন্ধি ভেঙে দেখালাম।)

"লোকসীমাতিবর্ত্তিনী" মানে এমন সূক্ষ্মসুন্দর উচ্চাঙ্গের কল্পনা, যা সাধারণ লোকের প্রতীতির বাইরে, অতএব বিদগ্ধজনের চিত্তচমৎকারী। অতিশয়োক্তি = **অতিশয়** + উক্তি এবং **অতিশয়** = লোকসীমাতীত, অলৌকিক।

সপ্তম শতাব্দীর ভামহ দণ্ডীর উক্তিরই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন,— অতিশয়োক্তি হ'ল "বচো লোকাতিক্রান্তগোচরম্", "কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা?" (লোকাতিক্রান্তপ্রতীতিময়ী উক্তি অতিশয়োক্তি, অতিশয়োক্তি ছাড়া অলঙ্কারই হয় না)।

'অতিশয়'-ব্যাখ্যা:

'অতিশয়' কথাটির সম্বন্ধে ধ্বন্যালোকব্যাখ্যায় আচার্য্য অভিনবগুপ্ত

বলেছেন, 'লোকোত্তীর্ণ রূপে অবস্থান, এইটিই হ'ল অলঙ্কারের (অতিশয়োক্তির) অলঙ্কারত্ব; **লোকোত্তরতাই হচ্ছে 'অতিশয়'**, তাই অতিশয়োক্তি...' ("লোকোত্তীর্ণেন রূপেণ অবস্থানম্ ইতি অয়ম্ এব অসৌ অলঙ্কারস্য অলঙ্কারভাবঃ; **লোকোত্তরতা এব চ অতিশয়ঃ, তেন অতিশয়োক্তিঃ**..." —ধ্বন্যালোক, ৩।৩৬)।

এই যখন 'অতিশয়', তখন শুধু সাদৃশ্যের সীমায় বন্দী হ'য়ে থাকা তার পক্ষে তো সম্ভব নয়; স্বভাবতঃই সে বেরিয়ে চ'লে যাবে এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন ক্ষেত্রে রচনা করবে তার বিহারভূমি। এই কথাই বলেছেন মহেশচন্দ্র কাব্যপ্রকাশের 'তাৎপর্য্য-বিবরণী'তে—"অতিশয়ঃ অতিশয়িতা প্রসিদ্ধিম্ অতিক্রান্তা লোকাতীতা উক্তিঃ অতিশয়োক্তিঃ; সা চ এতেষু পরস্পরম্ **অত্যন্তবিলক্ষণেষু** অপি **চতুর্ষু** প্রভেদেষু অস্তি ইতি এতেষাং প্রভেদানাম্ অতিশয়োক্তিঃ ইতি সাধারণং নাম")। এর অনুবাদ অনাবশ্যক, কারণ ভাষা সরল। **চারটির** জায়গায় আমি **পাঁচটি** প্রকারভেদের উল্লেখ করেছি রুয্যকের মতে।

অতিশয়-ব্যাখ্যা এখনো শেষ করি নাই। এইবার শোনাচ্ছি সম্পূর্ণ অভিনব একটা কথা। 'পণ্ডিতরাজ' কবি জগন্নাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে অতিশয়োক্তির সংজ্ঞায় বলছেন, **'বিষয়ীর দ্বারা বিষয়ের নিগরণের (গ্রাসের) নাম অতিশয়,** তার উক্তি—অতিশয়োক্তি' ("বিষয়িণা বিষয়স্য নিগরণম্ অতিশয়ঃ, তস্য উক্তিঃ")। দেখা যাচ্ছে যে 'অতিশয়' মানে নিগরণ বা গ্রাস। **অন্যান্য অলঙ্কারিক যাকে বলেছেন বিষয়ীর অধ্যবসায়, জগন্নাথ তাকেই বলেছেন বিষয়ীর অতিশয়।** পণ্ডিতরাজের কথাটার তাৎপর্য্য এই যে **বিষয়ীর** যেখানে আতিশয্য (poetic exaggeration), সেইখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। এই আতিশয্য যেখানে অত্যন্ত উৎকট (প্রবল), সেইখানে 'নিগরণ' মানে নিঃশেষে গিলে ফেলা অর্থাৎ বিষয়কে বিষয়ীর ত্রিসীমানায় আসতে না দেওয়া। এ অবস্থা ঘটে একমাত্র রূপকাতি-শয়োক্তিতে। **শুধু** এই **রূপকাতিশয়োক্তিতেই বিষয় বিষয়ী যথাক্রমে উপমেয় উপমান। অন্য রকমের অতিশয়োক্তিগুলিতে উপমেয়-উপমানের প্রশ্নই নাই; সেখানে বিষয়-বিষয়ী শুধু 'প্রকৃত-অপ্রকৃত'। বিষয় বিষয়ী দুইই সেখানে থাকে; 'বিষয়' থাকে গৌণ কাজেই মোন হ'য়ে আর 'বিষয়ী' থাকে আতিশয্যের সৌন্দর্য্যময় ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত হ'য়ে।** সেখানে পণ্ডিতরাজের 'নিগরণ' মানে বিষয়ের গৌণতা; 'বিষয়'

আলঙ্কারিক ভাষায় সেখানে বিষয়ীর দ্বারা 'অধঃকৃত' অর্থাৎ বিষয়ীর কাছে সে ম্লানমুখে অবস্থিত। 'সিদ্ধ অধ্যবসায়' রূপকাতিশয়োক্তির সঙ্গেই শেষ হ'য়ে গেছে ; আলোচ্য প্রকারভেদগুলিতে সে অবান্তর।

(খ) 'অভেদে ভেদ' অতিশয়োক্তি

একই বস্তুকে ভিন্ন ব'লে কল্পনার নাম 'অভেদে ভেদ'।

(i) "এই আমি আর নই গো আমার সেই আমি,
মালা-গাঁথায় আনমনে যায় দিনযামী"—করুণানিধান।

—'আমি' একটি, তবু দুই ব'লে তাকে কল্পনা করা হয়েছে। এ কল্পনার মূলে রয়েছে যৌবনাগমে উদ্বুদ্ধ নবচেতনা। কবি আগে বলেছেন,

"দখিন হাওয়ায় বুকের মাঝে জাগ্‌ল বসন্ত,
চিনিয়ে দিলে পাগলা ফাগুন অচেনা পন্থ।"

রবীন্দ্রনাথের 'যখন পড়বে না মোর চরণচিহ্ন এই বাটে'-র 'নেই আমি', 'এই আমি', 'সেই আমি' আমাদেব উদাহরণের বিপরীত—সেখানে 'চির-আমি'-র কথা।

(ii) 'দেবতার বরসম কভু লভি কৃচ্ছ্রসাধনায়,
দৈবে-পাওয়া বস্তু হেন লভি কভু বিনা তপস্যায়,
নিষ্ঠুর দস্যুর মতো সবলে লুণ্ঠন করি কভু
প্রেয়সীর বিম্বাধর—এক কিন্তু এক নয তবু।'—শ. চ.

('অলঙ্কাবসর্ব্বস্ব'-উদ্ধৃত একটি প্রাকৃত কবিতাব মুক্তানুবাদ)—একই বিম্বাধরে আস্বাদবিভিন্নতায় ভেদকল্পনা।

(গ) 'সম্বন্ধে অসম্বন্ধ' অতিশয়োক্তি

'সম্বন্ধে অসম্বন্ধ' কল্পনায় চিরসম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ অস্বীকার করা হয।

(i) 'রূপরসগানগন্ধপরশের এ নৈবেদ্যখানি
তুমি রচিয়াছ, ব্রহ্মা? হায়, বৃদ্ধ, কেমনে তা মানি?—
স্থবির, পলিতকেশ, লোলচর্ম্ম, গলিতদশন
পিতামহ তুমি, জড়, ক্ষীণেন্দ্রিয়, ব্যাবৃত্তব্যসন—
তুমি রচিয়াছ এই চরাচব আনন্দসুন্দর?
মিথ্যা কথা। আমি জানি স্রষ্টা এর রতিপঞ্চশর।'—শ. চ.

(কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকেব একটি কবিতার ছায়ায় রচিত)

—পুরাণমতে ব্রহ্মা বিশ্বস্রষ্টা, সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর নিত্যসম্বন্ধ। কবি এ সম্বন্ধ অস্বীকার করেছেন।

এই শ্রেণীর অতিশয়োক্তির উদাহরণ বাঙলায় নাই বললেই চলে।

(ঘ) 'অসম্বন্ধে সম্বন্ধ' অতিশয়োক্তি

'অসম্বন্ধে সম্বন্ধ' বলতে বোঝায় যার সঙ্গে যার স্বাভাবিক সম্বন্ধ **নাই**, তাদের মধ্যে **অসম্ভব** সম্বন্ধের কল্পনা ("কল্পনম্ অসম্ভবিনঃ অর্থস্য"—কাব্যপ্রকাশ)।

এই লক্ষণের অতিশয়োক্তিতে বৈচিত্র্য বেশী। এরই বেশী উদারণ পাওয়া যায় আমাদের বাঙলা সাহিত্যে। **অসম্ভবের সম্ভাবনাকল্পনাই** এই অলঙ্কার সৃষ্টির প্রেরণা।

নানাভাবে এই অসম্ভব সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়। যেমন,

(এক) 'যদি'-প্রয়োগে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ

'সম্বন্ধ হয় না জানি; কিন্তু **যদি** হ'ত বা হয়, তাহ'লে…' এই হচ্ছে ভাবখানা।

(i) 'কুন্দ সে যদি ফুটে নবপল্লবে,
বিদ্রুমবুকে মৌক্তিক সম্ভবে,
ওদের সঙ্গে উপমিত হয় তবে
উমার অরুণ-অধরে শুভ্র হাসি।' —শ. চ.
('কুমারসম্ভব' হ'তে)

—দ্বিতীয় চরণে 'যদি' উহ্য। অরুণ-অধর আর নবপল্লব-বিদ্রুম উপমেয় উপমান এবং শুভ্রহাসি আর কুন্দ-মৌক্তিক উপমেয় উপমান। কিন্তু এই সাদৃশ্যটাই অতিশয়োক্তির নিয়ন্তা নয়; নিয়ন্তা কচিকিসলয়ে কুন্দ ফোটানো আর প্রবালের বুকে মুক্তা জাগানো এই অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপ অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তোলার কল্পনা। আচার্য্য দণ্ডীর মতে এখানে **অদ্ভুতোপমা**।

পীযূষবর্ষ জয়দেব এর নাম দিয়েছেন **সম্ভাবনা** (অতিশয়োক্তি)। তাঁর রচিত উদাহরণটিতে অসম্ভবের চরম খেলা। সেটির মুক্ত অনুবাদ :

(ii) 'স্ফটিক কলস যদি পূর্ণ করি' নির্ম্মল সলিলে,
মৌক্তিক বপন করি তায়,
সেই মুক্তা অঙ্কুরিয়া অপূর্ব্ব লতায়

ফুটাইয়া তুলে যদি শুভ্র পুষ্প, তবে, প্রভু, মিলে
তোমার যশের উপমান।' —শ. চ.

(iii) "যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুলি।
অমিয়ার ছাঁচে যদি গড়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান
তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥"—বলরামদাস।

—রাধার লোকাতিক্রান্ত রূপমাধুর্য্যের বর্ণনা করছেন বিভোব কৃষ্ণ। নয়নে তাঁর প্রেমাঞ্জন। সেই নয়নের দৃষ্টির সৃষ্টি এই রাধা; তাই এত কাণ্ড ক'রেও শেষে "তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান" বলাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এই চরণটিতে উপমান-প্রত্যাখ্যানরূপ **'প্রতীপ'** অলঙ্কারের দ্যোতনা রয়েছে। এ শুধু 'অতিশয়' নয় 'নিরতিশয়' অর্থাৎ যার চেয়ে অতিশয় (অলৌকিকতা) আর হয় না (নিঃ নাস্তি অতিশয়ো যস্মাৎ)। "অসমোর্দ্ধপ্রেমামৃতসমুদ্রসংমগ্নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীমত্যাঃ নিরতিশয়রূপমাধুরীং তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি ইত্যাদিনা বর্ণয়তি", বলছেন রাধামোহন ঠাকুর। 'তুমি মোর নিধি…' ইত্যাদি এই পদখানির প্রথম চরণ। প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি পদখানি রবীন্দ্রনাথের অতীব প্রিয়।

(দুই) সাধারণ অসম্বন্ধে সম্বন্ধ

(iv) "অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা ল'য়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হ'য়ে॥"—ভারতচন্দ্র।

(v) "কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারিপাশে॥"—ভারতচন্দ্র।

—দুটিই অন্নদার মোহিনী-রূপের বর্ণনা। অন্নদার নখে শশাঙ্কের আশ্রয়-গ্রহণ বা পঞ্চম স্বর শিখতে কোকিলের অন্নদাকে গুরু-পদে বরণ অসম্বন্ধে সম্বন্ধ অর্থাৎ অসম্ভাবনীয় সম্বন্ধ-কল্পনা। শশাঙ্ককে অন্নদার দশনখে ফেলে কবি জানিয়ে দিলেন যে যে-চাঁদের চেয়ে লক্ষগুণে ভালো (নিষ্কলঙ্ক) দশ-দশখানা চাঁদ অন্নদার পায়ের নখে প'ড়ে রয়েছে, তার গরব করার কিছুই নাই। মধুরতম পঞ্চম স্বর কোকিলের নিজস্ব সম্পদ্ (পঞ্চম স্বরের 'জাতি' পিক, বর্ণ শ্যাম, রস শৃঙ্গার ইত্যাদি—নারদপুবাণ)। কবি কোকিলকে অন্নদার শিষ্য ক'রে দেখিয়ে দিলেন অন্নদার 'কথা'র (কণ্ঠধ্বনির) কাছে কোকিলের পঞ্চম স্বর কিছুই নয়। অন্নদার নখসৌন্দর্য্য আর কণ্ঠমাধুর্য্যকে অলৌকিক মহিমা দেওয়াই কবির উদ্দেশ্য।

(vi) "লোচন-নীর তটিনী নিরমান।
তহিঁ কমলমুখী করত সিনান।"—বিদ্যাপতি।
'নয়নজলে তটিনী নিরমিয়া
সিনান করে কমলমুখী তায়।'—শ. চ.

—বিরহিণী রাধার বর্ণনা। চোখের জলে নদীর সৃষ্টি এবং তাতে স্নান অসম্ভব কল্পনা; তবু সুন্দর—অশ্রুমুখী রাধার অপূর্ব্ব চিত্রায়ণ।

(vii) "বারেক চাহিনু আকাশের পানে, বারেক ধরণীপানে,
সঘন বরষা ঘনায় আবার ঘন চিকুর হানে।
**একটু জ্যোৎস্না খসিয়াছে শুধু কোন্ সে মেঘের কাঁকে
আমারি ঘরের বালিস-আলিসে, হৃদয়ে ধরিনু তা'কে।"**
—মোহিতলাল।

—শ্রাবণরাতে পাশে ঘুমন্ত কিশোরী বধূর বর্ণনা।

(viii) "সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো,
তাহে শোভে অলকের পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার ভাঁতি॥" —শ্রীনিবাস।

—শ্রীকৃষ্ণের শ্যামকপাল মেঘ, তিলক চাঁদ, অলকের পাঁতি (চূর্ণ কেশের পঙ্‌ক্তি) ভ্রমর। মূল অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষা। কিন্তু মেঘের বুকে চাঁদ থাকে না, চাঁদের পাশে ভোমরা থাকে না—অসম্বন্ধে সম্বন্ধ। অতিশয়োক্তি। রাধামোহন ঠাকুর বলছেন, "মেঘের উপরে ইত্যাদি অদ্ভুতোপমা"। একই কথা (প্রথম উদাহরণ 'কুন্দ সে যদি' ইত্যাদির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। অদ্ভুতোপমা 'যদি' থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। কিন্তু জয়দেবের 'সম্ভাবনা' 'যদি' না থাকলে হয় না।

(ix) "শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা;
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—চিত্রাঙ্গদার উক্তি মদনের প্রতি। নয়নের কোণে ধনুক বাঁকানো অসম্বন্ধে সম্বন্ধ। পুরুষের প্রতি রমণীর কটাক্ষের অমোঘতার দ্যোতনা রয়েছে চোখের কোণে ফুলধনু বাঁকানোর মধ্যে।

(x) "চন্দনবিন্দু পূর্ণিমইন্দু সিন্দূরমিহির **পাশ**"—বলরামদাস।

—ললাটের চন্দনবিন্দু এবং সিন্দূরবিন্দুকে যথাক্রমে তুলনা করা হয়েছে পূর্ণিমার ইন্দু এবং মিহিরের (সূর্য্যের) সঙ্গে। এখানে সাধারণ রূপক মাত্র,

অতিশয়োক্তি নয়। এই সাধারণকে অসাধারণ ক'রে তুলেছে 'পাশ' কথাটি—**চন্দ্র আর সূর্য্যের একই সময়ে একই স্থানে পাশাপাশি অবস্থান অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ; এই কল্পনাতেই অতিশয়োক্তি।**

(xi) "নূতন করিয়া মোরে সৃজন করিতে পারো তুমি—
বিধাতার সৃষ্টিশক্তি আছে তব।" —বুদ্ধদেব।

—'অমিতা'-নাম্নী তরুণীতে বিধাতার সৃষ্টিশক্তির অস্তিত্ব-কল্পনা। লক্ষণীয় যে (গ) বিভাগের উদাহরণটির মতন বিধাতার সৃষ্টিশক্তিকে এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে না। বিধাতার সৃষ্ট 'মোরে' তুমি 'সৃজন' করতে পার 'নূতন' ক'রে, সে শক্তি তোমার আছে; 'নূতন' থাকায় এখানে অবশ্য হ'য়ে গেল 'অভেদে ভেদ' লক্ষণের অতিশয়োক্তি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বলা হ'ল অমিতার শক্তি বিধাতার শক্তি, 'অভেদে ভেদ' কেটে গিয়ে হ'ল অসম্বন্ধে সম্বন্ধকল্পনা।

(xii) "যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥
(xiii) যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥
[দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবনসঞে করতহি খেলি॥]
(xiv) যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দীহিলোল॥
(xv) যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপলবন ভরই॥
(xvi) যাঁহা যাঁহা হেরি এ মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দকুমদ পরকাশ॥"

অনুবাদ ক'রে দিলাম—

(xii) 'তন্বী তনুর লাবণি যেখানে ঝরে,
চমকে সেখানে বিদ্যুৎ চঞ্চল ;
(xiii) অরুণ-চরণ ছন্দে ছন্দে যেথা যেথা সঞ্চরে,
স্খলিত সেথায় স্থলকমলের দল ;—
[দেখ সখি কোন্ ধনি সহচরী সঙ্গে
মোর প্রাণ ল'য়ে খেলিছে কেমন রঙ্গে।]

(xiv) বঙ্কিম ভুরু বিলোলি যেখানে জাগে,
হিল্লোলে সেথা কালিন্দী উচ্ছল ;

(xv) তরল আঁখির অপাঙ্গ দিঠি যেখানে যেখানে লাগে,
জেগে ওঠে সেথা শত নীল উৎপল ;

(xvi) মধুর হাসিটি যেখানে বিলসি ওঠে,
নিরখি সেখানে কুন্দকুমুদ ফোটে।' —শ. চ.

—বলা যেতে পারত যে 'নিকসই তনু তনুজ্যোতি' আর 'বিজুরী চমকময় হোতি' বিম্বপ্রতিবিম্ব এবং 'বিজুরী'র মতন 'তনুজ্যোতি' পরিকল্পিত উপমা, অতএব অলঙ্কার 'নিদর্শনা'। কিন্তু এই দৃষ্টিতে দেখলে এ কাব্যের ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত রহস্যমধুর সৌন্দর্য্যটি অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। **বন্ধনীমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান্**। বিস্মিত কৃষ্ণ সখীকে বলছেন—'দেখ দেখ, **কে এক** সুন্দরী আমার জীবন নিয়ে খেলা করছে। কৃষ্ণ মুগ্ধ, প্রিয়তমা রাধাকে তিনি চিনতে পারছেন না ; এ যেন তাঁর অর্দ্ধবাহ্যদশা। মনে রাখতে হবে যে সমগ্র কবিতাটি কৃষ্ণের উক্তি। তিনি দেখছেন কে এক সুন্দরী আপন রূপলাবণ্যে, ছন্দিতচরণপাতে, ভ্রূভঙ্গে, অপাঙ্গে, হাস্যমাধুর্য্যে স্থল জল আকাশ বিচিত্রভাবে পরিব্যাপ্ত করতে করতে চলেছে। গোবিন্দদাসের সৃষ্ট বিভাব (রাধাগত) এবং অনুভাব (কৃষ্ণগত) এ পদে লোকাতিক্রান্ত।

যদি এ দৃষ্টিতে নাও দেখা হয়, তবু এখানে 'নিদর্শনা' বলা চলে না ; কারণ অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের দ্বারা শুধু উপমাপরিকল্পনই কবির এখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য উপমেয়ের অলৌকিক মহিমাপ্রতিষ্ঠা—উপমাপরিকল্পনায় 'থলকমলের মতন অরুণচরণ' এইটুকু দেখিয়ে স্থলকমল আর অরুণচরণকে সমমূল্য দেওয়া নয় ; একটি ক'রে স্থলকমল খ'সে খ'সে পড়ে যে অরুণচরণের প্রতিটি বিন্যাসে, সেই চরণের লোকোত্তর সৌন্দর্য্য দেখিয়ে দেওয়া। প্রত্যেকটি স্তবককে এই চক্ষে দেখতে হবে। ভুরু বাঁকানোর সঙ্গে কালিন্দীহিল্লোলের কোনো সম্বন্ধ নাই ; তবু সম্বন্ধ কল্পনা করতে হবে, কেননা ভুরু বাঁকিয়ে শূন্যে যদি কালো যমুনার ঢেউ না তুলি, ভুরুর ইন্দ্রজাল দেখাব কেমন ক'রে ?

(xvii) "গগনে একই চাঁদ ইহাই মোরা জানি।
ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি॥"—জ্ঞানদাস।

(xviii) "আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা।" —রবীন্দ্রনাথ।

অন্য একপ্রকার অতিশয়োক্তি :

(i) "কুমার বাসবজয়ী, **দ্বিতীয়** জগতে শক্তিধর" —মধুসূদন।

(ii) "স্থিরতরঙ্গভঙ্গিমাময় **দ্বিতীয়** রত্নাকর" —সত্যেন্দ্রনাথ।

(iii) "কারাগার হ'ল **দ্বিতীয়** স্বর্গ" —যতীন্দ্রমোহন।

"যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব···।" —রবীন্দ্রনাথ।

—বিশ্বনাথের মতে বিষয়ের অপকর্ষ হওয়ায় (ঠিক নিগরণ বা গ্রাস না হ'লেও) এখানে **অতিশয়োক্তি**। অন্যমতে **তাদ্রূপ্যরূপক**।

বাঙলাসাহিত্যের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন ব'লে (ঙ)-চিহ্নিত 'কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়' লক্ষণের অতিশয়োক্তির আলোচনা করলাম না।

১৪। ব্যতিরেক

উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিম্বা নিকৃষ্ট ক'রে দেখালে **ব্যতিরেক অলঙ্কার** হয়।

উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট উপমেয় কি কারণে হ'ল, সেকথা কোথাও বলা থাকে, কোথাও বা থাকে না। এ অলঙ্কারটি ভেদপ্রধান। ব্যতিরেক বোঝা যায় তিন প্রকারে : সাদৃশ্যশব্দের দ্বারা, অর্থে এবং ব্যঞ্জনায়।

(i) 'অকলঙ্ক মুখ তব কলঙ্কী চন্দ্রের মতো নহে।' —শ. চ.

—এখানে মুখ নিষ্কলঙ্ক বলায় সে যে উৎকৃষ্ট এবং কলঙ্কী চাঁদ নিকৃষ্ট এইটুকু দেখানো হয়েছে। অকলঙ্কতা এবং কলঙ্কিত্ব উপমেয় ও উপমানে যথাক্রমে এই কারণদুটি উল্লিখিত রয়েছে। তা ছাড়া উপমাবাচক শব্দ 'মতো' উক্ত হয়েছে।

(ii) "দশন কুন্দকুসুম**নিন্দু** বদন **জিতল** শারদ ইন্দু"—জগদানন্দ।

—দশন কুন্দফুলকে নিন্দা করে, বদন শরচ্চন্দ্রকে জয় করেছে। **উপমেয় দশন বদনের উৎকর্ষ**। কারণের উল্লেখ নাই। অর্থ থেকে ব্যতিরেক বোঝা যাচ্ছে। তুলনাবাচক শব্দ নাই। এইজাতীয় ব্যতিরেক **আক্ষিপ্ত** অর্থাৎ 'নিন্দু' আর 'জিতল' পদদুটির অর্থসামর্থ্যে দ্যোতিত।

(iii) "নবীননবনীনিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ" —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "দেখ আসি সুখে
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ ; পুত্র, যার রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে।" —মধুসূদন।

(v) "এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে ধরা।" —রবীন্দ্রনাথ।

(এটি তৃতীয় উদাহরণের সঙ্গে এক। তবু এটি দিলাম দুটি কারণে: প্রথম, 'নবনীনিন্দিত' কথাটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়, বহু স্থানে তিনি এটি প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয়, নিন্দাকারী অর্থে 'নিন্দিত'-র ব্যবহার ভুল হ'লেও বহু শতাব্দী ধ'রে এর ব্যবহার চ'লে আসছে, রবীন্দ্রনাথও এ ভুল করেছেন।)

(vi) "দেখেছে সে বাহু এক মৃণাল-নিন্দিত।" —কামিনী রায়।

(vii) "গৌরাঙ্গ-চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কীরে
এমন করিতে নারে আলো।
অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদ উদয় নদীয়াপুরে
মনের আঁধার দূরে গেল॥" —পরমানন্দ।

—উপমান চাঁদের চেয়ে উপমেয় গৌরাঙ্গের উৎকর্ষ কারণসমেত দেখানো হয়েছে। কারণ অবশ্য বৈধর্ম্ম্য-প্রধান সাধারণ ধর্ম্ম ; চাঁদ কলঙ্কী, গৌরাঙ্গ নিষ্কলঙ্ক ; চাঁদ আলোকিত করে বাইরের বস্তুকে, গৌরাঙ্গ মনোলোককে। এটি প্রথম উদাহরণের মতো, কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর। 'অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদ উদয় নদীয়াপুরে'—অতিশয়োক্তি বললে ভুল হবে ; কারণ উৎকর্ষ দেখাতে তুলনার পথে 'কলঙ্কী'-র অনুষঙ্গ 'অকলঙ্ক'। এই পদখানিতে ("পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে···") উদ্ধৃত অংশটির মতন আরও তিনটি সুন্দর ব্যতিরেকের উদাহরণ রয়েছে।

(viii) "বরণি না হোয় রূপ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ, কিয়ে কুবলয়দল,
কিয়ে কাজর, কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥" —অনন্তদাস।

—অনির্ব্বচনীয় কৃষ্ণরূপের কাছে কোথায় বা মেঘপুঞ্জ, কোথায় বা নীলপদ্ম, কোথায় বা কাজল আর কোথায় বা নীলকান্তমণি!

(ix) "সুধা হ'তে সুধাময় দুগ্ধ তার।" —রবীন্দ্রনাথ।

—'তার'=শুক্রাচার্য্যের আশ্রমধেনুর। দেবযানীর প্রতি কচের উক্তি।

(x) "শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে।"—মধুসূদন।

—'দাসী' সরমা। 'হেন মধুমাখা কথা' সীতার।

(xi) "কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।" —রবীন্দ্রনাথ।

—তথাকথিত 'রাজপুতানী'দের কণ্ঠস্বর বজ্রের চেয়ে শতগুণ কঠোর।

(xii) "কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না আছে,
তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "এ পুরীর পথ-মাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiv) "ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাকর জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।"—চণ্ডীদাস।

—দুহুঁ=রাধাকৃষ্ণ। প্রেমের ব্যাপারে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে ভানু কমল, চাতক জলদ, কুসুম মধুপ এবং চকোর চাঁদের তুলনা হয় না। এই 'তুলনা হয় না' বলাতেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে এদের প্রেমের চেয়ে উৎকৃষ্ট এইটুকু বোঝা যাচ্ছে। এখানে তুলনাবাচক শব্দ (হেন, তুলনা, তুল, সম) উল্লিখিত। উপমানগুলি যে নিকৃষ্ট তার কারণ প্রত্যেক উপমানের পরে উল্লিখিত আছে, শেষেরটি ছাড়া। ['কি ছার' শব্দটি নিষ্ফলতা বোঝাচ্ছে ব'লে শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে একটু প্রতীপের ভাব রয়েছে ; তবু 'দুহুঁ সম নহে' বলায় ব্যতিরেক অলঙ্কারের দিকেই ঝোঁক বেশী (প্রতীপ দ্রষ্টব্য)]।

(xv) "গা'-খানি তার শাঙন-মাসের যেমন তমালতরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লী-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্‌।"
—জসীম উদ্দীন।

—চাষার ছেলে 'রূপাই'। শাঙনমাসের তমালের মতন কালো তার গা-খানি দেখলে মনে হয় কে যেন বর্ষামেঘের গায়ে 'তেল' মাখিয়ে দিয়েছে। **'তেল'** লাবণ্য। রূপাইয়ের ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণ্যের তরলপ্রভা দেখে লজ্জা পেয়েছে বিজ্‌লী-মেয়ে—চমক বন্ধ ক'রে লুকিয়ে আছে সে। **'তেল'** অর্থাৎ রূপাইয়ের কালো অঙ্গের লাবণ্য **উপমেয়**, এর তুলনায় **নিকৃষ্ট উপমান** বিজ্‌লী-মেয়ে। অলঙ্কার **ব্যতিরেক**। সুন্দর উদাহরণটি। তরুজগতে নিবিড়তম শ্যামলতা তমালের। বর্ষাকালে তমালপাতার পানে চাইলে মনে হয় সত্যই কে যেন ওর গায়ে তেল মাখিয়ে দিয়েছে, এখনি যেন টুপিয়ে টুপিয়ে পড়বে মাটিতে! কবি প্রথমে উপমায় দেখিয়েছেন রূপাইয়ের বিশিষ্ট কালোরূপটিকে, তারপর উৎপ্রেক্ষায় এনেছেন তেলের ভিতর দিয়ে লাবণ্যের ব্যঞ্জনা, শেষে এই ব্যঞ্জিত লাবণ্যকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন 'ব্যতিরেকে'র।

(xvi) 'কিসের এত গরব প্রিয়া ?
কথায় কথায় মান অভিমান এবার এসো শেষ করিয়া।
ভাটায় ক্ষীণা তরঙ্গিণী ফের জোয়ারে দুকূল ভাঙে ;
জোয়ার গেলে আর কি ফিরে, নারী, তোমার জীবনগাঙে ?'—শ. চ.

এটি **বিপরীতভাবের** ব্যতিরেক। **উপমান** এখানে **উৎকৃষ্ট, উপমেয় নিকৃষ্ট**। গাঙ (নদী) উপমেয় নারীর চেয়ে উৎকৃষ্ট এই কারণে যে গাঙে জোয়ার যায়, আবার আসে কিন্তু নারীজীবনে যৌবন যখন যায় তখন একেবারেই যায়। এইজাতীয় 'ব্যতিরেক' অনেক আচার্য্য সঙ্গত কারণেই স্বীকার করেন না। 'অতিশয়োক্তি'-র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(xvii) "কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলী।"—রবীন্দ্রনাথ।

(xviii) "এলো ওরা
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,—
এলো মানুষ-ধরার দল
গর্ব্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য্যহারা অরণ্যের চেয়ে।"
—রবীন্দ্রনাথ।

—'তোমার'=আফ্রিকার ; 'ওরা', 'মানুষ-ধরার দল'=ইংরেজ।

১৫। প্রতীপ

উপমান যদি উপমেয়রূপে কল্পিত হয় অথবা উপমেয় নিজস্ব শ্রেষ্ঠত্বগুণে যদি উপমানকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহ'লে প্রতীপ অলঙ্কার হয় ("নিষ্ফলত্বাভিধানেন উপমেয়স্য প্রকর্ষ-প্রতীতেঃ উপমান-প্রাতিকূল্যম্"—সাহিত্যদর্পণের রামতর্কবাগীশ-কৃত টীকা)।

প্রতীপের দ্বিতীয় লক্ষণটি থেকে ব্যতিরেক অলঙ্কারের কথা মনে আসতে পারে। **ব্যতিরেকে** যেখানে **উপমেয়ের প্রাধান্য** দেখানো হয়, **প্রতীপে** সেখানে **উপমানকে প্রত্যাখ্যান** করা হয় এইটুকু লক্ষণীয়। ভাবটা এই যে উপমেয় স্বয়ং এত উৎকৃষ্ট যে তার কাছে উপমান নিষ্ফল।

(i) "ফুটিল আজি কমলরাজি কান্তাননতুল্য"—কালিদাস।

—এখানে উপমেয় আনন এবং প্রসিদ্ধ উপমান কমল বিপরীত স্থান অধিকার করেছে অর্থাৎ কমলতুল্য আনন না ব'লে কবি আননতুল্য কমল বলেছেন।

(ii) "মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠ্‌ল ফুটে"

—গোলাম মোস্তাফা।

(iii) "তোমার চোখের মত উছলিবে কাজল-সরসী" —অজিত দত্ত।

(iv) "নিবিড় কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।" —রবীন্দ্রনাথ।

এগুলি সবই প্রথম প্রকারের প্রতীপের উদাহরণ। এইবার দ্বিতীয় প্রকারের প্রতীপের (উপমেয়ের শ্রেষ্ঠত্বগুণে উপমানের প্রত্যাখ্যান) উদাহরণ দিচ্ছি:

(v) 'প্রিয়ে, তব মুখ থাক, কি কাজ শারদসুধাকরে?
থাকুক চঞ্চল আঁখি, নীলোৎপলদল কি বা করে?
এই তব ভুরুভঙ্গী, পুষ্পধনু তুচ্ছ এর কাছে;
কজ্জলকুন্তল তব, মেঘের কি প্রয়োজন আছে?' —শ. চ.

—উপমেয় মুখ, আঁখি, ভুরুভঙ্গী এবং কুন্তল নিজেরাই এত উৎকৃষ্ট যে এদের উপমান সুধাকর, পদ্মদল, মদনের ধনু এবং মেঘ নিষ্ফল, কাজেই প্রত্যাখ্যাত।

(vi) "প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণ-কিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন-গুচ্ছ!"

—রবীন্দ্রনাথ।

(প্রত্যাখ্যান মানে নিষ্প্রয়োজনবোধে পরিহার)

(vii) "কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে ॥" —বিদ্যাপতি।

—রাধার কবরী, মুখ, নয়ন, স্বর এবং গতি (উপমেয়) স্বয়ং এত উৎকৃষ্ট যে উপমান চামরী, চাঁদ, হরিণী, কোকিল এবং গজ নিষ্প্রয়োজনবোধে শুধু পরিত্যক্তই হয় নাই, একেবারে নির্ব্বাসিত হয়েছে—চামরী চাঁদ যথাক্রমে গিরিগুহায়, আকাশে এবং হরিণী, কোকিল, গজ বনে। বলা বাহুল্য যে, নয়ন, স্বর, গতির উপমান হরিণী, কোকিল, গজ নয়; হরিণীর নয়ন, কোকিলঝঙ্কার, গজগতি। এগুলি ব্যঞ্জনায় উপমান।

আধুনিক কাব্য থেকে এমনি একটি উদাহরণ দিই :

(viii) "জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস, রে গজরাজ ; দেখিয়া ও গতি
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি ?" —মধুসূদন।

—'ও গতি' হ'ল ইন্দ্রজিতের গতি। প্রমীলার উক্তি।

(ix) "হরিতাল কোন্ ছার বিকার সে মৃত্তিকার
সে কি গৌররূপের তুলনা ?" —লোচনদাস।

(x) "ছি ছি কি শরতের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা ॥" —বলরামদাস।

[শেষোক্ত উদাহরণদুটির সম্বন্ধে একটা কথা আছে : উপমান হরিতাল এবং চাঁদ উপমেয় (যথাক্রমে) গৌররূপ এবং মুখ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, **যেহেতু** হরিতাল মৃত্তিকার এবং চাঁদের ভিতরে কালিমা—এই লক্ষণে এবং তুলনাবাচক শব্দ 'তুলনা' 'উপমা'-র প্রয়োগহেতু অলঙ্কার এদুটি ক্ষেত্রে প্রতীপ না ব'লে, ব্যতিরেক বলাই সঙ্গত। কিন্তু 'কোন্ ছার' এবং 'ছি ছি' নিষ্ফলতাব্যঞ্জক ব'লে প্রতীপলক্ষণ বর্ত্তমান। আমার মনে হয়, এখানে প্রতীপ-ব্যতিরেকের সঙ্কর। এই সূত্রে ব্যতিরেক অলঙ্কারে উদ্ধৃত অষ্টম উদাহরণের শেষ পঙ্‌ক্তির (কি ছার চকোর ইত্যাদি) উপর মন্তব্য পঠনীয়।]

(খ) বিরোধমূলক অলঙ্কার

১৬। বিরোধাভাস

যখন দুটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী ব'লে বোধ হয়, কিন্তু তাৎপর্য্যে সে বিরোধের অবসান হয়, তখন হয় **বিরোধাভাস** বা **বিরোধ** অলঙ্কার।

এ অলঙ্কারটির Oxymoron এবং Epigramএর সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।

অধ্যাপক Bain বলেছেন, "The Epigram is *an apparent contradiction in language* which by causing a temporary shock, rouses our attention to some important meaning underneath"।

(i) "অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।"

—চক্ষু, কর্ণ এবং পদের অভাব যথাক্রমে দর্শন, শ্রবণ এবং গতির বিরোধী। কিন্তু বিশেষণগুলি ভগবানের; কাজেই তত্ত্বতঃ কোনো বিরোধ নাই।

(ii) "মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃতহ্রদে"—মধুসূদন।

—হ্রদে পড়া এবং মক্ষিকার গ'লে না যাওয়া পরস্পরবিরোধী। কিন্তু হ্রদটি অমৃতের—অমৃত অমর করে, ধ্বংস করে না।

(iii) "বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
'**ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত** করিয়া আমারে
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে'।" —রবীন্দ্রনাথ।

—শৃঙ্খলমুক্তির দ্বারা শৃঙ্খলবন্ধন পরস্পরবিরোধী। দুই শৃঙ্খলে যমক অলঙ্কার। প্রথমটি কারাগারের লৌহশৃঙ্খল, দ্বিতীয়টি প্রেমের বন্ধন। এইখানে বিরোধের অবসান।

(iv) "অবলার কোমল মৃণাল-বাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।...
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।" —রবীন্দ্রনাথ।

—মদনের কাছে চিত্রাঙ্গদার বরপ্রার্থনা। 'এ বাহু' চিত্রাঙ্গদার কঠিন-কিণাঙ্কিতকরতলবিশিষ্ট পুরুষোচিত সবল বাহু।

(v) "সবে বলে মোরে কানু-কলঙ্কিনী গরবে ভরল দে"

—জ্ঞানদাস।

—কলঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে গৌরববোধের বিরোধ। কিন্তু এ কলঙ্ক যে কানুকলঙ্ক (তুলনীয়—"কানুপরীবাদ মনে ছিল সাধ সফল করিল বিধি"—চণ্ডীদাস)।

(দে=দেহ; পরীবাদ=লোকনিন্দা অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণসম্পর্কে কলঙ্ক)

(vi) "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"—চণ্ডীদাস।

—প্রেমবৈচিত্ত্যে বিরোধের অবসান।

(vii) "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান।"—কাজি নজরুল।

(viii) "চলে বায়ু অতি মন্থরগতি শীকরনিকর বহি
ধীরে বিরহিচিত্ত দহি।"

—কবিশেখর কালিদাস।

(ix) "অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"—রবীন্দ্রনাথ।

(x) "রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি।"—চণ্ডীদাস।

(xi) "সজল নয়ান করি পিয়াপথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগচারি।"—বিদ্যাপতি।

—বিরহিণী রাধার কাছে প্রিয়-অদর্শনের একটি মুহূর্তও অসহ্য।

(xii) "মন মোর ছড়ায়েছে ত্রিভুবনময়,
নহে মিথ্যা নহে—
সবার আসঙ্গ লভি সবার বিরহে।"—অন্নদাশঙ্কর।

(xiii) "দশ দিশি বিরহ হুতাশ।
শীতল যমুনাজল অনল সমান ভেল
ভনতহি গোবিন্দদাস॥"

—যমুনাজল **শীতল এবং অনলসমান**; এই বিরোধ অবসিত হচ্ছে বিরহের দ্বারা। [দিনেশচন্দ্রের 'পদাবলীমাধুর্য্য' থেকে এই অংশটুকু নিয়েছি। পাঠান্তর "সোহি যমুনাজল অবহুঁ দ্বিগুণ ভেল"—এতে **বিরোধ** হবে না।]

(xiv) "পিনাকে তোমার দাও টঙ্কার,
ভীষণে মধুরে দিক্ ঝঙ্কার,

ধূলায় মিশাক্ যা কিছু ধূলার,
জয়ী হোক্ যাহা নিত্য।"—রবীন্দ্রনাথ।

—অসত্যের ধ্বংস এবং সত্যের জয় ভীষণে মধুরে-র বিরোধ অবসান করছে। [এটি Oxymoron এবং বিরোধাভাস দুইই। Oxymoron-এ বিরোধী শব্দদুটি সবসময়েই পাশাপাশি থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের "**ভীষণ মধুর** রোল উঠেছে **রুদ্র আনন্দে**" Byronএর "Horribly beautiful"-এর মতন Oxymoron, ঠিক বিরোধাভাস নয়।]

(xv) "ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে—
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।"
—গোলাম মোস্তাফা।

—এটি Epigram এবং বিরোধাভাস দুইই। তুলনীয় : "Child is father of the man"—Wordsworth.

(xvi) "এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান।"—রবীন্দ্রনাথ।

—(দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে লিখিত)

(xvii) "পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"—রবীন্দ্রনাথ।

(মোর=শিবাজীর গুরু রামদাসের)

(xviii) "মন্দমলয়ানিল বিষসম মানই মুরছই পিককুলরাবে"—
বিদ্যাপতি।

(বিরহিণী রাধার অবস্থা)

(xix) "মেছোহাটে ঢুকে **জনারণ্যের**
নির্জ্জনতার মাঝে,
গোপন চিত্তে কার নিমিত্তে
গভীর বেদনা বাজে?"—যতীন্দ্রনাথ।

—কবি হাট করতে আসেন নাই ; এসেছেন বিক্রীর জন্য 'ডাঙার প্রবাসে' আনা 'জলের দুলাল'-দের দেখতে। তাদেরই জন্য কবির বেদনা। এই অনুভবের অতলে হাটের মানুষগুলো তলিয়ে গেছে। তাই জনারণ্য কবির কাছে 'নির্জ্জন'।

(xx) "ওগো তরুণী…
মনে বুঝবে, **সেদিন তুমি ছিলে না তবু ছিলে**—

নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে
যবনিকার ওপারে ॥"—**রবীন্দ্রনাথ।**

—'সেদিন'=সুদূর অতীতকালে। তরুণী চিরন্তনী অর্থাৎ যৌবনস্বপ্ন যুগে যুগে এক, কালান্তরে তার রূপান্তর হয় না: এইখানেই স্থূলাক্ষর অংশের বিরোধের অবসান।

(xxi) "শিশিরঝরা কুন্দফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা!"—রবীন্দ্রনাথ।

(xxii) "হেলা করি চলি গেলা
বীর। **বাঁচিতাম** সে মুহূর্তে **মরিতাম**
যদি—" —রবীন্দ্রনাথ।

—'বাঁচিতাম'=পুরুষ অর্জ্জুন নারী চিত্রাঙ্গদা আমাকে হেলা ক'রে চ'লে গেল এই অপমানের হাত থেকে মুক্তি পেতাম।

(xxiii) "কালোবাজারে ঘুরে ঘুরে হাত ফর্সা করেছে, চেহারা করেছে সুন্দর।" —জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

১৭। *বিভাবনা*

বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তির নাম **বিভাবনা**।

বিভাবনায় কার্য্যকারণের এই যে বিরোধ, এ কিন্তু বাস্তব নয়; যেহেতু "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ" অর্থাৎ কারণহীন কার্য্য সম্ভব নয়। **এতে প্রসিদ্ধ কারণ থেকে কার্য্য হচ্ছে না এইটুকু দেখিয়ে অন্য একটি কল্পিত কারণের সাহায্যে কার্য্যসিদ্ধি করা হয়; ফলে বিরোধের অবসান হ'য়ে যায়।** এই **নতুন কারণটি উল্লিখিত থাকতে পারে,** আবার **নাও থাকতে পারে।** কারণের উল্লেখে হয় **উক্তনিমিত্তা বিভাবনা**, অনুল্লেখে **অনুক্তনিমিত্তা বিভাবনা**।

(i) 'সুরাপান বিনা মত্ততা তনুমনে,
সীমাহীন শোভা দেহে বিনা আভরণে,
অতন্দ্র আঁখি মেদুর স্বপনমেঘে—
বালা নহে আর, যৌবন তার জীবনে উঠেছে জেগে।'—শ. চ.

—মত্ততা, শোভা এবং স্বপন কার্য্য; এদের প্রসিদ্ধ কারণ যথাক্রমে সুরাপান, আভরণ এবং তন্দ্রা। কারণাভাব এবং কার্য্যের যে বিরোধ তার মীমাংসা

হয়েছে নতুন একটি কারণের সাহায্যে। সে **কারণ** যৌবন এবং তা **উক্ত হয়েছে**।

(ii) "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনা বাতে নিবে গেল মঙ্গল প্রদীপ।" —অমৃতলাল।
(আশুতোষের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

—বজ্রাঘাত, ইন্দ্রপাত এবং দীপনির্ব্বাণ এই কার্য্যগুলির প্রসিদ্ধ কারণ যথাক্রমে মেঘ, কল্পান্ত (ইন্দ্র দেবরাজের নাম নয়, উপাধি। এক এক ইন্দ্রের স্থিতিকাল এক এক কল্প। এখানে 'অকস্মাৎ'-এর অর্থ কল্পান্তের অভাব) এবং বায়ু। প্রসিদ্ধ কারণের অভাবেও কার্য্যগুলির উৎপত্তি হওয়ায় কার্য্যকারণের যে বিরোধ হয়েছে, তার সমাধান আশুতোষের মৃত্যুর আকস্মিকতায়। **নতুন কারণটি** এখানে **উল্লিখিত নাই**।

(iii) 'মেঘ নাই তবু অঝোরে ঝরিল জল,
ফুল ফুটিল না আপনি ধরিল ফল ;—
স্বপনেও কভু ভাবি নাই, প্রিয়তম,
এমনি করিয়া সহসা আসিয়া নয়ন জুড়াবে মম !'—শ. চ.

(iv) "সে এল না, এল তার মধুর মিলন ;
দৃষ্টি তার ফিরে এল, কোথা সে নয়ন ?
চুম্বন এসেছে তার, কোথা সে অধর ?"—রবীন্দ্রনাথ।

—যৌবনবেদনার ঋতু বসন্তে আবির্ভূতা এই কবিপ্রিয়া অশরীরিণী। মিলন, চুম্বন, দৃষ্টি সবই **ভাবলোকে** ; তাই স্থূল কারণ 'সে', 'অধর', 'নয়ন' বিনাই এসব সম্ভব হয়েছে।

[দীননাথ মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকায় বিভাবনার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করেছেন—

"মরে নর কালফণী-নশ্বর-দংশনে ,—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে তুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জ্বলে
পরাণ।"

—ফণি-দংশন নাই, জ্বালা আছে অর্থাৎ কারণ নাই, কার্য্য আছে ; বিরোধের অবসান হচ্ছে যে কল্পিত কারণের দ্বারা সে হ'ল 'হেরি' ("শুধু **হেরিয়াই** প্রাণজ্বালা"—দীননাথ) ; অতএব বিভাবনা। কিন্তু **এখানে বিভাবনা মোটেই নাই** : প্রসিদ্ধ কারণের অভাবে তারই কার্য্যটিকে সিদ্ধ

করে কল্পিত কারণ; এখানে প্রসিদ্ধ কারণ দংশনের ফল মৃত্যু ("মরে নর") আর দীননাথের কল্পিত কারণ দর্শনের ("হেরিয়া") ফল জ্বালা; **এ অবস্থায় বিভাবনা হয় না।** ফনি-দর্শনে জ্বালা অর্থাৎ কারণ আর কার্য্যে বৈষম্য; অতএব বিষম অলঙ্কার যে বলব তাও পারি না; বাদ সাধছে 'কাম' কথাটি, বেণীকে পূর্ণগ্রাস ক'রে 'ফণী' যে অতিশয়োক্তি সৃষ্টি করেছিল তাকে ধ্বংস ক'রে সুন্দরীদের বেণীকেই প্রাধান্য দিয়ে। সুন্দরীদের বেণী দেখে পুরুষের কামার্ত্তি স্বাভাবিক ব'লে 'হেরি' আর 'জ্বালা'-য় কোনো বৈষম্য নাই।

(v) "এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ॥" —চণ্ডীদাস।

অনুরাগের স্বসংবেদ্য দশায় বিষয় ইন্দ্রিয়ের পথে আসে না। এইখানে বিরোধের অবসান।

১৮। বিশেষোক্তি

কারণ-সত্ত্বেও যেখানে কার্য্য বা ফলের অভাব হয়, সেখানে হয় **বিশেষোক্তি।**

বিশেষোক্তিতে কার্য্যাভাব, কিন্তু কার্য্যের বিরুদ্ধ ব্যাপার ঘটে।

(i) 'দেহ দগ্ধ করি তার শক্তি তুমি পারনি নাশিতে—
কন্দর্প ভুবন জয় করে, শম্ভু, হাসিতে হাসিতে।'—শ. চ.

—দহন কারণের কার্য্য শক্তিনাশ। এখানে কারণ রয়েছে, কিন্তু তার ফল নাই। অবলীলায় ভুবনজয় শক্তিহীনতার বিপরীত। এই বিরোধেই অলঙ্কার।

(এইজাতীয় ফলকে বিশ্বনাথ "অচিন্ত্যনিমিত্তম্" বলেছেন, যেহেতু এই-প্রকার বিপরীত কার্য্যের উৎপত্তি কেমন ক'রে হয় তা চিন্তা করা যায় না।)

"পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বমাঝে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!"

—এখানে কিন্তু বিশেষোক্তি অলঙ্কার নাই।

(ii) **"মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,......**
কহ মোরে সর্ব্বদর্শী, হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম।
নারদ কহিলা ধীরে—অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"—রবীন্দ্রনাথ।

—ঐশ্বর্য্য, দৈন্য, সম্পদ্, বিপদ্—এই কারণগুলির ফল যথাক্রমে ঔদ্ধত্য, নতি, সাহস, ভয়। কিন্তু এগুলি না ঘ'টে ওদের বিরুদ্ধ ফল নম্রতা, নতিহীনতা, ভয় এবং নির্ভীকতার উৎপত্তি দেখা যাচ্ছে। এর কারণ এই যে যাঁর মধ্যে এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে তিনি 'রঘুপতি রাম'—এইখানেই বিরোধের অবসান।

(iii) "পরিশেষে বৃদ্ধকাল কালের অধীন।......
আছে চক্ষু, কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ, কিন্তু তাহে শব্দ নাহি ধায়॥"—ঈশ্বর গুপ্ত।

—কারণ চক্ষু এবং কর্ণ-সত্ত্বেও যে তাদেব কার্য্য হচ্ছে না তার নিমিত্ত 'বৃদ্ধকাল'। এটি **উক্তনিমিত্ত বিশেষোক্তির** উদাহরণ।

(iv) "দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার।" —কৃত্তিবাস।

—এখানে অন্ধকারনাশরূপ কার্য্যের প্রসিদ্ধ কারণগুলি-সত্ত্বেও কার্য্য হচ্ছে না, কার্য্যকারণের এই আপাতবিরোধের অবসান হচ্ছে শেষ পঙ্ক্তির দ্বারা।

(v) "যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ,
অনল আমাবে নাহি দহে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মরণ যে বাসে ভয়
কালা যার হিয়ামাঝে রহে॥"

১৭। অসঙ্গতি

কার্য্য এবং কারণ যদি ভিন্ন আশ্রয়ে থাকে, তাহ'লে **অসঙ্গতি অলঙ্কার** হয়।

বিরোধ অলঙ্কারে পরস্পরবিরোধী পদার্থদুটি থাকে একই আশ্রয়ে বা অধিকরণে; 'শীতল' এবং 'অনলসমান' দুইই 'যমুনা-জল'। কিন্তু অসঙ্গতিতে পৃথক্ অধিকরণে থাকে কারণ এবং কার্য্য। পদে সর্পাঘাতের ফলে যদি চোখে তন্দ্রা আসে, তাহ'লে অলঙ্কার হবে না দুটি কারণে: প্রথম, পদ এবং চক্ষু ভিন্ন স্থান হ'লেও একই দেহের অঙ্গ; দ্বিতীয়, চমৎকারিতার অভাব। মনে রাখা উচিত যে চমৎকারিত্বসৃষ্টিই এইজাতীয় সকল অলঙ্কারের বিশিষ্ট লক্ষণ।

(i) 'কঠিন মাটিতে বঁধু চ'লে যায়,
মোর বুকে ব্যথা বাজে।'—শ. চ.

কঠিন মাটিতে চলারূপ কারণের কার্য্য যে ব্যথা তা বঁধুর চরণে লাগাই স্বাভাবিক; কিন্তু লাগছে নায়িকার বুকে। প্রেমই এই সংঘটনের মূলে থেকে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। কারণ 'চলা' আর কার্য্য 'ব্যথা'-র আধার, যথাক্রমে 'মাটি' আর 'বুক'।

(ii) "একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।"—ভারতচন্দ্র।

—শিবের ললাটবহ্নিতে মদন ভস্মীভূত হওয়ায় মদনপত্নী রতির সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল; তাই রতির এই উক্তি। (একের=শিবের; আরের=রতির)

(iii) "আর এক অপরূপ কহিতে নারি
যেথা মেঘ সেথা না হয় বারি।"—জ্ঞানদাস।

—এক স্থানে মেঘ; অন্য স্থানে বারিবর্ষণ; কারণ এবং কার্য্যের বিভিন্ন আশ্রয়। এর ব্যাখ্যাসূত্রেই যেন, কবি পরেই বলছেন, "হৃদয়মাঝে মেঘ উদয় করি। নয়নের পথে বরিখে বারি॥" রাধার পূর্ব্বরাগ। হৃদয়গগনে উদিত হয়েছেন শ্যামজলধর, নয়নে ঝরছে প্রেমের অশ্রু। মেঘ-বারিবর্ষণের ভিন্ন আশ্রয় ব্যাপারটা স্পষ্টই বোঝা গেল। এই মাধুর্য্যই অলঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

(iv) "ওদের বনে ঝরে শ্রাবণধারা,
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।"—রবীন্দ্রনাথ।

২০। *বিষম*

(ক) কারণ এবং কার্য্যের যদি **বৈষম্য** বা বিরূপতা ঘটে, কিম্বা **(খ) কারণ থেকে ইচ্ছানুরূপ ফলের পরিবর্ত্তে** যদি **অবাঞ্ছিত ফল** আসে অথবা **(গ) একাধারে** যদি **একান্ত অসম্ভব ঘটনার মিলন** হয়, তাহ'লে **বিষম** অলঙ্কার হয়।

(i) "কি ক্ষণে যমুনায় গেলাম কালোরূপ কি হেরিলাম—
যমুনার একূল ওকূল দুকূল করেছে আলো।"—বাঙলা গান।

—কৃষ্ণের দেহবর্ণের গুণ কালিমা থেকে উজ্জ্বলতাগুণের আলোর উৎপত্তি। এখানে **কারণ এবং কার্য্যের গুণ-বৈষম্য হয়েছে।**

(ii) "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়াসাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥…
পিয়াস লাগিয়া জলদে সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।" —চণ্ডীদাস।

—এটি **ইচ্ছানুরূপ ফলের স্থলে অবাঞ্ছিত এবং দুঃখময় ফলাগমের লক্ষণযুক্ত বিষম** অলঙ্কারের চমৎকার উদাহরণ। (অনেকের মতে পদটি জ্ঞানদাসের।)

(iii) "হেরিলে ফণী পলায় তবাসে,
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;—
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায় ?" —মধুসূদন।

—এ ফণী=রক্ষঃসুন্দরীর, বেণী। ফণী কারণ, (দ্রষ্টার পক্ষে) ভয়জনিত পলায়ন স্বাভাবিক কার্য্য। ফণীকে গলায় জড়ানো অস্বাভাবিক ; কাজেই **কার্য্যকারণে বৈষম্য**।

(iv) "তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চ'রে বেড়ায় মোদের বটমূলে,
যদি ভাঙে আমার খেতের বেড়া
কোলের 'পরে নিই তাহারে তুলে।"—রবীন্দ্রনাথ।

—ক্ষেতের বেড়াভাঙা কারণের স্বাভাবিক ফল ভেড়াকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তা না ক'রে আদর ক'রে কোলে তুলে নেওয়া। **কারণে কার্য্যে** বৈষম্য গুরুতর ; কিন্তু ভেড়াটি যার, "আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা"।

(৮) 'সাগরমেখলা পৃথ্বী, মহান্ সম্রাট্ তুমি তার ;
ভ্রমিছ শ্মশানে আজি চণ্ডালের বহি কার্য্যভার !'—শ. চ.

—এখানে **একই আধার হরিশ্চন্দ্রে একান্ত অসম্ভব ঘটনার মিলন** হওয়ায় বিষম অলঙ্কার হয়েছে।

"যে-কালো তা'র মাঠেরি ধান, যে-কালো তা'র গাঁও
সেই **কালোতে সিনান করি উজল** তাহার গাও !"—জসীম উদ্দীন।

—কারণকার্য্যে বৈষম্য।

(গ) শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার

২১। কারণমালা

কোনো কারণের কার্য্য যদি পরবর্ত্তী কোনো কার্য্যের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে হয় **কারণমালা**।

(i) "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ সম্বরণ॥"—হিতোপদেশ।

—লোভকারণের কার্য্য পাপ এবং এই পাপ আবার মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

[একজাতীয় Climaxএর সঙ্গে কারণমালার মিল আছে : "Luxury gives birth to avarice, avarice begets boldness ; and boldness is the parent of depravity and crime."]

২২। একাবলী

উত্তরোত্তর প্রযুক্ত বিশেষ্য যদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পদের বিশেষণ হ'য়ে দাঁড়ায়, **অথবা** পূর্ব্ব-পূর্ব্ব প্রযুক্ত বিশেষ্য যদি উত্তরোত্তর পদের বিশেষণ হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে হয় **একাবলী** অলঙ্কার।

'**বিশেষণ** হওয়া' মানে **বিশেষণভাবাপন্ন** হওয়া।

এই বিশেষণভাব **স্থাপন** এবং **নিবর্ত্তন** দুই পন্থায় হ'তে পারে (স্থাপন=affirmation ; নিবর্ত্তন=Negation)। একাবলীর অর্থ কণ্ঠহার।

(i) 'সরসী **বিকচপদ্ম**, পদ্ম সে **মধুপ-অলঙ্কার**,
মধুপ **গুঞ্জনরত**, গুঞ্জন অমৃতপারাবার।'—শ. চ.

এখানে **পরবর্ত্তী** পদ্ম, মধুপ এবং গুঞ্জন এই **বিশেষ্যগুলি** পূর্ব্ববর্ত্তী সরসী, পদ্ম এবং মধুপের যথাক্রমে বিশেষণ হয়েছে। বিশেষণপদগুলি, সহজে চেনা যাবে ব'লে, স্থূল অক্ষরে দিয়েছি। বিকচ (বিকসিত) পদ্ম যাতে এমন সরসী, মধুপ অলঙ্কার যার এমন পদ্ম এবং গুঞ্জনে রত এমন মধুপ। প্রথম দুটি বহুব্রীহি-সমাসের দ্বারা বিশেষণ করা হয়েছে। সহজ ভাষায়, স্থূলাক্ষর পদগুলির পদ্ম, মধুপ এবং গুঞ্জন সমাসে বিশেষণভাবাপন্ন হয়েছে ; কিন্তু সমাসের বাইরে স্বাধীনভাবে যে পদ্ম, মধুপ এবং গুঞ্জন রয়েছে, এগুলি বিশেষ্য। এ উদাহরণটি স্থাপনপন্থার।

[পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য পরবর্ত্তী পদার্থের বিশেষণরূপে দেখানো হ'লেও একাবলী হয়।]

(ii) **"গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি**
সুন্দর ধরাতল।" —যতীন্দ্রমোহন।

—এখানে **পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য** ফুল পরবর্ত্তী অলির বিশেষণ হয়েছে। বিশেষণ ঠিক Adjective নয়; ফুল অলির বিশেষণ হয়েছে বলার তাৎপর্য্য এই যে ফুল-সংযোগে অলি বিশিষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এমনি একটি উদাহরণ গীতরামায়ণ থেকে উদ্ধৃত করছি :

(iii) **"শমনদমন রাবণরাজা রাবণ-দমন রাম।**
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥"

—এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য রাবণ পরবর্ত্তী রামের বিশেষণভাবাপন্ন হয়েছে—কেমন রাম? রাবণকে যিনি দমন করেন, এমন। বিশ্বনাথ বলেছেন "ক্বচিৎ বিশেষ্যম্ অপি যথোত্তরং বিশেষণতয়া স্থাপিতম্..." এবং উদাহরণ দিয়েছেন, "বাপ্যো ভবন্তি বিমলাঃ, স্ফুটন্তি কমলানি বাপীষু। কমলেষু পতন্ত্যলয়ঃ, করোতি সঙ্গীতমলিষু পদম্॥" অর্থাৎ

(iv) 'বাপী নিরমল, বাপীতে কমল ফুটে।
কমলে ভৃঙ্গ, ভৃঙ্গে গীতিকা উঠে॥'

—বাপী (দীঘি) কমলের, কমল ভৃঙ্গের, ভৃঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষণ। দেখা যাচ্ছে বিশেষণ বলতে আমরা যা বুঝি, এ বিশেষণ তা নয়।

(v) 'জল সে নহে পদ্ম নাহি যাহে,
পদ্ম নহে নাহি যেথায় অলি,
অলি সে নয় গান যে নাহি গাহে,
গান সে নহে হৃদয়মন না যায় যাহে গলি।'—শ. চ.

—এটি **নিবর্ত্তন বা অপোহন (Negation)-পন্থার** উদাহরণ। এখানে পরবর্ত্তী বিশেষ্য পদ্ম, অলি এবং গান যথাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী জল, পদ্ম এবং অলির বিশেষণরূপে নিবৃত্ত হয়েছে 'নহে' অর্থযুক্ত নিষেধার্থক শব্দের প্রয়োগে।

(vi) "আকাশ যেথায় সিন্ধুরে ধরে, সিন্ধু ধরার হাত,
বিশ্বজনারে মিলাইতে সেথা দৃশ্য জগন্নাথ।" —যতীন্দ্রমোহন।

(vii) "ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত।" —কৃত্তিবাস।

(viii) "মোরা চাই উদার জীবন,
উদার জীবন ভরি ধ্যানের প্রসন্ন একাগ্রতা।" —বুদ্ধদেব।

(ix) "দুঃখের মজা ক্রন্দনে ; ক্রন্দনের মজা কীর্ত্তনে।"

—অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

২৩। সার

বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষের নাম **সার**।

'অলঙ্কারসর্ব্বস্বে' এটির নাম দেওয়া হয়েছে **উদার** অলঙ্কার।

(i) 'রাজ্যে সার বসুন্ধরা, বসুন্ধরায় নগরী, নগরীতে শয্যা, শয্যায় কামনাময়ী সুন্দরী তরুণী।'—অনুবাদ।

—দেখা যাচ্ছে চরম উৎকর্ষ অর্থাৎ সকলের সার 'কামনাময়ী সুন্দরী তরুণী' এবং এইখানেই মাধুর্য্য।

(ii) "ফুল চাই সখা, শাদা ফুল, মধুগন্ধিত শাদা ফুল।
জুঁইমল্লিকা? না, না, শতদল—আছে এর সমতুল?"

—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

অনেকে সারকে Climax ব'লে মনে করেন। এ ধারণা ঠিক নয়।

"মুছে নেছে গ্রামের চিহ্ন, চেটে নেছে ভিটের মাটি
মরণটানে টান্‌ছে ডুরি—সাতটা জেলায় কান্নাহাটি……
আজকে আধা বাঙলাদেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায়!"—সত্যেন্দ্রনাথ।

এটি 'সার' নয়, Climax, বাইরনের "A ruin—yet what ruin! from its mass walls, palaces, half-cities have been reared"-এর মতন। 'উদ্দ্যোত'-কারের মতে **সার** "উৎকর্ষশ্চ শ্লাঘ্যগুণানাম্" ; তবে অধমগুণ যাদের তাদেরও উৎকর্ষে **সার হ'তে পারে** ; যেমন,

(iii) তৃণের চেয়ে লঘু তুলা, তুলার চেয়ে লঘু যাচক' ইত্যাদি। এটিও ঠিক Anti-climax (Bathos) নয় অর্থাৎ "The hurricane tore up oaks by roots, laid villages waste and overturned a haystack" (Bulls and Blunders)-এর স্বজাতি নয়। Bathosএর উদ্দেশ্য হাস্যরসসৃষ্টি, সার (উদার)-এর তা নয়। Climaxএ 'each is more striking than the previous one', সার অলঙ্কারে বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ।

(ঘ) ন্যায়মূলক অলঙ্কার

২৪। কাব্যলিঙ্গ

যেখানে কোনো বাক্যের বা পদের অর্থকে ব্যঞ্জনাদ্বারা কোন বর্ণনীয় বিষয়ের কারণস্বরূপে দেখানো হয়, সেখানে হয় **কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার**।

(বাক্য = sentence ; পদ = word) পদটি সমাসবদ্ধও হ'তে পারে, আবার এককও হ'তে পারে। ব্যঞ্জনা (suggestion) বলার অর্থ এই যে সোজাসুজি কারণ হ'লে অলঙ্কার হবে না। কাব্যলিঙ্গকে **হেতু** অলঙ্কারও বলা হয়।

(i)) 'রে হস্ত দক্ষিণ মোর, ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রটিরে
প্রাণ দিতে, এ কৃপাণ হানো তুমি শূদ্রমুনিশিরে ;
গর্ভভারক্লিষ্টসীতানির্ব্বাসনপটু রাঘবের
অঙ্গ তুমি—দয়া কোথা তব ?'—শ. চ.

—এখানে দক্ষিণ হস্তের নির্দ্দয়তার কারণ দুটি ; একটি 'রাঘবের অঙ্গ তুমি' এই বাক্য এবং অপরটি 'গর্ভভারক্লিষ্টসীতানির্ব্বাসনপটু' এই সমস্ত (অর্থাৎ compound) পদ।

[যদি বলি, 'মানুষের পাপহেতু গুরুভার এই ধরণীরে বাসুকি বহিতে আর নাহি পারে আপনার শিরে', তাহ'লে অলঙ্কার হবে না, ব্যঞ্জনার পরিবর্ত্তে সোজাসুজি কারণ দেখানো হয়েছে ব'লে।]

(ii) 'তব নেত্রসমকান্তি ইন্দীবর ডুবিয়াছে জলে,
তব মুখসমচন্দ্র লুকায়েছে মেঘপুঞ্জতলে,
তব গতিসমগতি রাজহংস গেছে দূরান্তরে,—
তোমার সাদৃশ্যমাত্রে আনন্দ আমার বিধি নাহি ক্ষমা করে।'
—শ. চ.

—এটি বর্ষায় বিরহীর উক্তি। প্রথম তিনটি বাক্য হ'তে নিষ্পাদিত হচ্ছে যে প্রিয়ার অভাবে প্রিয়ার সদৃশবস্তুগুলির দর্শনজনিত যে সুখটুকু তাও বিধাতার অভিপ্রেত নয়। কাজেই প্রথম তিনটি বাক্য শেষোক্ত বিষয়টির হেতু বা কারণ হয়েছে অর্থাৎ এই তিনটি থেকে নায়ক বুঝতে পেরেছেন যে সাদৃশ্যমাত্রে আনন্দও বিধাতার অভিপ্রেত নয়।

(iii) "ভবনদেবতা দিবেন ইষ্ট ফল ;
কোথা তনু তব, কোথা তপ সুকঠিন !

সহে অলি-ভার পেলব শিরীষ-দল,
বিহঙ্গভার সহে না সে কোনোদিন।” —শ. চ.
(কুমারসম্ভব হ'তে)

—বরলাভের জন্য কঠিন তপশ্চারিণী পার্ব্বতীকে তপস্যা বন্ধ করতে বলছেন জননী মেনকা। তপস্যার প্রয়োজন নাই এই কারণে যে গৃহে যে সব ইষ্টদেবতা রয়েছেন, তাঁদের কাছে প্রার্থনা করলেই দেবেন তাঁরা অভীষ্ট বর। এখানে তপোনিষেধের হেতু 'ভবনদেবতা দিবেন ইষ্ট ফল' এই বাক্যটির ব্যঞ্জনা। **অলঙ্কার কাব্যলিঙ্গ** (মাত্র প্রথম দু চরণে)।

কুমারসম্ভব-ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বলেছেন—**দৃষ্টান্ত**। পার্ব্বতীর কৃশতনু বর-প্রার্থনার যোগ্য, কিন্তু তপস্যার যোগ্য নয়—শিরীষপুষ্প অলির ভার সইতে পারে, পাখীর নয়।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র কবিতাটিতে **কাব্যলিঙ্গ** ও **দৃষ্টান্ত**-র **সঙ্কর**।

(iv) “গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে। এ সংসারে যেথা যাও, সেথা থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম……” —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানে কুমারসেনের (গৃহহীন পলাতক হ'লেও) রাজা বিক্রমের চেয়ে অধিকতর সুখিত্বের হেতু (ব্যঞ্জনায় প্রকাশকারী) পরবর্ত্তী বাক্যটি।

(v) “যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি” —মধুসূদন।

—'তুমি'=সীতা। উক্তিটি সরমার। সীতার পদার্পণে সর্ব্বত্র সকলের সুখী হওয়ার হেতু 'জগৎ-আনন্দ তুমি' এই বাক্যটির দ্বারা দ্যোতিত।

(vi) “নির্ভয় হৃদয়ে কহ, হনূমান্ আমি
রঘুদাস ; দয়াসিন্ধু রঘুকুলনিধি।” —মধুসূদন।

—সহচরীসঙ্গিনী প্রমীলার প্রতি ব্যূহদ্বাররক্ষী হনূমানের উক্তি। প্রমীলা প্রভৃতির নির্ভয়তার কারণ ব্যঞ্জিত হচ্ছে 'হনূমান্…নিধি' পর্য্যন্ত অংশটির দ্বারা।

২৫। অর্থাপত্তি

দণ্ডাপূপিকান্যায় অনুসারে অন্য অর্থের আগম হ'লে **অর্থাপত্তি অলঙ্কার** হয়।

[দণ্ড=শলাকা, অপূপ=পুলিপিঠা। একটি দণ্ডে কতকগুলি পিঠা গাঁথা

(শিককাবাবের মতন) ছিল। জানা গেল মূষিকমহারাজ স্বয়ং দণ্ডটিকেই সেবা করেছেন। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় পিঠাগুলিও তাঁরি উদরসাৎ হয়েছে। এরই নাম **দণ্ডাপূপিকান্যায়। ইঁদুরের দণ্ড খাওয়া থেকে যেমন পিঠা খাওয়া বোঝা গেল, তেমনি কোনো অর্থ থেকে ওরই সামর্থ্যের দ্বারা যদি অন্য অর্থ বোঝা যায়, তাহ'লে অর্থাপত্তি অলঙ্কার হয়।]**

(i) 'ওই হার লুটাইছে সুন্দরীর স্তনের উপর,
এই যদি মুক্তাচার, আমরা তো কামের কিঙ্কর!' —শ. চ.

—মুক্তাময় হারের কামনা নাই ব'লে সুন্দরীস্তনে লুটানো তার পক্ষে অস্বাভাবিক। নিষ্কাম হ'য়েও সে যদি এ কাজ করতে পারে, সকাম পুরুষ আমরা এ কাজ সহজেই করব। নিষ্কামের ব্যবহারজনিত অর্থনিষ্পত্তি থেকে সকামের তদ্রূপ ব্যবহারের অর্থ প্রতীত হয়েছে। (ইঁদুরের পক্ষে দণ্ড খাওয়া দুষ্কর হ'লেও তা যদি সিদ্ধ হয়, তার পিঠা খাওয়া সহজেই সিদ্ধ হ'য়ে যায়। তেমনি, নিষ্কামের রমণীসম্ভোগ অস্বাভাবিক হ'লেও যদি তা নিষ্পন্ন হয়, সকামের পক্ষে তা অনায়াসেই সিদ্ধ হ'য়ে যায়। এই হ'ল অর্থাপত্তির মূল তাৎপর্য্য। 'এই যদি মুক্তাচার'-এর 'মুক্তাচার' শব্দটি শ্লেষগর্ভ (মুক্ত+আচার, মুক্তা+আচার)। মুক্ত=মুক্তপুরুষ এই কল্পনা।

(ii) "তুমিও জননী যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!" —রবীন্দ্রনাথ।

—চৈতন্যরূপা অসীম স্নেহময়ী জগজ্জননী,—তাঁর পথ তো হিংসার নয়; এই অস্বাভাবিক হিংসা যদি তাঁর পক্ষে সিদ্ধ হয়, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের পক্ষে সে তো সহজেই সিদ্ধ হ'য়ে যায়। এখানে হিংসাই দুপক্ষের সাধারণ ধর্ম্ম।

(iii) "যে অনভিভবনীয় বীর্য্য, যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার—আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে,—তুমি আমি কে?"
—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ('উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম')।

(iv) "সেদিন যে চিন্তাশক্তি ঈশ্বরকে স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, তাহা এই মাটিতে মিশিয়াছে,—তুমি আমি কে?" —চন্দ্রশেখর।

(v) 'অভিমন্যুর শোকে
দর দর ধারে অশ্রু ঝরিল সব্যসাচীর চোখে;—
লোহা যে কঠিন অত
প্রচণ্ড তাপে সেও গ'লে যায়, মানুষ সহিবে কত?' —শ. চ.

(vi) "সৌন্দর্য্য-সম্পদ্-মাঝে বসি

..কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।

ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই—তবে আর কোথা যাই

ভিখারিনী হ'লো যদি কমল-আসনা॥" —রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "তুমি জানো, মীনকেতু, কতো ঋষি-মুনি

করিয়াছে বিসর্জ্জন নারী-পদতলে

চিরার্জ্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের

ব্রহ্মচর্য্য!" —রবীন্দ্রনাথ।

(viii) "যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্যরজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বাঁধা পড়িয়াছিল, ...সে অনির্ব্বচনীয়া এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে,—তুমি আমি কে?"

—চন্দ্রশেখর।

(ঙ) গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলঙ্কার

২৬। *অপ্রস্তুত-প্রশংসা*

বিশদভাবে বর্ণিত অপ্রস্তুত থেকে যদি **ব্যঞ্জনায়** প্রস্তুতের প্রতীতি হয়, তাহ'লে হয় **অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার**।

আগেই বলেছি 'প্রস্তুত', 'প্রকৃত', 'প্রাকরণিক', 'প্রাসঙ্গিক' শব্দগুলি সমার্থক এবং এদের অর্থ—কবির বর্ণনীয় বিষয়। অপ্রস্তুত-প্রশংসায় কবি তাঁর বর্ণনীয় বিষয়-সম্বন্ধে থাকেন নীরব এবং মুখর হ'য়ে ওঠেন অবর্ণনীয়কে নিয়ে। অপ্রস্তুতের এই যে অবতারণা এবং রূপায়ণ, যতই নিজস্ব সৌন্দর্য্য এর থাক, তবু প্রলাপমাত্রে হ'ত এর পর্য্যবসান, যদি প্রস্তুতের সঙ্গে যে-কোনো-ভাবের একটা যোগ এর না থাকত। এই যোগটাই অপ্রস্তুত-প্রশংসায় বড়ো কথা। কবির শিল্পকৌশলে বর্ণিত অপ্রস্তুত থেকে অবর্ণিত প্রস্তুতে যাওয়ার যে পথটি রচিত হ'য়ে যায়, তা ব্যঞ্জনার পথ। এই পথ ধ'রে পাঠকের চিত্তলোকে আসে প্রস্তুত। এইভাবে প্রতীত হওয়ায় প্রস্তুত যে-সৌন্দর্য্য লাভ করে, কবি যদি অপ্রস্তুতের পথে না গিয়ে সোজাসুজি প্রস্তুতের বর্ণনা করতেন, সে-সৌন্দর্য্যলাভ প্রস্তুতের পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

অপ্রস্তুতে প্রস্তুতে যোগসূত্র রচিত হয় পাঁচভাবে :

(অ) **সামান্য-বিশেষভাব**; (আ) **বিশেষ-সামান্যভাব**; (ই) **কার্য্য-কারণভাব**; (ঈ) **কারণ-কার্য্যভাব**; (উ) **সাদৃশ্যভাব**। এ ছাড়া, আরও দুইভাবের যোগ আছে, যাদের কথা পরে বলব। সামান্য = General; বিশেষ = Particular।

প্রশ্ন উঠতে পারে, অপ্রস্তুত-প্রশংসায় 'প্রশংসা' কথাটার মানে কি? দুটি মানে পাওয়া যায়—(i) প্রশংসা = ব্যঞ্জনা; (ii) প্রশংসা = (বিশদ) বর্ণনা। প্রথম অর্থে: অপ্রস্তুতের দ্বারা **প্রস্তুতের প্রশংসার** (ব্যঞ্জনার) নাম অপ্রস্তুতপ্রশংসা; দ্বিতীয় অর্থে: প্রস্তুতকে ব্যঞ্জিত করতে পারে এমনভাবে **অপ্রস্তুতের প্রশংসার** (বিশদ বর্ণনার) নাম অপ্রস্তুতপ্রশংসা ("অপ্রস্তুতেন প্রস্তুতস্য প্রশংসাব্যঞ্জনম্; যদ্বা, প্রস্তুতব্যঞ্জকম্ অপ্রস্তুতকথনম্ অপ্রস্তুতপ্রশংসা" —সাহিত্যদর্পণের ব্যাখ্যায় তর্কবাগীশ)। দুইয়েরই তাৎপর্য্য অবশ্য এক।

(অ) **সামান্য অপ্রস্তুত থেকে বিশেষ প্রস্তুতের প্রতীতি :**

(i) "সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া-কায়া ধরি ; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির।"—রবীন্দ্রনাথ।

—চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জ্জুনের উক্তি। এতে রয়েছে একটি সামান্য (সাধারণ) সত্যের সুন্দর বর্ণনা। কিন্তু কবির আসল বর্ণনীয় বিষয় এটি নয়; তাই এটি **সামান্য অপ্রস্তুত**। কবির লক্ষ্য, চিত্রাঙ্গদার অনুপম-সৌন্দর্য্যময়ী বাহ্যসত্তার অন্তস্তলচারিণী স্বরূপসত্তাটির দিকে—এই বিশেষ সত্যটিই কবির প্রকৃত ; তাই এটি **বিশেষ প্রস্তুত**। কবি সামান্য অপ্রস্তুতের ব্যঞ্জনায় প্রতীত ক'রে তুলেছেন এই অবর্ণিত বিশেষ প্রস্তুতটিকে। এই কারণে এখানে অলঙ্কার হয়েছে অপ্রস্তুত-প্রশংসা।

(ii) "গোবিন্দ।— জানি,
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য্য।
গুণবতী— মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য্য উঠিবে আবার…"—রবীন্দ্রনাথ।

—এ উদাহরণটির বিশেষত্ব এই যে **গোবিন্দমাণিক্য এবং গুণবতী দুজনের উক্তিতেই অপ্রস্তুত-প্রশংসা। সামান্য অপ্রস্তুত দুপক্ষেই এক—'মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য্য'** ; কিন্তু এই সামান্য অপ্রস্তুত থেকে যে-বিশেষ প্রস্তুতের প্রতীতি হচ্ছে, তা দুপক্ষে দুরকম। রাজার উক্তি দ্যোতনা করছে যে রাজার প্রতি রাণীর প্রেমটাই সত্য এবং শাশ্বত, রোষতপ্ত অভিমান সে প্রেমের উপর একটা ক্ষণস্থায়ী আবরণ ফেলেছে মাত্র। রাণীর উক্তির দ্যোতনা এই যে একটা ক্ষণকালীন মোহ এসে রাজার চিরকালীন ধর্ম্মবিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করেছে ; অচিরকালে রাজার হবে মোহমুক্তি এবং তিনি হবেন প্রকৃতিস্থ।

(iii) "অবলা কুলের বালা আমরা সকলে ;
**কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।**
লও সঙ্গে, শূর, তুমি এই মোরদূতী।"—মধুসূদন।

—শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্যব্যূহের ভিতর দিয়ে লঙ্কাপ্রবেশের জন্য শ্রীরামের অনুমতি-প্রার্থিনী ইন্দ্রজিৎ-পত্নী সুন্দরী প্রমীলার হনুমানের প্রতি উক্তি।

(iv) "কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; **নিশি যবে যায় কোন দেশে,**
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!"—মধুসূদন।

—সীতার প্রতি সরমার এই উক্তিটিকে যদি কোথাও অপ্রস্তুত-প্রশংসার উদাহরণ বলা হ'য়ে থাকে, বিচার ক'রে দেখতে হবে সে সিদ্ধান্ত সঙ্গত কিনা। আমাদের মতে, **মাত্র স্থূলাক্ষর অংশটিতে ('নিশি যবে......সমাগমে') অপ্রস্তুত-প্রশংসা।** এইটুকুর অলঙ্কারব্যাখ্যা শেষ ক'রেই বাকী অংশটার আলোচনা করছি। সীতার মুখে তাঁর বনবাস-জীবনের কথা শুনে সরমারও 'ইচ্ছা করে, ত্যজি রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে'। কিন্তু ওকথা ভাবতে তাঁর মনে ভয় হয়। কেন ভয় হয়? সরমা ভাগ্যহীনা দীনা নারী; তাঁর সমাগমে আনন্দমুখর স্থানও নিরানন্দ হ'য়ে উঠবে। এইটিই কবির **বিশেষ প্রস্তুত।** কিন্তু এ প্রস্তুত-সম্বন্ধে মধুকবি সম্পূর্ণ নীরব থেকে বর্ণনা করেছেন **শুধু সামান্য অপ্রস্তুতটির—**

"নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে।"

এই অংশটুকুতে নিঃসন্দেহে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার, কারণ সামান্য অপ্রস্তুত ব্যঞ্জনায় করেছে বিশেষ প্রস্তুতের প্রতীতি।

কিন্তু **'রবিকর' থেকে 'সে কিরণ' পর্য্যন্ত অংশে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার নাই**; কারণ, প্রস্তুতকে এই অংশটি ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত করছে না, **প্রস্তুত স্বয়ং সুন্দর ভাষারূপ নিয়ে স্পষ্টমূর্ত্তিতে বিরাজ করছে ঠিক পরের বাক্যটিতে—**

"যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী!"

এই প্রস্তুত অংশটি উপমেয়-বাক্য; অপ্রস্তুত 'রবিকর' থেকে 'সে কিরণ' পর্য্যন্ত উপমান-বাক্য; উপমেয়-উপমান বিম্বপ্রতিবিম্বভাবাপন্ন; **অলঙ্কার**

দৃষ্টান্ত। **অপ্রস্তুত-প্রশংসায় মাত্র অপ্রস্তুত বর্ণিত; দৃষ্টান্তে প্রস্তুত অপ্রস্তুত দুইই বর্ণিত।** এই হ'ল এদের অন্যতম পার্থক্য।

(v) 'সুদুর্গম দেশে

কাহারেও নাহি লভি করাইতে পান

আপন যৌবনরস,

পুষ্পে ফলে ঋদ্ধিমতী বনলক্ষ্মী শুকাইয়া যায়'।—শ. চ.

—তপশ্চারিণী পার্ব্বতীর প্রতি ছদ্মবেশী মহেশ্বরের উক্তি। এই সামান্য অপ্রস্তুত থেকে যে বিশেষ প্রস্তুত প্রতীত হচ্ছে তা হ'ল এই—পরিপূর্ণ যৌবনে কঠোর তপশ্চর্য্যার পথে চ'লে পার্ব্বতী আপনাকে যোগ্য পুরুষের পক্ষে দুর্লভা ক'রে তুলেছেন; ফল যৌবনের ব্যর্থতা এবং জরাপ্রাপ্তি।

[উদাহরণটি একটি সংস্কৃত কবিতার মুক্তানুবাদ। কবিতাটি এই :

"যান্তি স্বদেহেষু জরামসংপ্রাপ্তোপভোক্তৃকাঃ।

ফলপুষ্পর্দ্ধিভাজোঽপি দুর্গদেশ-বনশ্রিয়ঃ॥"

—উদ্ভটরচিত 'কুমারসম্ভব'।

অষ্টম শতাব্দীর এই কবিতাটি পড়লে সহজেই মনে প'ড়ে যায় গ্রে সাহেবের

"Full many a flower is born to blush unseen

And waste its sweetness on the desert air."

বলা বাহুল্য, এই **ইংরিজি চরণদুটিতেও অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার**।]

(আ) **বিশেষ অপ্রস্তুত থেকে সামান্য প্রস্তুতের প্রতীতি :**

(vi) "কুকুরের কাজ কুকুর করেছে

কামড় দিয়াছে পায়,

তা' ব'লে কুকুরে কামড়ানো কি রে

মানুষের শোভা পায়?"—সত্যেন্দ্রনাথ।

—অধমের আচরণ উত্তম অনুসরণ করে না এই সাধারণ সত্যটি কবির বক্তব্য বিষয়; তাই এটি **সামান্য** প্রস্তুত। কিন্তু এবিষয়ে নীরব থেকে কবি অবতারণা করেছেন কুকুরঘটিত **বিশেষ** ব্যাপারটির। এই বিশেষ অপ্রস্তুত থেকে প্রতীত হচ্ছে সামান্য প্রস্তুতটির। অলঙ্কার তাই দ্বিতীয় লক্ষণের অপ্রস্তুত-প্রশংসা।

(vii) "অনেক মালতী আছে বাংলা দেশে,—

তারা সবাই সামান্য মেয়ে,

তারা ফরাসি জার্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—দেশবিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের সঞ্চয় যতই থাক, মেয়েদের জীবনের সার্থকতা সেখানে নয়; সার্থকতা নারীত্বে—প্রোস্ফিন্ন শতদলের মতন পূর্ণ-বিকসিত হৃদয়াংশে: এই সামান্য প্রস্তুতটি প্রতীত হচ্ছে বাঙলা দেশের মালতীদের নিয়ে বর্ণিত বিশেষ অপ্রস্তুতটি থেকে।

(ই) কার্য্য অপ্রস্তুত থেকে কারণ প্রস্তুতের প্রতীতি:

(viii) 'প্রেয়সি, বারেক তুমি আসিয়া দাঁড়ালে
লজ্জায় চন্দ্রমা যায় মেঘের আড়ালে,
হরিণী পলায় বনে, সরমে কমল
লুকায় সুনীল জলে, স্তব্ধ পিকদল
চ'লে যায় বনান্তরে, স্বর্ণ ম্লানমুখে
পশে খনিতলে, বিম্ব খসে মনোদুখে।'—শ. চ.

—দেখা যাচ্ছে যে একটি রমণীর আবির্ভাবমাত্র চন্দ্র, হরিণী, কমল, পিকদল, স্বর্ণ, (পক্ব) বিম্ব অর্থাৎ সরসকোমলরক্তবর্ণ পাকা তেলাকুচা ফল সব পালাচ্ছে বা মূর্চ্ছিত হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে যাচ্ছে। সুন্দর ভাষায় ছন্দে এদের কাজগুলিরই রূপ দিয়েছেন কবি। কিন্তু কার্য্যাবলীর এই চিত্রায়ণই কবির মুখ্য অভীষ্ট নয়, অভীষ্ট তাঁর 'প্রেয়সী'র অনুপম রূপসৌন্দর্য্যের প্রশস্তি। এই প্রশস্তিই প্রস্তুত এবং কার্য্যাবলী অপ্রস্তুত। অপ্রস্তুত হ'তে প্রস্তুত-প্রতীতি হচ্ছে দুটি স্তরে: প্রথমতঃ চন্দ্রমা, হরিণী, কমল, পিক, স্বর্ণ আর বিম্ব যথাক্রমে ব্যঞ্জিত করছে রমণীর লাবণ্য, নয়ন, আনন, কণ্ঠধ্বনি, দেহবর্ণ আর অধরকে; পরক্ষণেই প্রতীত হচ্ছে যে এই লাবণ্য, নয়ন প্রভৃতিই চন্দ্রমা, হরিণী প্রভৃতির লজ্জায় দুঃখে পলায়ন, খ'সে পড়ার **কারণ**—এত উৎকৃষ্ট এগুলি যে চন্দ্রমা ইত্যাদির এদের সামনে উপমানের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। **চন্দ্রমাদির কার্য্য অপ্রস্তুত থেকে রমণীর লাবণ্যাদি কারণ প্রস্তুতের প্রতীতি হওয়ায় অলঙ্কার অপ্রস্তুত-প্রশংসা।**

(ix) "তবিল গোলে ঠিকের ভুলে অফিসবাবুর ঝরছে ঘাম,
বড়সাহেব নাম-সহিতে লেখেন নিজের মেমের নাম।
উকিলবাবু টানেন শুধু গুড়গুড়িটে, তামাক নাই,
এজলাসেতেই ভাঁজেন 'কাফী' কড়া হাকিম, দেমাক নাই।

ছাত্র দেখেন Calculus-এ কণ্ব ঋষির পুণ্য বন,
পুঁথির পাতায় পত্র রচেন চতুষ্পাঠীর শিষ্যগণ।"—কালিদাস।

—দেখছি শুধু কাজগুলি; কেমন যেন এলোমেলো সৃষ্টিছাড়া ভাব। ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়—বসন্ত এসেছে। কবিশেখর অপ্রস্তুত কার্য্যাবলীর জীবন্ত বর্ণনার ভিতর দিয়ে প্রস্তুত কারণ বসন্তের দ্যোতনা ক'রে সৃষ্টি করেছেন অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার।

(x) "নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালর উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভাল॥
অধরের তাম্বূল কপোলে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি।
আমাপানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও
নয়ন ভরিয়া দেখি
চাঁচর কেশের চিকণ চূড়াটি
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দূরের দাগ আছে সর্ব্ব গায়,
মোরা হ'লে মরি লাজে॥" —চণ্ডীদাস।

—এখানেও কার্য্য অপ্রস্তুত থেকে কারণ প্রস্তুতের উপলব্ধি। **কারণ**—চন্দ্রাবলীকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের যামিনীযাপন, প্রতিনায়িকা-সম্ভোগ। উক্তিটি শ্রীরাধার।

(ঈ) **কারণ অপ্রস্তুত থেকে কার্য্য প্রস্তুতের প্রতীতি:**

(xi) 'বিদায় মাগিনু যবে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি মোর প্রিয়া
বাষ্পাকুল নেত্রকোণে মোর পানে ক্ষণেক চাহিয়া,
কহিল সে তারি স্নেহে বিবর্দ্ধিত মৃগশিশুটিরে,—
আজ হ'তে মাতা বলি' জেনো, বৎস, আমার সখীরে!'—শ. চ.

—দেশান্তরে না গিয়ে নায়ককে যে গৃহেই অবস্থান করতে হয়েছে এইটেই কবির বক্তব্য ব'লে প্রকৃত বা প্রস্তুত। কিন্তু এই **প্রস্তুত অবস্থানকার্য্যটি**-সম্পর্কে নীরব থেকে কবি **বললেন অপ্রস্তুত কারণটির কথা: 'আজি হ'তে মাতা বলি' জেনো, বৎস, আমার সখীরে।'** এই উক্তিটির তাৎপর্য্য এই যে প্রিয়তমের বিদেশযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই নায়িকার মৃত্যু হবে।

প্রিয়ার মুখে এমন সাংঘাতিক কথা শোনার পর কোনো নায়কের পক্ষে বিদেশ যাওয়া সম্ভব ?

(উ) **অপ্রস্তুত থেকে সদৃশ প্রস্তুতের প্রতীতি :**

(xii) "বিক্রম। * * * * *

নদী ধায়, বায়ু বহে কেমনে কে জানে।
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিণী,
সেই বায়ু জীবের জীবন।

দেবদত্ত। **বন্যা আনে**
সেই নদী ; সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

—মাত্র স্থূলাক্ষর অংশটিতে অপ্রস্তুত-প্রশংসা। (বিক্রমদেবের উক্তির অংশটুকু উদ্ধৃত করেছি মাত্র দেবদত্তের 'সেই নদী'-র প্রসঙ্গ দেখাতে। ওই উদ্ধৃতিতে অপ্রস্তুত-প্রশংসা নাই। তারকাচিহ্নিত অনুদ্ধৃত অংশটির প্রতিবিম্ব-ভাবের উপমান উদ্ধৃত অংশটুকু; অলঙ্কার ওখানে **দৃষ্টান্ত**।) আমাদের স্থূলাক্ষর অংশে অপ্রস্তুতের বর্ণনা ; অপ্রস্তুত এই কারণে যে নদীর বন্যা, বায়ুর ঝঞ্ঝা কবির বর্ণিতব্য নয়। **কবি এই অপ্রস্তুত থেকে প্রতীত করাতে চান নারীর সর্ব্বনাশা রূপের দিকটি। এইটিই প্রস্তুত।** অপ্রস্তুতে প্রস্তুতে **সাদৃশ্য-সম্পর্কটি এখানে এইরকম :** নদী আর বায়ু স্বভাবতঃ কল্যাণকর হ'লেও কখনো কখনো বন্যার, ঝঞ্ঝার রূপে এসে চরম অকল্যাণ ঘটায় ; তেমনি নারী স্বভাবতঃ পুরুষের পরমাশ্রয় হ'লেও কখনো কখনো বিশ্বাসঘাতিনীরূপে পুরুষের সর্ব্বনাশ করে। সুতরাং **অলঙ্কার এখানে সাদৃশ্যভাবের অপ্রস্তুত-প্রশংসা।**

একটা মূল্যবান্ কথা : অনেকে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে (i) থেকে (v) এবং (viii)-চিহ্নিত উদাহরণেও গভীর সাদৃশ্যের ভাব রয়েছে। এ অবস্থায় সাদৃশ্যকে ভিত্তি ক'রে অপ্রস্তুত-প্রশংসার নতুন একটি প্রকারভেদ অসঙ্গত ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু অসঙ্গত নয়। আগের প্রকারচারটিতে সামান্য থেকে বিশেষ, বিশেষ থেকে সামান্য, কার্য্য থেকে কারণ, কারণ থেকে কার্য্য প্রতীত হওয়াই বিশিষ্ট লক্ষণ ; বর্ত্তমান প্রকারভেদে অর্থাৎ **সাদৃশ্যভিত্তিক অপ্রস্তুত-প্রশংসায় প্রস্তুত অপ্রস্তুত দুইই এক লক্ষণের অর্থাৎ অপ্রস্তুত যদি 'বিশেষ' হয়, প্রস্তুতও হবে 'বিশেষ', অপ্রস্তুত 'সামান্য' হ'লে**

প্রস্তুতও হবে 'সামান্য' ইত্যাদি। এমন না হ'লে প্রস্তুতে অপ্রস্তুতে সমধর্ম্মিতা হবে কেমন ক'রে? **আমাদের উদাহরণটিতে (xii) অপ্রস্তুত এবং প্রস্তুত দুইই সামান্য।**

এইবার একটা উদাহরণ দিচ্ছি যাতে **বিশেষ অপ্রস্তুত থেকে বিশেষ প্রস্তুতের প্রতীতি** হচ্ছে :—

(xiii) "মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর।" —মধুসূদন।

—শিবের ধ্যানভঙ্গ করতে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে রতি-প্রসাধিতা পার্ব্বতীর প্রতি মদনের উক্তি। সোনার পাতলা পাতে মোড়া তামাই ('মলম্বা-অম্বরে তাম্র') যখন এমন মনোহর, তখন খাঁটি সোনার কথা আর বলতে হবে কেন? এটি অপ্রস্তুত। এর থেকে প্রতীত **সদৃশ প্রস্তুত হচ্ছে**—মোহিনী-বেশধারী পুরুষ বিষ্ণু যদি বিশ্বের মন টলিয়ে দিতে পারেন, তবে অনিন্দ্যসুন্দরী রমণী তুমি, তোমার এই মোহিনীমূর্ত্তি দেখে বিশ্বের কি অবস্থা হবে, মা, একবার ভেবে দেখ। 'মোহিনীবেশী পুরুষ বিষ্ণু' উপমেয়, 'মলম্বা-অম্বরে তাম্র' উপমান; 'মোহিনী রমণী তুমি' উপমেয়, 'বিশুদ্ধ কাঞ্চন' উপমান; 'বিশ্বের মন টলিয়ে দেওয়া' সাধারণ ধর্ম্ম—এই হ'ল স্থূল বিশ্লেষণ। অপ্রস্তুত প্রস্তুত দুইই **বিশেষ**; প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি প্রতীত। অলঙ্কার সাদৃশ্যসম্পর্কের অপ্রস্তুত-প্রশংসা।

প্রথমেই বলে এসেছি যে প্রধান পাঁচটি প্রকারভেদ ছাড়া অপ্রস্তুত-প্রশংসার **আরও দুটি প্রকারভেদ** আছে। এই দুটির মধ্যে একটিকে পঞ্চমটির প্রকারান্তর বলা যেতে পারে। **পঞ্চমে** অপ্রস্তুত-প্রস্তুতে সম্পর্ক সাদৃশ্যের অর্থাৎ **সাধর্ম্ম্যের**, এইবার যে **নতুন রূপটির** কথা বলতে যাচ্ছি, তাতে অপ্রস্তুত-প্রস্তুতে সম্পর্ক **বৈধর্ম্ম্যের**।

(ঊ) অপ্রস্তুত হ'তে বিসদৃশ প্রস্তুতের প্রতীতি :

(xiv) "ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া॥

(xv) নূপুর হৈয়াছে সোনা কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া॥

(xvi) বনমালা হ'ল পুষ্প কি পুণ্য করিয়া।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া ॥
(xvii) মুরলী হৈল বাঁশ কি পুণ্য করিয়া।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া ॥" —শ্রীরঘুনন্দন।

—উক্তিটি রাধার। বৈধর্ম্ম্য-সম্পর্কের অপ্রস্তুত-প্রশংসার চমৎকার উদাহরণ রয়েছে এখানে। পদখানির উদ্ধৃত অংশে **চারবার** স্বাধীনভাবে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কার হয়েছে। রাধা বলছেন, এই যে ধরণী, সোনা, পুষ্প, বাঁশ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসান্দ্র নিত্যসঙ্গ লাভ ক'রে ধন্য হচ্ছে, এ তাদের বহু পুণ্যের ফল। কিন্তু শুধু এই উক্তিটির মধ্যেই রাধার বক্তব্যের পর্য্যবসান নয়। এই কারণে এই ধরণী, সোনা প্রভৃতির কথা অপ্রস্তুত। এর থেকে প্রতীয়মান প্রস্তুতটি হচ্ছে—ধরণী সোনা পুষ্প বাঁশ পুণ্যবান্, **রাধা পুণ্যহীনা**। এই-খানেই **বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ অপ্রস্তুত-ধর্ম্মের বিপরীত প্রস্তুত-ধর্ম্ম**। শেষ চরণে 'ও'=কৃষ্ণের।

(xvii) উদাহরণটি পড়লেই মনে পড়ে শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে চন্দ্রাবলীর মুরলী-সম্বোধনটি :

"সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং নীরসা গ্রন্থিলাঽসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥"

এখানেও বৈধর্ম্ম্যাত্মক অপ্রস্তুত-প্রশংসা; তাই এটিকে অনুবাদ ক'রে দিলাম—

(xviii) 'হে সখি মুরলি, বিশাল ছিদ্রে পূর্ণা তুমি তো অয়ি,
লঘু তুমি, তুমি অতীব কঠিনা, নীরসা, গ্রন্থিময়ী ;
তবু কৃষ্ণের আনন্দঘন শাশ্বত চুম্বন,
নিত্য নিত্য কোমল করের নিবিড় আলিঙ্গন
লভিছ যে তুমি, বাঁশী,
তোমার মাঝারে উদয় হয়েছে কোন্ সে পুণ্য আসি ?' —শ. চ.

এইবার শেষ প্রকারভেদ—

(ঋ) অসম্ভব অপ্রস্তুত থেকে সম্ভব প্রস্তুতের প্রতীতি :

(xix) 'তুমি কাক আমি কোকিল, বন্ধু, দুজনেই মোরা কালো ;
কাকলী-রসিক মোদের তফাৎ কহিতে পারেন ভালো।' —শ. চ.

—'বড়ো রূপ নয়, গুণ' এই সম্ভব প্রস্তুতটির প্রতীতি হচ্ছে কাককোকিলের আলাপরূপ অসম্ভব্ অপ্রস্তুত থেকে। কাককোকিল তো কথা বলতে পারে না। এদের উপলক্ষ ক'রে একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেন ব'লেই কবি এদের মুখে কথা বসিয়েছেন। এ উদ্দেশ্য না থাকলে এবং তা সিদ্ধ না হ'লে কবির এ প্রয়াস পাগলামি ছাড়া আর কিছুই হ'ত না।

এইভাবের অপ্রস্তুত-প্রশংসার অন্য একটি উদাহরণ :

(xx) "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যত কিছু সুখ সকলি ওপারে।" —রবীন্দ্রনাথ।

২৭। *অর্থান্তরন্যাস*

সামান্যের দ্বারা বিশেষ, বিশেষের দ্বারা সামান্য; কার্য্যের দ্বারা কারণ অথবা কারণের দ্বারা কার্য্য যদি সমর্থিত হয় তাহ'লে হয় **অর্থান্তরন্যাস**।

(সামান্য=General statement; বিশেষ=Particular statement)

'**সমর্থন**' এ অলঙ্কারের বিশেষ লক্ষণ। যেটি সমর্থিত হয় এবং যে সমর্থন করে তাদের যথাক্রমে **সমর্থ্য** আর **সমর্থক** বলা হয়। 'যেহেতু', 'কারণ' ইত্যাদি কথার সাহায্যে সমর্থনটি দেখানো হয় না, ভাবে তাকে বুঝে নিতে হয়। এই কারণে '**সমর্থন**' বাচ্য নয়, **ব্যঙ্গ্য** বা প্রতীয়মান (implied)। এইখানেই অলঙ্কারত্ব। সমর্থ্য বস্তুটি প্রকৃত বা প্রস্তুত; সমর্থক অপ্রকৃত বা অপ্রস্তুত। প্রকারান্তরে বলা যায়, **অর্থান্তরন্যাসে অপ্রস্তুতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট (ভাষায় প্রকাশিত) প্রস্তুতের সমর্থন এবং প্রতীয়মান সমর্থক-অপ্রস্তুত নয়, সমর্থনরূপ ব্যাপারটি অর্থাৎ** corroborator **নয়,** corroboration। এ ছাড়া সমর্থ্য আর সমর্থক কখনো হয় সাধর্ম্য সম্বন্ধের, কখনো হয় বৈধর্ম্য সম্বন্ধের। সামান্যবিশেষ, কার্য্যকারণ, সাধর্ম্যবৈধর্ম্য অপ্রস্তুত-প্রশংসাতেও রয়েছে; তবু ভুল হওয়ার কোনো কারণ নাই, যেহেতু **অপ্রস্তুত-প্রশংসায়** 'সমর্থন' ব'লে কিছু নাই এবং অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুতের প্রতীতি হয় ব'লে সেখানে প্রস্তুতটির ভাষায় উল্লেখ থাকে না। 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কারের সঙ্গে অর্থান্তরন্যাসের গোলযোগ ঘটবার সম্ভাবনা নাই; কারণ **অর্থান্তরন্যাসে** প্রস্তুত-অপ্রস্তুতে সমর্থ্য-সমর্থক সম্বন্ধ, **দৃষ্টান্তে** বিম্বপ্রতিবিম্ব সম্বন্ধ। দৃষ্টান্তে কার্য্যকারণভাব বা সামান্যবিশেষভাব প্রস্তুত-অপ্রস্তুতে একেবারেই নাই।

(অ) সামান্যের দ্বারা বিশেষের সমর্থন :

(i) "হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচসহ নীচ সে দুর্ম্মতি।"—মধুসূদন।

—নীচের সঙ্গে গতিতে মানুষের নীচ হ'য়ে যাওয়াই সামান্য বা সাধারণ নিয়ম। কাজেই, নীচ রামের সহবাসে বিভীষণের নীচ হ'য়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। নীচ রামের সাহচর্য্যে বিভীষণের নীচত্বলাভরূপ বিশেষ ব্যাপারটি সমর্থিত হচ্ছে নীচের সঙ্গে গতির ফলে নীচত্বলাভরূপ সামান্য বা সাধারণ সত্যটির দ্বারা। 'দুর্ম্মতি'-র নীচসহ গতিতে নীচ হওয়া আর বিভীষণের রামসহবাসে বর্ব্বরতা শেখার মধ্যে সাধর্ম্ম্য রয়েছে।

(ii) "মুরলী সরল হ'য়ে বাঁকার মুখেতে র'য়ে
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় সঙ্গদোষে কিনা হয় ॥"

—এখানেও সামান্যের দ্বারা বিশেষ প্রস্তুত (সরল মুরলীর বাঁকার মুখে থেকে বাঁকার স্বভাব শেখা) সমর্থিত। **সামান্য**—"সঙ্গদোষে কি না হয়"।

(iii) "দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরিমুখ হেরইতে সব দূর ভেল ॥
ভণই বিদ্যাপতি আর নাহি আধি।
সমুচিত ঔষধে ন রহ বিয়াধি ॥"

(iv) "রঘুপতি।— পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হ'তে,
আমা হ'তে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য ?
জয়সিংহ।— প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্র পানে…" —রবীন্দ্রনাথ।

—রঘুপতির আশ্রয়ে থেকে জয়সিংহের রাজানুরাগ এবং শিশুর পিতৃকোলে ব'সে পূর্ণচন্দ্রের পানে হাতবাড়ানোর মধ্যে সাধর্ম্ম্য রয়েছে। প্রথমাংশ বিশেষ প্রস্তুত এবং দ্বিতীয়াংশ সামান্য অপ্রস্তুত।

(v) "তপ্ত লোহায় সলিলবিন্দু—নাম খুঁজে পাওয়া দায় ;
পদ্মপাতায় সেই পুন রাজে মুকুতার সুষমায়!

স্বাতী হ'তে পড়ি' শুক্তিতে হয় মুক্তা সে নিরমল।
মন্দ, মাঝারি, ভালো হওয়া—সব সংসর্গেরি ফল।"

—সত্যেন্দ্রনাথ।

(আ) বিশেষের দ্বারা সামান্যের সমর্থন :

(vi) "দুর্য্যোধন।— ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী।
ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম্ম। দুই বনস্পতি
মধ্যে রাখে ব্যবধান ; লক্ষ লক্ষ তৃণ
একত্রে মিলিয়া থাকে বক্ষে বক্ষে লীন।
নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্রবন্ধনে ;
এক সূর্য্য, এক শশী।" —রবীন্দ্রনাথ।

—'ক্ষুদ্র নহে, ঈর্ষা সুমহতী। ঈর্ষা বৃহতের ধর্ম্ম' এই অংশটুকু **সামান্য** অর্থাৎ সাধারণ সত্য (universal truth)। এই সামান্যটি সমর্থিত হচ্ছে 'দুই বনস্পতি মধ্যে রাখে ব্যবধান' আর 'এক সূর্য্য, এক শশী' এই দুই **বিশেষের** দ্বারা **সাধর্ম্ম্যপন্থায়** এবং 'লক্ষ লক্ষ তৃণ' ইত্যাদি আর 'নক্ষত্র অসংখ্য' ইত্যাদি এই দুই **বিশেষের** দ্বারা **বৈধর্ম্ম্যপন্থায়**। অলঙ্কার এখানে নিঃসন্দেহে **অর্থান্তরন্যাস। এটিকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের উদাহরণ কিছুতেই বলা চলে না ; কারণ, এতে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের ঐকান্তিক অভাব রয়েছে।**

(vii) "কলঙ্ক কখনই ঘুচবে না, কারুর কখনই ঘোচেনি ; রাজা যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যাবাদী বলে।"—গিরিশচন্দ্র।

(viii) "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"—কৃষ্ণচন্দ্র।
(আশীবিষ=সর্প)

(ix) "সবই যায়, কিছুই থাকে না ; থাকে শুধু কীর্ত্তি। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে।"—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

(x) "তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গদ্বারে।—
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীপুত্র হ'লো মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্বপূজ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,

কানীনপুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী,…
মুনি হ'লো শুনি সত্যকাম সে জারজ জাবালাশিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাহার মহাপ্রেমিক সে যিশু।"—নজরুল ইস্‌লাম।

('তাদেরও'=বারাঙ্গনাপুত্রদেরও ; 'কানীন'=কুমারী কন্যার গর্ভজাত)

—প্রথম চরণ অর্থাৎ বারাঙ্গনাপুত্রগণও অলৌকিক মহিমা লাভ ক'রে দেবতাদের সমকক্ষ হ'তে পারেন এই **সামান্যটি** সমর্থিত হচ্ছে পরবর্ত্তী পাঁচটি চরণে পাঁচটি **বিশেষের** দ্বারা।

(xi) "এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার ; সর্ব্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার!"—শরৎচন্দ্র।

(ই) কারণের দ্বারা কার্য্যের সমর্থন :

(xii) "নারিনু মা চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি, ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধম পুত্র—মা কি ভুলে তারে ?)"—মধুসূদন।

—মধুসূদন আযৌবন অবহেলা ও ঘৃণা করেছিলেন জননী বঙ্গভারতীকে। তা সত্ত্বেও জননী সস্নেহে কাছে ডেকে নিলেন মধুকে তাঁর যৌবনকালে। এ কাজ মায়ের পক্ষে সম্ভব হ'ল এই কারণে যে পুত্র অবোধ হ'লেও মা তাকে ভুলতে পারেন না। জননীর 'ডাকিলা' **কার্য্যটি সমর্থিত** হচ্ছে শেষ চরণে উল্লিখিত **মায়ের স্বভাবরূপ কারণটির দ্বারা।**

['মেঘনাদবধ'-কাব্যের ভূমিকায় অর্থান্তরন্যাসের উদাহরণরূপে দীননাথ উদ্ধৃত করেছেন,

"কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার ? বুঝিতে না পারি।"

—এখানে সমর্থন কই ? কাকুর দ্বারা সরমা বললেন, পদ্মের পর্ণ কেউ ছেঁড়ে না এবং পরেই বললেন, রাবণ ছিঁড়ল (অর্থাৎ সীতার অঙ্গের অলঙ্কার হরণ করল) কেমন ক'রে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। এর অর্থ যদি এইভাবে করি যে রাবণ সীতাদেহের অলঙ্কার ছেঁড়ে নাই এবং যুক্তি দেখাই পদ্মের পর্ণ কেউ ছেঁড়ে না, তাহ'লে অর্থান্তর হ'তে পারে। কিন্তু অলঙ্কার রাবণই যে হরণ করেছে, এই ধারণাই সরমার—তিনিই একটু আগে বলেছেন "নিষ্ঠুর হায় দুষ্ট লঙ্কাপতি" এবং একটু পরেই সীতা বলছেন "বৃথা গঞ্জ দশাননে

তুমি বিধুমুখী"। কাজেই সমর্থন কেমন ক'রে হয়? এখানে অর্থান্তরন্যাস হয় নাই।]

(xiii) "কাঁদে ব'লে ও'রে ষষ্ঠীর ভোরে গাল দিয়ে কিবা ফল?—
কত না প্রলেপে ধরাবুকে আজও তিনভাগই লোণাজল।"
—যতীন্দ্রনাথ।

—'ওরে'=দুঃখের কবিকে। 'তিনভাগই লোণাজল'=পৃথিবীর একভাগ মাত্র মাটি আর তিনভাগ নোনাজলের সমুদ্র। দুঃখবাদী কবি তো কাঁদবেই; ওর যে মা বসুন্ধরা তারই জীবনে যখন বারো আনা কান্না, তখন ওর পক্ষে কান্না যে জন্মগত অধিকার।

(xiv) "হায়, তাত, উচিত কি তব
একাজ?—নিকষা সতী তোমার জননী!—
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ!—শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ! ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী!" —মধুসূদন।

—লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে এনে নিজবংশের ধ্বংসসাধনরূপ **কার্য্যটির অনৌচিত্য সমর্থন** করতে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে তাঁর বংশগৌরবরূপ কারণটি দেখাচ্ছেন।

(ঈ) কার্য্যের দ্বারা কারণের সমর্থন ঃ

(xv) "দীন্ দুনিয়ার মালিক যেজন তাঁর নাকি বড় ন্যায়বিচার!—
মাম্‌তাজ পায় তাজের শিরোপা, নূরজাহানের কাফন সার!"
—মোহিতলাল।

—'নাকি'-র ব্যঞ্জনা এই যে দুনিয়ার মালিকের বিচারে ন্যায়ের অভাব আছে। এই **অভাবরূপ কারণটি সমর্থিত** হচ্ছে তাঁর মাম্‌তাজ আর নূরজাহানের উপর **বৈষম্যপূর্ণ ব্যবহাররূপ কার্য্য দ্বারা**।

(xvi) "নিজে ভগবান্ শুধিতে সরযূ-যমুনা-তটের ক্রটী,—
গঙ্গার তীরে উঠিলেন ফিরে গৌর-রূপেতে ফুটি।
সাদা কালো শুধু উপরে তফাৎ একথা বিষম ভুল।
খুঁড়িলে দেখিবে, গভীর, কালোর সাদাপ্রিয়তার মূল।"
—যতীন সেন।

—ভগবান্ সরযূতীরে জন্ম নিলেন রাম-রূপে; তাঁর গায়ের রঙ কালো। যমুনাতীরে এলেন কৃষ্ণ হ'য়ে; সেখানেও রঙ তাঁর কালো। কত বড়ো ভুল

করলেন ভগবান্। তাঁর সৃষ্টির মূল তত্ত্বই কালোর সাদা হওয়ার (অন্ধকারের আলোক হওয়ার) বাসনা। ভগবানের সৃষ্টিটাই এই মূল কারণের কার্য্যরূপ। অথচ নিজেই ক'রে বসলেন এত বড়ো ভুল! এ ভুল শোধরাতেই হবে। তাই সাদা হ'য়ে তিনি জন্ম নিলেন গঙ্গার তীরে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। নিজের কার্য্য দিয়ে তিনি সমর্থন করলেন সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যরূপ কারণটিকে।

২৮। ব্যাজস্তুতি

নিন্দা বা **স্তুতির** দ্বারা ব্যঞ্জনায় **যথাক্রমে** যদি **স্তুতি** বা **নিন্দা** বোঝা যায়, তাহ'লে হয় **ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার**।

এ অলঙ্কারে বর্ণনাটি আপাততঃ নিন্দা বা স্তুতি ব'লে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু অর্থবোধে তা স্তুতি বা নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়। সোজা কথায়, এতে নিন্দার ছলে প্রশংসা বা প্রশংসার ছলে নিন্দা বোঝায়। Irony-এর সঙ্গে এর (স্তুতিচ্ছলে নিন্দার) কতকটা মিল আছে। 'কতকটা' বললাম এই কারণে যে Irony-তে বক্তার কণ্ঠধ্বনিতে, বাচনভঙ্গীতে এমন কিছু একটা থাকে, যাতে তার উদ্দেশ্যটি আরও ঝাঁঝালো (Pungent) হ'য়ে ওঠে। এই ক্রূর ভাবটি ব্যাজস্তুতিতে দেখা যায় না। ('Irony' দ্রষ্টব্য)।

(i) "জনম হে তব অতিবিপুলে, ভুবনবিদিত অজের কুলে।
জনকতনয়া বিবাহ করি' ভাসালে তাহাতে যশের তরি॥"

—রামচন্দ্রের প্রতি উক্তি। ভুবনে সকলেরই জানা ছাগ (অজ)-বংশে তোমার জন্ম, খুব বড়ো বংশেরই সন্তান তুমি! সহোদরা ভগিনীকে (জনকতনয়া —পিতার কন্যা) বিবাহ ক'রে একটা কীর্ত্তি রাখলে!—এই নিন্দার্থই আপাততঃ প্রতীয়মান। কিন্তু, ভুবনবিদিত মহৎ অজ (দশরথের পিতা)-বংশে তোমার জন্ম, হরধনু ভঙ্গ ক'রে পত্নীরূপে সীতাকে (জনকতনয়া = মিথিলাপতি জনকের কন্যা) লাভ ক'রে তুমি অতুল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছ—এই প্রশংসার্থে এর পর্য্যবসান। এ উদাহরণটি শ্লেষগর্ভ।

(ii) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ..." ব্যাজস্তুতির একটি চমৎকার উদাহরণ। ('অভঙ্গশ্লেষ' দ্রষ্টব্য।)

[**এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখি: অনেকে, "সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়; কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়" এটিকে ব্যাজস্তুতির উদাহরণরূপে ধরেছেন। ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার-সৃষ্টি**

স্রষ্টার ইচ্ছাকৃত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'সভাজন শুন' ইত্যাদি **দক্ষরাজার ইচ্ছাকৃত শিবনিন্দা**, এর মধ্যে **ব্যাজ** নাই।]

(iii) "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ!" —মধুসূদন।

—এটি প্রশংসার ছলে নিন্দার উদাহরণ। রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছেন। বন্ধনহীন মহাসিন্ধু আজ বন্দী হয়েছে। সেতুকে 'সুন্দর মালা' বলায় যে স্তুতি ব্যক্ত হয়েছে ব্যঞ্জনায় তা বন্ধনার্থক নিন্দা। (রাবণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে সিন্ধুকে বিদ্ধ ক'রে অপমানিত করতে চান নাই। এখানে তাঁর ক্রূরতার চেয়ে অভিমানই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষণীয়: "এই কি সাজে তোমারে অলঙ্ঘ্য, অজেয় তুমি? এই কি হে তোমার ভূষণ, রত্নাকর?" রত্নাকরের মর্য্যাদা এখানে বিধ্বস্ত করা হয় নাই। এইজাতীয় উদাহরণে Irony হয় না।)

এইটির অনুরূপ একটি সংস্কৃত উদাহরণের অনুবাদ ক'রে দিলাম:

(iv) 'রঘুবংশ-অবতংস, যা করেছ যোগ্য সে তোমার—
মিত্ররক্ষা সাধুব্রত যুগে যুগে রয়েছে প্রচার;
বিনা অপরাধে মোরে মিত্রহিতে করিলে সংহার,
ভগবান্, এর চেয়ে মহনীয় কিবা আছে আর?'
—রামচন্দ্রের প্রতি মুমূর্ষু বালীর উক্তি। মিত্র সুগ্রীব।

২১। *স্বভাবোক্তি*

বস্তুস্বভাবের যথাযথ অথচ সূক্ষ্ম এবং চমৎকার বর্ণনার নাম **স্বভাবোক্তি**। 'সূক্ষ্ম' ও 'চমৎকার' বিশেষণদুটি মূল্যবান্।

স্বভাবোক্তি মাত্র Description of nature নয়। যদি শুধু বস্তুস্বভাবের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবী প্রকৃতির বর্ণনাই স্বভাবোক্তি হ'ত, তাহ'লে তাকে সৌন্দর্য্যস্রষ্টা অলঙ্কারের মর্য্যাদা দেওয়া যেত না। কবি যদি সূক্ষ্মদৃষ্টির একাগ্র শিখায় বস্তুবিশেষের স্ব-তন্ত্র বিশিষ্ট লক্ষণটুকু আবিষ্কার ক'রে প্রকাশ করতে পারেন এমনভাবে, যাতে বস্তুটি অন্যবস্তু থেকে পৃথক্ হ'য়ে আপন স্বকীয়তায় সুন্দর এবং উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধ'রে পাঠকের চোখের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে, তবেই তাঁর স্বভাবোক্তি হবে অলঙ্কার। **সত্যকার স্বভাবোক্তিরও সঙ্গে ঘটে রসিক পাঠকের হৃদয়সংবাদ, যার নাম বস্তুসংবাদ** ('অলঙ্কারসর্বস্ব' —রুয্যক)। 'হৃদয়সংবাদ দুরকম—বস্তুসংবাদ আর চিত্তবৃত্তিসংবাদ', বলছেন

জয়রথ ("হৃদয়সংবাদঃ হি বস্তু-চিত্তবৃত্তিগতত্বেন দ্বিবিধঃ। স্বভাবোক্তৌ বস্তু-সংবাদঃ।")।

স্বভাবোক্তির রহস্যটুকু যাঁরা জানেন না বা বোঝেন না, তাঁরাই বলেন স্বভাবোক্তি অলঙ্কার নয়।

(i) 'লাঙ্গুলতাড়িত করি, ক্ষিতিতল নখে বিদারিয়া,
সঙ্কুচিত করি দেহ, শূন্যতলে দ্রুত উল্লম্ফিয়া,
হুঙ্কারে কাঁপায়ে দিশি, সর্ব্বজীবে করি ভয়াকুল,
প্রবেশিল বনমাঝে রক্তচক্ষু ক্রুদ্ধ সে শার্দ্দূল।' —শ. চ.

—ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের অকৃত্রিম কার্য্যাবলির (স্বভাবের) সূক্ষ্ম, চমৎকার বর্ণনা।

(ii) দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কাঁদে অনুরাগে
বুক বহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা॥
আনের ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত
মা হইয়া কেবা বাঁধে কারে।
যে বল সে বল মোরে না থাকিব তোমার ঘরে
এনা দুঃখ সহিতে না পারে॥
বলাই খায়্যাছে ননী মিছা চোর বলে রাণী
ভালমন্দ না করে বিচার।" —বলরাম।

—শিশুস্বভাবের (পরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজে ভালমানুষ সাজার অথচ তার সঙ্গে অভিমানের) মধুর বর্ণনা।

(iii) "কপোতদম্পতী
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।" —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "তৃণাঞ্চিত তীরে
জল কলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে ল'য়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে।" —রবীন্দ্রনাথ।

(v) 'গ্রীবা অভিরাম বাঁকাইয়া পিছে চলমান রথে দৃষ্টি,
ভয়ে সঙ্কোচি' পশ্চাৎকায় বাঁচাইতে শরবৃষ্টি,
শ্রান্তিতে মুখ হ'তে খসে পড়া দর্ভাকীর্ণ পথে,
দেখ, লম্ফনে ভূমে চলে কম—শূন্যেই বহুমতে।'

—কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'।

(বহুমতে=বেশী ক'রে) —(অনুবাদ : পুষ্পেন্দু দাশগুপ্ত)।

—পশ্চাদ্ধাবিত শরাঘাতভীত পলায়মান হরিণের চমৎকার বর্ণনা।

(vi) "পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি।
আস্তে একটু চল্‌না, ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা বকুল, নয় ?···
জ্যৈষ্ঠ আস্‌তে কদিন দেরী ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?
—অনেক দেরী ? কেমন ক'রে হবে!
কোকিলডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া বন্ধ কবে ভাই ;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শেওলা-পিছল—এম্‌নি শঙ্কা লাগে
পা পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!" —যতীন্দ্রমোহন।

—অন্ধবধূ। দর্শনে যে বঞ্চিত, অন্য ইন্দ্রিয়েব সাহায্যে কেমন ক'রে সে বস্তুজগৎকে বোঝে তার চমৎকার সূক্ষ্ম বর্ণনা।

৩০। আক্ষেপ

যে কথাটি বলার ইচ্ছা, বিশেষ এক উদ্দেশ্যসাধনের অভিপ্রায়ে তার উপর নিষেধাভাস করলে অলঙ্কার হয় **আক্ষেপ**।

'আক্ষেপ' কথাটার অর্থ হ'ল **ব্যঞ্জনা**। এই সূত্রে বৈষ্ণবপদাবলীর **আক্ষেপানুরাগের** 'আক্ষেপ' কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে—অনুরাগের প্রকাশরূপটি সেখানে অনুরাগের অনুগত না হ'য়ে বরঞ্চ বিপরীতই হয়, কিন্তু তার ব্যঞ্জনার আলোকে যা উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, তা অনুরাগনামক রতি স্থায়িভাবেরই দিব্যমূর্তি। এটুকু অবশ্য আক্ষেপানুরাগের আংশিক পরিচিতি ; রসতত্ত্বগত বহু জটিলতায় সে বিচিত্রসুন্দর। আক্ষেপানুরাগের 'আক্ষেপ'ও যে ব্যঞ্জনা শুধু এই কথাটাই এখানে জানিয়ে দিলাম। আমাদের আলোচ্যমান

অলঙ্কারের 'আক্ষেপ' খুব উন্নত স্তরের ব্যঞ্জনা নয়; তবু সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শক্তি এর আছে।

বিরোধাভাস অলঙ্কারে 'বিরোধ'টা যেমন সত্য নয়, নিষেধাভাসে 'নিষেধ'টাও তেমনি। **আক্ষেপ অলঙ্কার প্রকৃতপক্ষে নিষেধের দ্বারা বিধির ব্যঞ্জনা; নিষেধটা (Negation অথবা Suppression) অসত্য ব'লে পর্য্যবসানে বিধিটাই (Affirmation) প্রবল হ'য়ে ওঠে।** নিষেধের আভাস মানে সুকৌশলে বিন্যস্ত নিষেধের মায়াজাল, তত্ত্বদৃষ্টিতে যা মিলিয়ে যায় বিধিকে উজ্জ্বলতর ক'রে।

নিষেধাভাস করা হয় দুরকমে—

(ক) **যা বলা হয়েছে তার উপর** আর (খ) **যা বলা হবে তার উপর**। প্রথমটি **উক্তবিষয়ক** আর দ্বিতীয়টি **বক্ষ্যমাণবিষয়ক** নিষেধাভাস।

(ক) উক্তবিষয়ক আক্ষেপ :

(i) 'তুমি চ'লে গেলে বেশীদিন মোর রবে না বিরহব্যথা;
যেতেই হয় তো যাও, প্রিয়তম, **ভেবো না সে সব কথা**।'—শ. চ.

—'ভেবো না সে সব কথা'-য় যে নিষেধটি রয়েছে সে শুধু 'বেশীদিন মোর রবে না বিরহব্যথা'-র তাৎপর্য্যটুকুর সম্বন্ধে প্রিয়তমকে বেশী ক'রে ভাবিয়ে তুলতে: গেলে প্রিয়ার যদি, বলতে নাই, ভালোমন্দ কিছু হয়, দুদিন পরেই না হয় যাওয়া যাবে, ইত্যাকার ব্যাপার।

(ii) "সখিগণ সাহস ছুবই ন পারই তন্তুক দোসর দেহা॥
নবমী দশা গেলি দেখি আয়লি চলি কালি রজনী অবসানে।
আজুক এতিখন গেলি সকল দিন ভালমন্দ **বিহি জানে**॥"
—বিদ্যাপতি।

—সখীরা কেউ ছুঁতেই সাহস করছে না এমনি তন্তুর মতন ক্ষীণ হয়েছে রাধার দেহ। হে কৃষ্ণ, বিরহিণী নবম দশা (মূর্চ্ছা) পেরিয়ে দশম দশায় পড়েছে অর্থাৎ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে দেখে চ'লে এসেছি কাল রাত্রিশেষে। আজ সারাটা দিন কেটে গেল। এতক্ষণ সখীর ভালোমন্দ একটা কিছু—কিন্তু সে জানেন শুধু বিধাতা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ। দূতীর 'আমি জানি না'-রূপ নিষেধাভাসটুকু প্রচ্ছন্ন রয়েছে 'বিহি ('বিধি') জানে'-র মধ্যে। এই প্রচ্ছন্ন নিষেধাভাসই দূতীর উক্তিটিকে কাব্য করেছে; 'নহি জানু' ব'লে স্পষ্ট নিষেধাভাস করলে ফল (effect) এমন সুন্দর হ'ত না। উদাহরণটি চমৎকার।

পাশ্চাত্য **Paraleipsis** আর **Aposiopesis** যথাক্রমে আমাদের আক্ষেপ অলঙ্কারের **উক্তনিষেধাভাস** আর **বক্ষ্যমাণনিষেধাভাসের মতন**; সাদৃশ্যটি সর্ব্বাঙ্গীণ না হ'লেও নিতান্ত কম নয়। **Paraleipsis** হ'ল '*passing over* what is really meant to be strongly declared, *for the sake of effect*' আর **Aposiopesis** হ'ল '*sudden break* in an utterance leaving the sentence incomplete *for the sake of effect*'। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এই দুই লক্ষণের উদাহরণই বেশী মিলছে ব'লে এদুটিকেও আমরা আক্ষেপ অলঙ্কার ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পারি।

Paraleipsis-জাতীয় আক্ষেপের উদাহরণ:

(iii) "নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?—
কিন্তু **নাহি গঞ্জি তোমা**, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য।" —মধুসূদন।

—'নাহি গঞ্জি তোমা' ব'লে ইন্দ্রজিৎ গঞ্জনার উপর নিষেধাভাস করলেন 'গুরুজন তুমি পিতৃতুল্য'-কে গঞ্জিত করার পর।

(iv) "আমি
কেহ নই! হায় অকৃতজ্ঞ! দেবী তোর
কি করেছে? শিশুকাল হ'তে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হ'লে
করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে? হায় কলিকাল! **থাক্**!"
—রবীন্দ্রনাথ ('বিসর্জ্জন' নাটক)।

—বক্তা রঘুপতি, শ্রোতা জয়সিংহ। যা বলবার তা ব'লে, রঘুপতি তাঁর উক্তির উপর টেনে দিলেন একটি 'থাক্'-রূপ নিষেধাভাসের যবনিকা। 'থাক্'=এসব বলা নিষ্ফল মাত্র।

(খ) বক্ষ্যমাণবিষয়ক আক্ষেপ:

(i) 'ক্ষুব্ধ এ হিয়া শান্ত করিয়া
একটি বেদনা জানাইতে শুধু চাই;

ওগো ফিরে চাও ক্ষণেক দাঁড়াও—

না, না চ'লে যাও, পাষাণের কাছে জানাবার

কিছু নাই।'—শ. চ.

—জানাবে স্থির ক'রে প্রিয়তমকে সানুনয়ে ক্ষণকাল অপেক্ষা করতে ব'লে পরক্ষণেই 'জানাবার কিছু নাই' ব'লে তাকে বিদায় দেওয়ায় যা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল, তা নায়িকার দুর্ব্বার অভিমান।

(কবিতাটি একটি প্রাকৃত কবিতার অনুসরণে রচিত)

আরও কয়েকটি অলঙ্কার

এখন যে অলঙ্কারগুলির কথা বলতে যাচ্ছি, তাদের উদাহরণ প্রাচীন এবং আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে, খুব বেশী না হ'লেও, রয়েছে। অলঙ্কারত্বের অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়ে কোনো কোনোটির মূল্য নিতান্ত কম নয়।

১। তুল্যযোগিতা

প্রস্তুত **অথবা** অপ্রস্তুত বস্তুগুলিকে একই ধর্ম্মের (গুণের বা ক্রিয়ার) বন্ধনে বাঁধলে হয় **তুল্যযোগিতা**।

(i) "কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান
কপালে দিয়াছে চুম্ব শিরে দূর্ব্বাধান।"—স্বভাবকবি গোবিন্দদাস।

—সন্তানকে জননীর সস্নেহ আশীর্ব্বাদই এখানে কবির বর্ণনীয় ব'লে প্রস্তুত। এই প্রস্তুতের অঙ্গীভূত **চুম্ব** আর **দূর্ব্বাধানও প্রস্তুত**। এই দুটিকে বন্ধন করা হয়েছে একই ক্রিয়া **'দিয়াছে'**-র দ্বারা।

(ii) "দুই প্রাণে আছে ফুটি
শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা,
একখানি অশ্রুভরে নম্র ভালোবাসা।" —রবীন্দ্রনাথ।

—দ্বিতীয় চরণের দুটি আর তৃতীয়ের একটি এই তিনটি প্রস্তুত বাঁধা পড়েছে একটি 'ফুটি' ক্রিয়ায়।

(iii) "শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার
আর কালান্তক যম—শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ।" —রবীন্দ্রনাথ।

—এক 'রবে' ক্রিয়া বেঁধেছে পাঁচটি প্রস্তুতকে।

(iv) "এই তো দেখিনু অমনি সে রাঙা মিনুর চরণতল,
আর রাঙা তার মধুর দুখানি ঠোঁট,
আর রাঙা তার মদির আঁখির কোণা,
আর রাঙা তার—তবুও প্রলাপ? স্বপনবিলাসী ওঠ,
মিনু কে? শুধুই মিথ্যার জাল বোনা।"
—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

—এখানে প্রস্তুত মিনুর চরণতল, ঠোঁট, আঁখির কোণা বাঁধা পড়েছে একই বিশেষণ 'রাঙা'-র বন্ধনে।

এইবার **অপ্রস্তুত-বন্ধনের** উদাহরণ :

(৮) "শুনেছি, রাক্ষসপতি মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে ;···
···কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এহেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে !" —মধুসূদন।

—এখানে 'কোদণ্ড-টঙ্কার'ই হ'ল প্রস্তুত এবং ব্যঞ্জনায় উপমান-স্থানীয় 'মেঘের গর্জ্জন', 'সিংহনাদ' আর 'জলধির কল্লোল' অপ্রস্তুত। এই অপ্রস্তুত-তিনটিকে বাঁধা হয়েছে এক 'শুনেছি' ক্রিয়ায়।

২। *দীপক*

প্রস্তুত **এবং** অপ্রস্তুত দুটিকেই একই ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধলে হয় **দীপক** অলঙ্কার।

ধর্ম্ম দীপের মতন প্রস্তুত অপ্রস্তুত দুটিকেই আপন শিখায় আলোকিত ক'রে **উভয়ের ঔপম্যকে প্রতীয়মান অর্থরূপে প্রকাশ করে** ব'লে অলঙ্কারটির নাম **দীপক**।

ধর্ম্মের বন্ধন **তুল্যযোগিতা**তেও রয়েছে ; তবে সেখানে বাঁধা পড়ে **হয় প্রস্তুত, না হয় অপ্রস্তুত** আর **'দীপক'** অলঙ্কারে বাঁধা পড়ে **প্রস্তুত অপ্রস্তুত দুটিই**। পার্থক্যটুকু স্মরণীয়।

(i) "শক্তির আধার বটে নদী আর নারী
পিপাসাবারিণী জীবনদায়িনী।" —অমৃতলাল।

—প্রস্তুত 'নারী' আর অপ্রস্তুত 'নদী' পিপাসাবারণ আর জীবনদানরূপ একই ধর্ম্মে বদ্ধ হয়েছে।

(ii) "অসির ধার আর বনিতার লজ্জা পরের জন্য, কি বলেন পণ্ডিনায়ক ?"
—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

—প্রস্তুত 'অসির ধার' (অসির ধারপরীক্ষাই এই উক্তির অবকাশ ঘটিয়েছে ব'লে), অপ্রস্তুত 'বনিতার লজ্জা' দুটিকেই বেঁধেছে 'পরের জন্য' (পরার্থত্ব) এই ধর্ম্মটি।

(iii) "সময় সমীর নীর, দেখ, বৎস, নহে স্থির।" —গিরিশচন্দ্র।

—প্রস্তুত 'সময়' আর অপ্রস্তুত 'সমীর', 'নীর' ; বন্ধনকারী ধর্ম্ম 'নহে স্থির' (অস্থিরতা)।

(iv) "সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জ্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডবভ্রাতারে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—প্রস্তুত 'পাণ্ডবভ্রাতা' এবং অপ্রস্তুত 'পালিত মার্জ্জার' আর 'দ্বারের কুক্কুর' দুই পক্ষই বাঁধা পড়েছে প্রীতিবিতরণ ক্রিয়ারূপ ধর্ম্মের দ্বারা।

(v) "উর্দ্ধশ্বাসে রথ-অশ্ব চলিয়াছে ধেয়ে
ক্ষুধা আর সারথির কশাঘাত খেয়ে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—প্রস্তুত 'সারথি', অপ্রস্তুত 'ক্ষুধা'; বন্ধনরজ্জু 'কশাঘাত'।

(vi) "শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে" —রবীন্দ্রনাথ।

—'নারী' প্রস্তুত কারণ রাণী সুমিত্রা এখানে উপলক্ষ।

(vii) "যম আর প্রেম
উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্বভূতে।" —রবীন্দ্রনাথ।

এ ছাড়া **অন্য একরকম দীপক** আছে :

একই কারকের বহু ক্রিয়া থাকলে দীপক হয়।

(viii) "নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে **ছেয়ে চেয়ে থাকে** সদা,
তবে তার সার্থক জনম।" —রবীন্দ্রনাথ।

'এক কারকের বহু ক্রিয়া'-লক্ষণের দীপক অলঙ্কারের উদাহরণ বাঙলা সাহিত্যে অজস্র।

৩। *সহোক্তি*

উপমেয় উপমানের একটিকে প্রাধান্য দিয়ে সহার্থক শব্দপ্রয়োগে যদি দুটিকে বাঁধা হয়, তাহ'লে **সহোক্তি** হয়।

(i) "চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।" —চণ্ডীদাস।

—রাধা স্নানান্তে নীলশাড়ী নিঙ্ড়াতে নিঙ্ড়াতে যাচ্ছেন; সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের প্রাণ মোচ্ড়াতে মোচ্ড়াতে যাচ্ছেন। এই মোচ্ড়ানো অর্থটি নিঙ্ড়ানো থেকে প্রতীত হচ্ছে 'সহিতে' শব্দের বলে।

(ii) "মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণ মৃণাল **সাথে** মিশি নেমে গেছে
অগাধ অসীমে।" —রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "এখনো যে ছায়ায় নাচে
চোখের তারা ঢেউয়ের **সাথে**।" —মোহিতলাল।

(iv) "তব জলকল্লোল **সহ** কত সেনা
গরজিল কোনদিন সমরে ও।" —গোবিন্দচন্দ্র রায়।

(v) "হৃদয়-স্পন্দন **সনে** ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময়।" —অক্ষয় বড়াল।

(vi) "মোর দুই নেত্র হ'তে অশ্রুবারিরাশি
উদ্দেশে তোমারি শিরে উচ্ছ্বসিল আসি
অভিষেক **সাথে**।" —রবীন্দ্রনাথ।

(vii) "গত বসন্তের যতো মৃতপুষ্প **সাথে**
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু,
আদরে মরিত তবে।" —রবীন্দ্রনাথ।

৪। অনন্বয়

একই বস্তু উপমেয় এবং উপমান দুইই হ'লে **অনন্বয়** হয়।

(i) "অতিখল অতিছল অতীব কুটিল—
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল।"—গিরিশচন্দ্র।

(ii) "বহুর মাঝারে সেই একজন,
এক সে দেহের একটি গঠন—
তার যাহা কিছু তাহারি মতন"—মোহিতলাল।

৫। শ্লেষ (অর্থ)

—যেখানে শব্দসকল দুই অর্থ প্রকাশ করে, অথচ শব্দপরিবর্ত্তনেও অলঙ্কার অক্ষুণ্ণ থাকে, সেখানে **শ্লেষ (অর্থশ্লেষ)** হয়।

(i) 'অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরে ব্যাপ্ত আছে যেবা,
তাহারে দেখান যিনি, গুরু তিনি, কর তাঁর সেবা।'—শ. চ.

—এক অর্থে, অখণ্ডমণ্ডলাকারচরাচরব্যাপী ঈশ্বরকে যিনি দেখান, সেই গুরুর সেবা কর। অন্য অর্থে, যা খণ্ড নয়, গোলাকার, জগতের সর্ব্বত্র যা আছে (অর্থাৎ টাকা), তাকে যিনি দেখান (উপার্জ্জনের পথ বাত্‌লে দেন) সেই গুরু (স্কুলকলেজের মাষ্টারমশায়), তাঁর সেবা কর।

এখানে 'অখণ্ডমণ্ডলাকার'কে পরিবর্ত্তন ক'রে এর সমানার্থক (Synonym) 'অভগ্নগোলাকার' বসালেও অলঙ্কার থাকে।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর, যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর?" শব্দশ্লেষের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত এটির ঈশ্বর, গুপ্ত, প্রভাকরকে যদি যথাক্রমে ভগবান্, লুক্কায়িত, সূর্য্য করি তাহ'লে অলঙ্কার থাকে না। শব্দশ্লেষ অর্থশ্লেষ দুটির পার্থক্য এইখানে।

৬। পরিবৃত্তি

দুই বস্তুর বিনিময় **পরিবৃত্তি** অলঙ্কার।

(i) "তুমি হেন ধন দিয়াছি যৌবন
কিনেছি বিশাখা জনে।"—চণ্ডীদাস।

—যৌবন-বিনিময়ে রাধা কৃষ্ণকে ক্রয় করেছেন। অলঙ্কারের উদ্দেশ্য মাধুর্য্য-সম্পাদন। টাকা দিয়ে ধান কিনলে অলঙ্কার হয় না।

(ii) "স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা।" —মধুসূদন।

(iii) "কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি।" —মধুসূদন।

(iv) "আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলঙ্কার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজদেহে।" —রবীন্দ্রনাথ।

(v) "তোমার অম্লান রূপ—চেয়েছিনু আমি
ধরণীর পতি, তুমি তাই পণ দিয়ে
জিনিয়া লইলে মোর কৌমার অতুল।"—মোহিতলাল।

—'তুমি' উর্ব্বশী ; 'আমি' পুরূরবা।

৭। সমাধি

সহসা কারণান্তরের আবির্ভাবে কোনো কাজ যদি আপনিই সিদ্ধ হ'য়ে যায়, তাহ'লে **সমাধি** অলঙ্কার হয়।

(i) 'যেম্‌নি প্রিয়ার মান ভাঙাতে ধরব শ্রীচরণ,
শ্রাবণমেঘে অম্‌নি হ'ল প্রচণ্ড গর্জ্জন!'—শ. চ.

—প্রিয়া অম্‌নি ভয়ে নায়ককে জড়িয়ে ধরলেন। মান শেষ!

৮। ভাবিক

অতীত বা অনাগত ব্যাপার প্রত্যক্ষবৎ বর্ণিত হ'লে **ভাবিক অলঙ্কার** হয়। Vision-এর সঙ্গে এর মিল আছে।

(i) "অন্ধকার যমুনার তীর,—
নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা,
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জকুটির ;
অনুক্ষণ দর দর বারি ঝরে ঝর ঝর
তাহে অতি দূরতর বন,—
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দ্বার সঙ্গে কেহ নাহি আর
শুধু এক কিশোর মদন।" —রবীন্দ্রনাথ।

—অন্ধকার বর্ষারাত্রে রাধার অভিসার প্রত্যক্ষবৎ বর্ণিত। ক্রিয়াপদে বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

(ii) "আমি হেরিতেছি, বন্ধু,—ভবিষ্যের ছায়াপথ বাহি'
এই তব বিদ্রোহিণী প্রিয়ার নবীন অভিসার।
হেরিতেছি—
তুমি আছ ধ্যানমগ্ন হিমাদ্রিশিখরে ;
তোমারি সম্মুখে বসি তরুণী কুমারী তপস্বিনী
নতজানু, কৃতাঞ্জলি।..." —শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

৯। পর্য্যায়

একই বস্তু **একই** সময়ে ক্রমে ক্রমে **বহু** আধারে পতিত হ'লে হয় **পর্য্যায়** অলঙ্কার।

ক্রমে ক্রমে = পর্য্যায়ক্রমে।

এইটি **'পর্য্যায়'** অলঙ্কারের **প্রথম** প্রকারভেদ।

দ্বিতীয় প্রকারভেদে—**একই** বস্তু পর্য্যায়ক্রমে **বহু** আধারে পতিত হয় **বিভিন্ন কালে।**

তৃতীয় প্রকারভেদে—**বিভিন্ন** বস্তু **একই** আধারে পতিত হয় **বিভিন্ন কালে।**

প্রথমটির উদাহরণ :

(i) "পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু'পরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে—সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে।" —রবীন্দ্রনাথ।

(ii) **পর্য্যায়ের** আর একটি উদাহরণ **সঙ্কর** অলঙ্কার (i)।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ :

(iii) 'আগে তুমি ছিলে সিন্ধুহৃদয়ে মগ্ন
এলে মহেশের কণ্ঠে তাহার পর,
এখন রয়েছ খলের বচনে লগ্ন—
কালকূট! তুমি কেন হেন যাযাবর?'—শ. চ.

—আধেয় বস্তু একটি : কালকূট, আধার তিনটি : সিন্ধুহৃদয়, মহেশকণ্ঠ আর (খলের) বচন, কালও তিনটি : আগে, (তাহার) পরে আর এখন।

তৃতীয়টির উদাহরণ :

(iv) 'কাল যে-কণ্ঠে চলেছিল মোর বাণীর মহোৎসব—
অয়ি প্রিয়া! অয়ি মানসী! কান্তা! নিরুপমা! মধুময়ী!
সে-কণ্ঠে শুধু ধূসর গদ্য 'ওগো, হ্যাগো' আজ জয়ী—
এই তো জীবন, স্বপ্ন, কবিতা নিছক মিথ্যা সব।'—শ. চ.

("যত্রৈব মুগ্ধেতি……মহোৎসবোঽভূৎ" ইত্যাদি সংস্কৃত কবিতাব ছায়ায়।)

১০। *সামান্য*

গুণের সাদৃশ্যে প্রকৃত যদি অপ্রকৃতের সঙ্গে অভেদে মিশে যায়, তাহ'লে হয় **সামান্য অলঙ্কার।**

(i) "কালো জলে কালো তনু লখিতে না পারি গো,
ছুঁইয়া করিল জাতিনাশ।"—কানুদাস।

—প্রকৃত কালো তনু (কৃষ্ণেব) অপ্রকৃত কালো জলে (যমুনার) অভিন্নভাবে মিশে গেছে।

(ii) "নীল নলিনীদল তনু অনুরঞ্জই নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণ ভুজযুগে মণ্ডিত পহিরলি নীল নিচোর॥
হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে গোরী ভেল শ্যামরী কুহুযামিনী ভয় ভাগি॥
নীল অলকাকুল অলকই লোলিত নীল তিমিরে চলু **গোই**।"
—গোবিন্দদাস।

—গৌরবর্ণা রাধা নীল বসনভূষণ প্রভৃতিতে আপনাকে নীল করেছেন। এর ফলে কুহুযামিনীর (অমাবস্যার রাত্রির) সঙ্গে তিনি অভিন্ন হ'য়ে গেছেন। গোই = গুপ্ত হ'য়ে, লুকিয়ে, মিশে।

(iii) "আমি যে দেখেছি ওই চুলরাশ
রুমাল খুলিয়া পড়িত খ'সে—
একাকার হ'তো ঝিনুকবসানো
আব্‌লুশে গড়া তখ্‌তপোষে!"—মোহিতলাল।

১১। অনুকূল

প্রতিকূল বস্তু যদি অনুকূল হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে **অনুকূল অলঙ্কার** হয়।

(i) "অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড।" —ভারতচন্দ্র।
(জয়দেবের 'ঘটয় ভুজবন্ধনম্'-এর অনুকৃতি)

—বিদ্যার প্রতি সুন্দরের উক্তি। রজ্জুবন্ধনরূপ দণ্ড নিশ্চয় প্রতিকূল (অবাঞ্ছিত)। কিন্তু এ রজ্জু প্রিয়ার বাহু এবং দণ্ডটি হ'চ্ছে আলিঙ্গন—এর চেয়ে অনুকূল (বাঞ্ছিত) আর কি আছে?

১২। মালাদীপক

কোনো বস্তু যদি একই ধর্মের দ্বারা উত্তরোত্তর সম্বদ্ধ হয়, তাহ'লে হয় **মালাদীপক**।

(i) "ভাবে মোহান্ধ জন,—
কেমনে তাহারে পার করে, যেবা পার করে ত্রিভুবন!"
—যতীন্দ্রমোহন।

—বসুদেব কি ক'রে শিশু কৃষ্ণকে যমুনার পার করবেন তাই ভাবছেন। একই ধর্ম (পার করা-রূপ ক্রিয়া) উত্তরোত্তর ত্রিভুবনকে এবং 'তাহারে' (কৃষ্ণকে) সংবদ্ধ করেছে।

(ii) "হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন!"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "সভজন কানু কানু করি ঝুরএ,
সো তুয় ভাববিভোর।"—বিদ্যাপতি।

'কানু কানু করি নিখিল কাঁদিয়া মরে,
সেই কানু আজ কাঁদিছে তোমার তরে!'—শ. চ.

'তুয়'=তোমার (রাধার)।

(iv) "যুগে যুগে পুণ্য খোঁজ, পুণ্য আজি তোমায় চায়"—সত্যেন্দ্রনাথ।

১৩। তদ্‌গুণ

স্বগুণত্যাগে উৎকৃষ্ট গুণগ্রহণের নাম **তদ্‌গুণ**।

(i) "সোঙরি সোঙরি তুহার নাম,
সোনার বরণ হৈল শ্যাম।"—চণ্ডীদাস।

সোঙরি=স্মরণ ক'রে, তুহার=তোমার (রাধার)।

"জানি কার রূপসাগরে ডুব দিয়ে ও
গৌর হয়েছে।"—কৃষ্ণকান্ত (বাউল)।

—কার=রাধার; ও=কৃষ্ণ। রাধারূপের সায়রে স্নান ক'রে শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হয়েছেন। স্মরণীয়:

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।" —স্বরূপ গোস্বামী।

১৪। সূক্ষ্ম

আকারে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির বোধগম্য নয় এমন সূক্ষ্মবস্তু-বোধে হয় **সূক্ষ্মালঙ্কার**।

(i) 'কখন মিলন হবে শুধানু যখন,
হাসি প্রিয়া লীলাপদ্ম কৈল নিমীলন।'—শ. চ.

—পদ্ম নিমীলিত (মুদ্রিত) হয় রাত্রিতে। রাত্রিই মিলনকালরূপে সঙ্কেতিত হ'ল।

(ii) "খুল্‌ছে নাকো ফিতার গিরা—ফাঁসটি ধ'রে টানে,
অম্‌নি চুড়ী বালার পরে কি ঝঙ্কারই হানে!
অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌নু চেয়ে চোরের চতুরালি,
দুষ্টু চুড়ীর দুষ্টামি সে নূতন দূতিয়ালি!"—মোহিতলাল।

১৫। ব্যাজোক্তি

কোনো গোপনীয় ব্যাপার কাজে প্রকাশ হ'লেও ছল ক'রে তা গোপন করলে **ব্যাজোক্তি অলঙ্কার** হয়।

(i) "তঁহি পুন মোতিহার টুটি ফেলল **কহত হার টুটি গেল**।
সভজন এক এক চুণি সঞ্চরু শ্যামদরশ ধনি কেল ॥"—বিদ্যাপতি।

—রাধা যমুনা হ'তে স্নান ক'রে আসছেন ; সঙ্গে আছে সখীরা এবং শ্বাশুরী-ননদিনী। সম্মুখে কৃষ্ণ। তাঁকে ভালো ক'রে দেখতে হবে কিন্তু ননদিনী "বিষের কাঁটা"। স্থির করলেন, হারটা ছিঁড়ে ফেললে তার চুণিপান্নাগুলো সকলেই কুড়িয়ে নিতে ব্যস্ত থাকবে, সেই অবকাশে প্রাণ ভ'রে রাধা কৃষ্ণদর্শন করবেন। এই ভেবে ইচ্ছা ক'রে নিজেই হার ছিঁড়ে ফেললেন ; অথচ বললেন আপনি ছিঁড়ে গেল। হার ছিন্ন, মণিমুক্তা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—এই কার্য্যটি সকলের দৃষ্টিগোচর হ'ল। রাধার মনোভাবটি সখীদের বুঝতে বাকী রইল না। কিন্তু সত্য গোপন ক'রে ছল ক'রে বললেন, হার আপনি ছিঁড়ে গেছে।

(এই গানটি এক সখীর প্রতি অন্যসখীর উক্তি।)

সংস্কৃতে একটি অতিসুন্দর উদাহরণ আছে। তার মুক্তানুবাদ ক'রে দিচ্ছি :

(ii) 'কন্যাসম্প্রদানলগ্নে গিরিরাজ পার্ব্বতীর কর
শম্ভুকরে সমর্পিতে রোমাঞ্চিত শম্ভুকলেবর,
ঈষৎ হাসিয়া ভূতনাথ
অমনি কহিলা, অহো, কি শীতল হিমাদ্রির হাত!'

১৬। রশনোপমা

উপমেয় যদি পর পর উপমান হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে **রশনোপমা** অলঙ্কার হয়।

রশনা=মেখলা, কটিতটের চন্দ্রহার।

(i) 'কজ্জলসম কালো কুন্তল, কুন্তলসম মেঘের রাশি,
মেঘের মতন কালো জলে, প্রিয়ে, বিম্বিত তব মোহন হাসি।'
—শ. চ.

১৭। উপমেয়োপমা

উপমেয়-উপমান যদি পরে যথাক্রমে উপমান-উপমেয় হ'য়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে **উপমেয়োপমা** হয়।

(i) 'তোমার দীপ্তি চপলার মতো, চপলা তোমার দীপ্তিসম।'—শ. চ.

—প্রথমাংশে উপমেয় দীপ্তি দ্বিতীয়াংশে উপমান হয়েছে আর প্রথমাংশের উপমান চপলা দ্বিতীয়াংশে উপমেয় হয়েছে।

[উপমেয়োপমার তাৎপর্য্য এই যে এতে মাত্র দুটি বস্তুই পরস্পরের তুলনায় উপযুক্ত, তৃতীয় কিছুরই সঙ্গে তুলনা চলে না। চপলার মতন দীপ্তি এবং দীপ্তির মতন চপলা; জগতে আর কিছুই এদের মতন নয়। যদি বলি, '**তন্বী** প্রিয়া চপলার প্রায়, চপলা সে **গৌরী** প্রিয়াসম', প্রথমাংশের উপমেয় 'প্রিয়া' দ্বিতীয়াংশে উপমান হওয়ায় উপমেয়োপমার লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে ব'লে আপাততঃ মনে হ'লেও বিচারে দেখা যায় প্রিয়া এবং চপলা পরস্পরের সঙ্গে তুলিত হয়েছে বিভিন্ন সাধারণ ধর্ম্মের (তন্বীত্ব এবং গৌরীত্ব) ভিত্তিতে। আরও সাধারণ ধর্ম্ম থাকতে পারে, যেমন কোমলতা; সে ক্ষেত্রেও প্রিয়ার সঙ্গে ফুলের তুলনা সম্ভব। **কাজেই অলঙ্কার উপমেয়োপমা নয়, পরস্পরোপমা।**]

১৮। অধিক

আবার আধেয় অর্থাৎ আশ্রয় আশ্রিত যদি পরস্পরের অযোগ্য হয়, তাহ'লে হয় **অধিক** অলঙ্কার।

(i) "সিংহ প্রতি কহে, 'বধ রে বধ রে',
আদরেতে হাসি না ধরে অধরে।" —দাশরথি।

—আধার অধর আধেয় হাসিকে ধরতে অসমর্থ, কাজেই অযোগ্য।

(ii) "এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে।"—জ্ঞানদাস।

(iii) "বকুলের অতিঘনবিন্যস্ত মধুবশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

(iv) "দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে।"—রবীন্দ্রনাথ।
(এইটি প্রথম উদাহরণের মতন)

১৯। অনুমান

বিচ্ছিত্তির দ্বারা, ব্যাপ্য-জ্ঞান থেকে ব্যাপক-জ্ঞানের নাম **অনুমান** অলঙ্কার।

—'বিচ্ছিত্তি' = সৌন্দর্য্য; এখানে সাধারণভাবে অলঙ্কার। 'বিচ্ছিত্তির দ্বারা' = অন্য অলঙ্কারের যোগে। সহজ কথায় বলা যায়ঃ হেতু বা কারণ থেকে

কার্য্যের জ্ঞান হ'লে এবং তা অন্য অলঙ্কারের যোগে চমৎকার হ'লে, **অনুমান** অলঙ্কার হয়।

(i) 'মনে হেন অনুমানি
হৃদয়ে তোমার উদিয়াছে প্রিয়-বদন-চন্দ্রখানি ;
তাহারি কিরণে অঙ্গ তোমার পাণ্ডুতামণ্ডিত,
তন্বী, তোমার নয়নকমল সেও দেখি নিমীলিত।'—শ. চ.

—(বিরহিণীর) দেহের পাণ্ডুতা এবং নয়নপদ্মের মুদ্রিত হওয়া থেকে অনুমান হচ্ছে যে তার হৃদয়ে তার প্রিয়তমের মুখচন্দ্র উদিত হয়েছে। এখানে রূপক অলঙ্কারের যোগ রয়েছে। কারুর চোখের জল থেকে তার দুঃখের অনুমানে অলঙ্কার হবে না; কারণ সেখানে অন্য অলঙ্কারযোগে চমৎকারিতা নাই। বিচ্ছিত্তির অর্থ তর্কশাস্ত্রের অনুমান থেকে অলঙ্কার অনুমানকে পৃথক্ করা।

২০। *অন্যোন্য*

দুটি বস্তু পরস্পরের কারণ হ'লে **অন্যোন্য** অলঙ্কার হয়।

(i) 'রজনীর শোভা চন্দ্রে আবার চন্দ্রের শোভা নিশি-আকাশে ;
কৃষ্ণের পাশে রাধার মাধুরী কৃষ্ণমাধুরী রাধার পাশে।'—শ. চ.

(ii) 'স্তনবন্ধুর কণ্ঠে উমার মুক্তাপাঁতির হার ;
কণ্ঠ মালিকা পরস্পরের মধুর অলঙ্কার।'—শ. চ.
('কুমারসম্ভবে'র একটি শ্লোকের অনুসরণে)

(iii) "সোনার হাতে সোনার চুড়ী
কে কার অলঙ্কার ?"—মোহিতলাল।

২১। *বিচিত্র*

অভীষ্ট ফলের উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধ কাজ করার নাম **বিচিত্র**।

(i) 'ভৃত্য ছাড়া কোন্ মূঢ় নত হয় উন্নতির লাগি,
বাঁচিতে জীবন দেয়, সুখ হেতু দুঃখ লয় মাগি ?'—শ. চ.

২২। *পরিসংখ্যা*

প্রশ্ন এবং তার উত্তরদানপ্রসঙ্গে অন্য সম্ভাব্য উত্তরের নিষেধে **পরিসংখ্যা অলঙ্কার** হয়।

(i) 'করের ভূষণ ? বঁধুয়ার সেবা, নহে মাণিকের বালা।
কণ্ঠভূষণ ? বঁধুগুণগান, নহে মুক্তার মালা।'—শ. চ.

দ্বিতীয়প্রকার **পরিসংখ্যা**ঃ

প্রশ্নোত্তরের প্রসঙ্গ নাই এমন ক্ষেত্রে দুই সম্ভাব্য বস্তুর মধ্যে একটির গ্রহণে এবং অন্যটির বর্জনেও **পরিসংখ্যা অলঙ্কার** হয়।

(ii) "শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয়॥"—রঙ্গলাল।

—প্রথম শ্রুতি=কান, দ্বিতীয় শ্রুতি=বেদ, লক্ষণায় বিদ্যা।

২৩। *ব্যাঘাত*

একজন কোনো বিশেষ উপায়ে যে কাজ নিষ্পন্ন করে, আর একজন যদি ঠিক সেই উপায়েই সেই কাজ ব্যর্থ ক'রে দেয়, তবে অলঙ্কার হয় **ব্যাঘাত**।

(i) 'দৃষ্টিদগ্ধ মনসিজে তোমার দৃষ্টির পরশনে
পলকে জাগাতে পার, হে সুন্দরী, নবীন জীবনে ;
মহেশ্বরবিজয়িনী, অয়ি চারুলোচনা, তোমার
চরণে কবির নমস্কার।'—শ. চ.
(সংস্কৃতের ছায়ায় রচিত)

—মহেশ্বর দৃষ্টি দিয়ে কামকে ভস্ম করেছিলেন; সুন্দরী ঠিক সেই উপায়েই অর্থাৎ আপন চারুনয়নের দৃষ্টি দিয়েই কামকে নবজীবনে উজ্জীবিত করতে পারেন।

২৪। *সমুচ্চয়*

একটিমাত্র কারণ যেখানে কার্য্যসাধনে সমর্থ, সেখানে (ছোট বড়ো) আরও কারণের সমাবেশ হ'লে **সমুচ্চয় অলঙ্কার** হয়।

(আগে অর্থাপত্তি অলঙ্কারে দণ্ডাপূপিকান্যায়ের কথা বলেছি। এখানে **খলে কপোতিকান্যায়** অর্থাৎ যেমন একটি খলে ছোলা দিলে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত বহু পায়রা এসে একসঙ্গে খায়, তেমনি একটি কার্য্যে বহু কারণের সমাবেশ।)

(i) 'জনম চন্দনাচলে, বিশ্বখ্যাত দাক্ষিণ্য তোমার,
গোদাবরীস্নিগ্ধবারি তুমি অতি পরিচিত তার,
হে ধীর সমীর, মোরে তুমিও এমনি যদি দহ,
মত্ত কৃষ্ণ বনচর কোকিলেরে কি বলিব, কহ ?'—শ. চ.

—দেহ স্নিগ্ধ করতে বায়ুর মলয়াচলে জন্মরূপ একটি কারণই যথেষ্ট ; তবু আরও সদ্‌গুণের যোগ ঘটেছে—দাক্ষিণ্য, গোদাবরীবারিস্পর্শ। এগুলি

সদ্‌গুণের যোগ। আর কোকিল? সে মাতাল, কালো, বন্ধ (অসদ্‌গুণের যোগ), সে তো আমাকে দগ্ধ করবেই।

[লক্ষণীয় যে এখানে **অর্থাপত্তি অলঙ্কারও** রয়েছে। এত সদ্‌গুণ সত্ত্বেও সমীরণ যখন বিরহিণীকে দগ্ধ করছে, তখন অসৎ কোকিল তো করবেই। **সমুচ্চয় এবং অর্থাপত্তির সঙ্কর**। **'সঙ্কর'** দ্রষ্টব্য।]

২৫। *বিশেষ*

(ক) বিনা আধারে যদি আধেয় বস্তু থাকে,

অথবা

(খ) একই সীমাবদ্ধ বস্তু যদি একই সময়ে বিভিন্ন আধারে থাকে, তাহ'লে **বিশেষ** অলঙ্কার হয়।

(ক)-উদাহরণ :

(i) 'আজনম ছিল সাধ কল্পতরু হেরিব নয়নে ;
সে সাধ মিটিল মোর আজিকে তোমার দরশনে।'—শ. চ.

—আধার স্বর্গের নন্দনবন, আধেয় কল্পতরু। নন্দনবন নাই ; অথচ বক্তা কল্পতরু দেখছেন। বিশেষ অলঙ্কার। বলা বাহুল্য, এ কল্পতরু 'তোমার দরশনে'-র তুমি-র উপর আরোপিত। তুমিই কল্পতরু—এই হ'ল ব্যঞ্জনা।

(খ)-উদাহরণ :

(ii) "সে আজ বিরহী-মোর গৃহে, সে যে দিকে দিগন্তরে,
সে মোর সম্মুখে, মোর পিছনে সে, সে যে শয্যা'পরে,
সে আমার পথে পথে, সে আমার নিখিল ভুবনে,
আর মোর কেহ নাই, কিছু নাই আমার জীবনে,
শুধু সে, শুধু সে, সে, সে, সে ছাড়া অস্তিত্ব আর নাই,—
এই কি অদ্বৈতবাদ? কে বলিবে, কাহারে শুধাই?"

—শ্যামাপদ চক্রবর্তী ('অমরুশতক'—**'পরিচয়'** পত্রিকা)।

—একই শরীরিণী প্রিয়া ; কিন্তু একই সময়ে বহু আধারে সে দৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য, এ বিরহীর ভাবদৃষ্টি।

সঙ্কর

(i) "পত্রচ্ছেদ অবকাশে
পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন।" —রবীন্দ্রনাথ।

—চুম্বন পর পর ললাট চক্ষু বক্ষ প্রভৃতিতে পড়ায় **পর্য্যায়** অলঙ্কার; অথচ 'চুম্বন' শব্দটি থাকায় প্রস্তুত চন্দ্রমায় অপ্রস্তুত নায়কের ব্যবহার আরোপিত হয়েছে, কাজেই **সমাসোক্তি**, আবার 'চক্ষে বক্ষে' 'ক্ষ'-র অনুপ্রাস, 'বক্ষে বেশবাসে' 'ব'-র অনুপ্রাস, 'বেশবাসে' 'বশ'-'বস'র অনুপ্রাস এবং 'ললাটে' 'ল'-র অনুপ্রাস। এক 'চুম্বন'-ই সব জায়গায় পড়ায় **পর্য্যায়** এবং চন্দ্রমায় নায়কত্ব-আরোপে সাহায্য করায় **সমাসোক্তি** ঘটিয়েছে। একই আশ্রয়ে এতগুলি অলঙ্কার; কাজেই **সঙ্কর**।

(ii) "গোপললনা নায়কহীনা শোকশায়কে শায়িতা দীনা,
নয়ননীরে বাজায় ব্যথা-পাথার ভানুনন্দনার।" —কালিদাস।

—'ললনা'-তে **'ল'-র অনুপ্রাস**, 'ললনা নায়কহীনা'-তে **'ন'-র অনুপ্রাস**, 'নায়ক শায়ক'-এ **'য়ক'-এর অনুপ্রাস**, শোকশায়কে শায়িতা-তে **'শ'-র অনুপ্রাস**, শায়ক শায়িতা-তে **শায় শায় অনুপ্রাস**, নয়ননীরে **ন-র অনুপ্রাস**, বাজায় ব্যথা-তে **ব-র অনুপ্রাস**, ব্যথা-পাথার-এ **থ-র অনুপ্রাস**, ভানুনন্দনা-তে **ন-র অনুপ্রাস, নয়টি অনুপ্রাস**। ব্যথা-পাথার **রূপক**। এখন সমস্যা 'বাজায়' শব্দটি নিয়ে—বাজায় কে? গোপললনা নিশ্চয়ই নয়, কারণ দীনার পরে ছেদ রয়েছে। তাহ'লে, পাথার নীরকে বাজায় অথবা নীর পাথারকে বাজায়। শেষেরটিই সঙ্গত ব'লে মনে করি; যেহেতু, সাগরে যেমন নদীর জল কলধ্বনি তোলে, তেমনি ভানুনন্দনা রাধার ব্যথা-পাথারে নয়নজল শোকের কলধ্বনি তুলছে। তাই যদি হয়, আবার অলঙ্কার। 'বাজায়' থেকে দেখা যাচ্ছে ব্যথা-পাথার-এ যন্ত্রব্যবহার আরোপিত হয়েছে; অতএব **সমাসোক্তি**। নয়ননীর তাহ'লে যন্ত্রী; **আবার সমাসোক্তি**। এতগুলি অলঙ্কারের পরস্পর-নির্ভরশীল সমাবেশ। উদাহরণটি সুন্দর।

(iii) "অপলক নেত্র তার আলোকসুষমা
গণ্ডূষে সাগরসম করিল নিঃশেষ।" —মোহিতলাল।

—'সাগরসম' স্পষ্টই এখানে **উপমার** নির্দ্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু 'গণ্ডূষ' থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নেত্রে অগস্ত্যমুনির ব্যবহার আরোপিত হয়েছে; কাজেই **সমাসোক্তি**। অধিকন্তু, সুষমা থেকে নিঃশেষ পর্য্যন্ত **শষস-র অনুপ্রাস**।

এর পর যে উদাহরণটি দিচ্ছি সেটি **সন্দেহ সঙ্করের**। বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যায় এর বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে।

(iv) "হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত।"

—**অশ্রুশিশির** কোন্ অলঙ্কার? উপমা, না রূপক? 'মুখপদ্ম বিকশিত' বললে মুখপদ্ম যে **রূপক** তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না; কারণ, বিকাশ পদ্মের ধর্ম্ম, মুখের নয়। কিন্তু এখানে 'ধৌত' শব্দটি কোনো সাহায্য করছে না; যেহেতু অশ্রু দিয়েও ধোয়া যায়, শিশির দিয়েও ধোয়া যায়। অশ্রু শিশিরের মতন ব'লে অশ্রুকে (উপমেয়কে) প্রধান্য দিয়ে যদি বলি এখানে **উপমা**, ভুল হবে না; আবার অশ্রুর উপর শিশির আরোপ ক'রে শিশিরকে (উপমানকে) প্রাধান্য দিয়ে যদি বলি অলঙ্কার এখানে **রূপক**, তাহ'লেও ভুল হবে না। এইরকম সংশয় থাকলেই সন্দেহ সঙ্কর হয়। কিন্তু সাবধানে বিচার করতে হবে; **অলঙ্কারপ্রকৃতির সঙ্গে ভালো পরিচয় না থাকলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। একটা উদাহরণ দিচ্ছি:**

(i) "নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে ধরা।" —রবীন্দ্রনাথ।

—**বাহুপাশে** রূপক? না, উপমা? সন্দেহের সঙ্গে মনের ঝোঁকটা বেশী যাবে রূপকের দিকে। কিন্তু রূপক এখানে মোটেই নাই, **আছে উপমা।** নবনীনিন্দিত কার বিশেষণ? বাহুর? না, পাশের? নিশ্চয়ই বাহুর। তাহ'লে উপমেয় প্রাধান্য পাচ্ছে, যা উপমা অলঙ্কারের লক্ষণ। অতএব অলঙ্কার এখানে **উপমা**।

[তবু এখানে **সঙ্কর** আছে। পাশের মতন বাহু **উপমা** এবং নবনীনিন্দিত বাহু **ব্যতিরেক**। কিন্তু ভালো হ'ল না। কবি যদি 'নবনীনিন্দিতবাহুপাশ' লিখতেন (সমাস ক'রে), তাহ'লে সুন্দরতর হ'ত। তখন এইভাবে অলঙ্কার নির্ণয় করতাম—নবনীনিন্দিত এমন বাহু (ব্যতিরেক), নবনী-নিন্দিতবাহুরূপ পাশ (রূপক); এতে **ব্যতিরেক-রূপকের সঙ্কর** পাওয়া যেত।

এমনি উদাহরণ আর একটি দিচ্ছি:

(ii) "করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্য্যপুষ্পরাশি চরণ-কমলে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—চরণ-কমল রূপক নয়, **উপমা** , কারণ, ফুলে কেউ ফুল নিবেদন করে না। চরণই (উপমেয়) এখানে প্রধান।

(সাধারণভাবে এখানে সঙ্কর : রূপক+উপমা।)

(v) "কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ" —ভারতচন্দ্র।

—এটি সাধারণ সঙ্করের উদাহরণ। "কোটি শশী জিনি মুখ" **ব্যতিরেক** এবং "মুখ কমল" **রূপক, গন্ধ তার নিয়ামক**।

(vi) "চকোরে চুমিয়া চন্দ্রিকা ঝরে" —শক্তিপদ দত্ত।

(vii) "সুরভিত সঙ্গীত" — ঐ

—প্রথমটিতে 'চ'-র **অনুপ্রাস** এবং নায়িকা-ব্যবহার 'চুমিয়া' ক্রিয়াটি 'চন্দ্রিকা'য় আরোপিত হওয়ায় **সমাসোক্তি** অচ্ছেদ্যভাবে মিলিত থাকায় **সঙ্কর** অলঙ্কার। দ্বিতীয়টিতে 'স'-ধ্বনির **অনুপ্রাস** আর 'সুরভিত' বিশেষণের ব্যঞ্জনায় 'সঙ্গীত'-এ পুষ্প-আরোপের **ব্যঙ্গ্যরূপক** ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অলঙ্কার **সঙ্কর**।

বিবিধ

(১) **একই অঙ্গে পরস্পরবিরোধী অলঙ্কারের অবস্থান দোষের।** কয়েকটি উদাহরণ :

(i) "তুমি যেন দেবীর মতন"—রবীন্দ্রনাথ।

—'মতন' উপমার অঙ্গ, 'যেন' উৎপ্রেক্ষার। উপমায় সংশয় নাই, উৎপ্রেক্ষায় সংশয় অতিপ্রবল। দুটির মিলন (এক আধারে) বিরোধী ব'লে, উদাহরণটিতে অশুদ্ধ অলঙ্কার হয়েছে। কবিকে রক্ষা করতে হ'লে **অগত্যা** বলতে হয়—যেন+মতন=তুল্য, অলঙ্কার উপমা। 'উপমা' দ্রষ্টব্য।

(ii) "খিন্ন করি কৃষ্ণক্লান্ত মেঘপুঞ্জ
বিস্ফুরিয়া ওঠে **যথা** বিদ্যুৎব্রততী,
তেমনি বেদনাসিন্ধু অক্লান্ত মন্থনে **যেন** উদ্গারিয়া তোলে শুধু মণি।"—বুদ্ধদেব।

—এখানে প্রধান অলঙ্কার বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের উপমা ; কিন্তু 'যেন' অলঙ্কার নষ্ট করেছে। এখাতে কবির পক্ষে ওকালতি করা যায় না। **'যেন' বাদ দেওয়া উচিত।**

(২) **লিঙ্গবিভ্রাটজনিত একরকম দোষ দেখাচ্ছি :**

(i) "দেখিনু অশোকবনে (হায় শোকাকুলা!)
রঘুকুলকমলেরে।" —মধুসূদন।

—সীতাকে কমলিনী না ব'লে কমল বলা দোষের। 'শোকাকুলা' স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণটি লক্ষণীয়।

(৩) **উপমেয়কে পৃথক্ রেখে উপমানকে অন্য শব্দের সঙ্গে সমাস ক'রে একরকম রূপকসৃষ্টি আধুনিক সাহিত্যে খুব বেশী।**

['সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ' একরকম সমাস হয়, কিন্তু অলঙ্কার হয় না। 'দেবদত্তস্য গুরুকুলম্'-এ দেবদত্তের সঙ্গে গুরুর সম্বন্ধ আগে ব'লে 'দেবদত্তগুরোঃ কুলম্' বলাই সঙ্গত ; তবে মানে বোঝা যায় ব'লে ('গমকত্বাৎ') পূর্ব্বপ্রয়োগটি চলে সমাসে। অলঙ্কারে এ বিধি নাই।]

(i) "**বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত** ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে"
—রবীন্দ্রনাথ।

—বাণীর উপর বিদ্যুৎ আরোপিত হ'য়ে রূপক সৃষ্টি করেছে। কিন্তু দীপ্ত বিদ্যুতের সঙ্গে সমাসে একপদ হ'য়ে বাণীকে দূরে ফেলেছে।

(ii) "হারায়েছে দিশা **বিকারের মরীচিকাজালে**"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "পূর্ণিমার ইন্দু **সংসারের সমুদ্রশিয়রে**"—রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "**বেদনার বীণাপাণি** সন্ধ্যারাণী মোর"—বুদ্ধদেব।

এমন উদাহরণ আমাদের সাহিত্যে অসংখ্য আছে। এগুলি যে ত্রুটি তাতে সন্দেহ নাই। তবে খুবই চলিত হ'য়ে গেছে ব'লে এদের অলঙ্কারত্ব স্বীকার না ক'রে উপায় কি? **'অভেদে ষষ্ঠী'** ব'লে এদের রূপকত্ব স্বীকার করেছি ('রূপক' দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তা সম্ভব হয় এমনি হ'লে—

'**বেদনার বীণা** বাজাও সন্ধ্যারাণী'—শ. চ.

এখানে বেদনার বীণা=বেদনারূপ বীণা (রূপক)। কিন্তু **বীণার** জায়গায় **বীণাপাণি** এলে বাক্যের গঠনগত ত্রুটি ঘ'টে যায় না কি?

(৪) **অসাবধানতায় অলঙ্কার হ'তে হ'তে হয় নাই বা পূর্ণাঙ্গতা পায় নাই** এমন উদাহরণও আছে:

(i) "শতেক বিজ্ঞ অবোধের চেয়ে মূর্খ সুবোধ ভালো,
শত তারা নয় একটি চন্দ্রে বংশ করে যে আলো।"
—কালিদাস।

—বিম্বপ্রতিবিম্বসম্বন্ধ থাকায় এটি **দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের** চমৎকার উদাহরণ হ'তে পারত; কিন্তু বিঘ্ন ঘটিয়েছে 'বংশ'। কবিতায় বেশ বোঝা যাচ্ছে যে 'সুবোধ' শব্দটির অর্থে জোর দেওয়া হয়েছে; এবং অবোধের বিপরীত পন্থায় একে স্থাপন করা হয়েছে; তা ছাড়া বিজ্ঞ অবোধ=উজ্জ্বল অথচ ক্ষুদ্র তারা এবং মূর্খ সুবোধ=কলঙ্কী অথচ অতিজ্যোতির্ময় চন্দ্র। এখানে 'বংশে'-র জায়গায় 'বিশ্ব' বসালে চমৎকার **দৃষ্টান্ত** হয়, অথচ ছন্দপাত হয় না। এই সূত্রে যে সংস্কৃত শ্লোকটি মনে পড়ে তা হচ্ছে—"বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খশতান্যপি। একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাসহস্রশঃ॥" এতে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। মাত্র একটি 'বংশ' এখানে বংশদণ্ডের আঘাতে অলঙ্কারটি চূর্ণ করেছে।

(ii) "ঊর্ণনাভ অন্ধকারে ব'সে
আপনারে কেন্দ্র করি যেমন বুনিয়া যায় জাল
চারিদিকে, রাজ্যাকাশে সূর্য্যতা লভিয়া তাঁহারাও
ধর্ম্মভ্রমে করিতেন রাজত্ববিস্তার।"—বুদ্ধদেব।

—ঊর্ণনাভ জাল বোনে, তেমনি রাজা রাজত্ববিস্তার করেন—বিম্বপ্রতিবিম্ব উপমা। কিন্তু মুস্কিল আছে। ধর্ম্মভ্রমকে না হয় অন্ধকার ধরা গেল; কিন্তু

মাকড়সা আপনাকে কেন্দ্র ক'রে জাল বোনে যেমন, তেমনি রাজাও তাঁর চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করেন এর সঙ্গে রাজ্যাকাশে সূর্য্যতা লাভ করার কি সার্থকতা বোঝা কঠিন। সামগ্রিকভাবে অলঙ্কার হয়েছে কি? কষ্টকল্পনায় একটা ব্যাখ্যা হয়তো দাঁড় করানো যায়; কিন্তু তাতে আমাকেও জাল বুনতে হয়।

(iii) "ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া প'ড়ে যাবে তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে।" —রবীন্দ্রনাথ।

—সম্পূর্ণ বিকাশের পরে ফুল (পাপড়ি) ঝ'রে গেলে ফলের প্রকাশ হয়। প্রয়োজনের অবসানে (যথাকালে) লঘু দেহলাবণ্য ক্ষয় পেলে গৌরবময় নারীত্ব (চিত্রাঙ্গদার) জন্মলাভ করবে। চমৎকার **দৃষ্টান্ত অলঙ্কার** হ'তে পারত। কিন্তু হ'ল না দুটি কারণেঃ প্রথমতঃ প্রকাশ পাওয়া এবং বাহির হওয়া বস্তুপ্রতিবস্তু, বিম্বপ্রতিবিম্ব নয়। 'ফুলের......কাজ' এবং 'যথাকালে......দল' বিম্বপ্রতিবিম্ব; কিন্তু বাধা 'দল' শব্দটি, লঘু লাবণ্যকে দল বলায় ফুলের কথা এসে পড়ায় বিম্বপ্রতিবিম্ব হ'ল না। এই সকল কারণে প্রধান অলঙ্কার এখানে নষ্ট হ'য়ে গেছে।

(iv) "আসিয়াছি দ্বৈরথ সমর আকিঞ্চনে,
অকিঞ্চনে ক'রো না বঞ্চনা,
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম তব।"—গিরিশচন্দ্র।

—'অকিঞ্চনে বঞ্চিবে না জানি' এইভাবে যদি দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি লেখা হ'ত তাহ'লে **কাব্যলিঙ্গ** অলঙ্কার হ'ত।

(v) "কনকলতার প্রায় জনকদুহিতা
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা?" —কৃত্তিবাস।

—অলঙ্কার এখানে উপমা। কিন্তু কবির ঝোঁক রূপকের দিকে; তার প্রথম প্রমাণ 'উৎপাটিতা' এবং দ্বিতীয় প্রমাণ 'বনে ছিল' এই অংশের ব্যঞ্জনা। দুটিই, বিশেষ ক'রে 'উৎপাটিতা', কনকলতার পক্ষে। জনকদুহিতাকে উৎ-পাটিতা করা যায় না, যায় কনকলতাকে। কাজেই উপমান কনকলতা প্রাধান্য লাভ করেছে, উপমেয় জনকদুহিতা গৌণ হ'য়ে আছে। এ লক্ষণ রূপকের;

উপমায় এর বিপরীত। কাজেই অলঙ্কার এখানে দুষ্ট। এমন দোষ আধুনিক সাহিত্যে সুপ্রচুর।

(vi) "যে প্রেম ফুলের মত গোপনে ফুটিয়া ওঠে রাঙিয়া লজ্জায়
স্পর্শমাত্র ঝ'রে প'ড়ে যায়।
যে স্বপ্ন মেঘের মত মনের নয়ন-পরে গাঢ় নীলাঞ্জন দেয় মেখে,...
উন্মাদ ঝটিকা এসে ছিঁড়ে ফেলে দেয় তারে শতখণ্ড ক'রে।"

—বুদ্ধদেব।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নাই। মনে হয় এ ত্রুটি কবিদের অসাবধানতার ফল, অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতাও অসম্ভব নয়। দোষের কারণ অজ্ঞতা, অনবধানতা যাই হোক না কেন, আসল কথা কি নিয়ে কাব্য লিখছেন তার সম্বন্ধে কবির স্পষ্ট ধারণা যদি না থাকে, তাহ'লে প্রকাশে ধোঁয়ার আবরণ পড়বেই। মহাকবিরাও এ অপরাধ থেকে একেবারে মুক্ত নন।

ভালো কবিদের, মানে শক্তিমান্ কবিদের রচনা স্বচ্ছন্দ হ'তে পারে; কিন্তু একথাটা ভুললে চলবে না যে এই স্বচ্ছন্দতার মূলে ব্যাপক প্রস্তুতি আর প্রচুর অভ্যাস থাকতে হয়। কবির কাব্য তো আর বাতাসের মতন স্বয়ম্ভূ এবং স্বয়ংপ্রবাহ নয়। দেশদেশান্তরের অসংখ্য বই তাঁরা পড়েন, তার প্রমাণ তাঁদের কাব্যেই পাই। Style, Diction, Aesthetics, Poetics প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক বিলিতি বই যাঁরা পড়েন, দেশী সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে অপরিচয় বা তার প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁদের পক্ষে নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয়। নজীর মিলিয়ে 'শিশুপালবধ' রচনা করতে বলা আমার উদ্দেশ্য ব'লে কেউ যদি মনে করেন, তিনি ভুল করবেন। লেখার মধ্যেই লেখক বেঁচে থাকেন। সেই লেখাকে সুন্দর এবং শক্তিমান্ করার কলাকৌশল সাগরপারেও উদ্ভূত হয়েছে, এদেশেও হয়েছে। নজরটা শুধু অস্তাচলের উপর নিবদ্ধ না রেখে উদয়াচলের দিকে একটু ফিরিয়ে দেওয়ায় দোষ কি?

কয়েকটি পাশ্চাত্য অলঙ্কার

আমাদের অলঙ্কার-পরিভাষায় বাঁধা যায় না এমন কতকগুলি পাশ্চাত্য অলঙ্কারের প্রচুর প্রয়োগ রয়েছে আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে। তাদেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম নীচে।

প্রতিটি অলঙ্কারের **বাঙলা নামকরণ করেছি যথাসম্ভব মূলনামের অর্থানুসরণে।**

১। Asyndeton—অত্যযুক্ত

সংযোজক অব্যয়ের পরিহার।

(i) "হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী।" —মধুসূদন।

(ii) "শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী।" —রবীন্দ্রনাথ।

২। Polysyndeton—অতিযুক্ত

এটি পূর্ব্বোক্তটির বিপরীত ; কাজেই এর নাম **অতিযুক্ত।**

(i) "আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের" —প্রেমেন্দ্র।

(ii) "চলার তালে বেণীখানি দুলছিল তার পিঠে—
সাপের মতন কালো এবং কুটিল এবং চিকন এবং
ভীষণ, তবু মিঠে।" —শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী।

৩। Anaphora (Epanaphora)—আন্তাবৃত্তি

পর পর বাক্যের বা বাক্যাংশের প্রথমে একই কথার বার বার আবৃত্তির নাম **আন্তাবৃত্তি।**

(i) "যেদিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ!
যেদিকে চাই মলিন অধর উপবাসীর চোখ!
যেদিকে চাই গগনছোঁয়া নীরব অভিযোগ!
যেদিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল!"—সত্যেন্দ্রনাথ।

(ii) "যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হ'তে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসাদ্বেষ,
যাত্রা করি স্বর্গময়ী করুণার পথে"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) কাঁদে গান্ধারী, কাঁদে রুক্মিণী, কাঁদে ধরিত্রী আজি" —যতীন্দ্রনাথ।

(iv) "আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।"
—সুকান্ত ভট্টাচার্য্য।

এইজাতীয় আবৃত্তি আমাদের প্রাচীন কাব্যেও মেলে অর্থাৎ কম হ'লেও পাওয়া যায়। যেমন,

"আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনাব জল॥
আর কাল হৈল মোর রতনভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরিগোবর্দ্ধন॥"—চণ্ডীদাস।

আধুনিক সাহিত্যে এইজাতীয় আবৃত্তির অজস্রতা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল ব'লেই আমার ধারণা।

৪। Onomatopoeia—ধ্বনিবৃত্তি

স্বর ও ব্যঞ্জনের ভাবানুকারী ধ্বনির নাম ধ্বনিবৃত্তি।

(i) "চরকার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর ঘব!
ঘর ঘর ঘীর দীপ আপনায় নির্ভর!" —সত্যেন্দ্রনাথ।

(ii) "তেপান্তরে লাগ্‌ল আগুন—ছুবলে আকাশ খুবলে নিলে আঁখি,
সৃষ্টিখানার ঝুঁটি ধ'রে কোন্ সে দানো দিচ্ছে কোথা ঝাঁকি;
আবার কোথায় রোদ উঁকি দেয় পাতার চিকের ফাঁকে,
কাঠবেড়ালীর চমক লাগে বনশালিকের ডাকে।" —প্রেমেন্দ্র।

(iii) "গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।" —রবীন্দ্রনাথ।

৫। Chiasmus—পরাবৃত্তি

এতে পুনরাবৃত্তির সময় শব্দসমূহের শৃঙ্খলা উল্‌টিয়ে দেওয়া হয়।

(i) "কবে সে আসিবে আসিবে সে কবে
তাই নয় ব'লে দিক্।" —যতীন্দ্রমোহন।

(ii) "অর্জ্জুন— এই শুধু?
চিত্রাঙ্গদা— শুধু এই!" —রবীন্দ্রনাথ।

৬। Metonymy—অনুকল্প

কোনো সম্পর্কসূত্রে একবস্তুকে অন্যবস্তুর নামে অভিহিত করা।

(i) "**সেক্ষপীয়র** বড় বেশী পড়িতাম" —বঙ্কিমচন্দ্র।

(ii) "বাম হাতে যার **কমলার ফুল**, ডাহিনে **মধুক-মালা**"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

—বাঙলাদেশের কথা। বাঙলার বাঁদিকে শ্রীহট্ট (কমলালেবুর জন্য প্রসিদ্ধ) এবং ডাইনে সাঁওতালপরগনা (মহুয়াবন)।

(iii) "রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা, মাগো!" —মধুসূদন।
(বিশ্বের=বিশ্ববাসীর)

৭। Synecdoche—প্রতিরূপক

(i) "ষোড়শ বসন্তরাত্রি যে তনুরে করেছে উন্মন" —অজিত দত্ত।

(ii) "ঈশ্বর মূর্খ নন, তাই **বাহুর উপর মস্তিষ্ক**।"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

(বসন্ত=বৎসর; বাহু=বাহুবল; মস্তিষ্ক=বুদ্ধি।)

এই figureদুটির সম্বন্ধে নানামুখী আলোচনা 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'র উত্তরধারায় **লক্ষণা**প্রসঙ্গে করা হয়েছে।

৮। Transferred Epithet—অন্যাসক্ত

(i) "**বাক্যহীন বেদনা** বহিয়া
তবু সে জননী আছে ব'সে, দুর্ব্বলের
তরে কোল পাতি" —রবীন্দ্রনাথ।

—'বাক্যহীন' জননীর বিশেষণ, একে 'বেদনা'র বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে; তবু অর্থ বোঝা যাচ্ছে sleepless pillow, weary way-র মতন।

[আমাদের 'সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ' একরকম সমাস হয়, তার ভাবটা এইরকম। কিন্তু সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।]

(ii) "আকাশের তারা গুনি **নিঃসঙ্গ শয্যায়** শুয়ে শুয়ে।"

—বুদ্ধদেব।

৯। Allusion—উল্লিখন

(i) "**রক্তবীজে** বধি, বুঝি, এবে বিধুমুখী,
আইলা **কৈলাসধামে**? যদি আজ্ঞা কর,
পড়ি পদতলে তবে, চিরদাস আমি
তোমার, **চামুণ্ডে**!" —মধুসূদন।

—পত্নী প্রমীলার রণসাজ দেখে ইন্দ্রজিৎ কৌতুক ক'রে এই সম্ভাষণ করেছেন। শুম্ভনিশুম্ভসেনাপতি রক্তবীজকে চামুণ্ডা বধ করেছিলেন এই পৌরাণিক প্রসঙ্গটি এখানে রয়েছে।

(ii) "আর নারী? আমরা ভালোবাসিতে পারি, হেন নারী
আছে কি মরতে? **অমিত লাবণ্য** কি স্পর্শ করে
ধরণীর ধূলি কভু? **সুচরিতা** কভু জন্ম নেয়
মব রমণীর গর্ভে? দেখিতে কি আশা করো, সখা,
পরিষ্কার সূর্য্যালোকে **গড়ুইন-দুহিতারে** কভু?" —বুদ্ধদেব।

১০। Climax—অনুলোম

(i) "জয়সিংহ— প্রভু, কারে অপমান?
রঘুপতি—কারে! তুমি, আমি, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বদেশ,
সর্ব্বকাল, সর্ব্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান" —রবীন্দ্রনাথ।

(এর সঙ্গে 'সার'-এর কোনো সম্বন্ধ নাই। 'সার' দ্রষ্টব্য।)

১১। Periphrasis—পরিক্রমা

(i) "ও ঘুম যে একবার ঘুমোয়, সে আর জাগে না!"

(মৃত্যু) —অমৃতলাল।

১২। Euphemism—মঞ্জুভাষণ

কঠিন কথাকে কোমল ক'রে বলা।

(i) "বিক্রম—দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ!
দেবদত্ত—মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন!" —রবীন্দ্রনাথ।

—মন্ত্রগৃহে তো রাণী নাই, স্ত্রৈণ রাজা! কিন্তু বড়ো কড়া, তাই ঘুরিয়ে মোলায়েম ক'রে বলা হয়েছে।

১৩। Innuendo—বক্রভাষণ

(i) "নিতান্তই ভদ্রলোক, অতি মিষ্টভাষী
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা; আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে;
আদরে বুলান হাত ধরণীর পিঠে,
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।"—রবীন্দ্রনাথ।

—মুখে মিঠে, নিমনিষিন্দে পেটে, চরিত্রহীন, চোর এই কথাগুলোই তির্য্যক্ ভাষাভঙ্গীতে বলা হ'ল। Byron-এর Don Juan-এ Haidee-র পিতা (জলদস্যু) যেভাবে বর্ণিত (Smith যেটি Innuendo-র উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করেছেন), এটি সেইরকম—জলদস্যুটি:

"Pursued o'er the high seas his watery journey
And merely practised as a sea-attorney."

১৪। Irony—বক্রাঘাত

যে কথা বলা উদ্দেশ্য তার বিপরীতভাবে প্রশংসাসূচক কথা ব'লে কঠিন আঘাত দেওয়াই Irony-র বৈশিষ্ট্য। ঠিক এই ভাবটি ব্যাজস্তুতির (**স্তুতিচ্ছলে নিন্দার**) লক্ষণ নয় একথা আগেই বলেছি (ব্যাজস্তুতি দ্রষ্টব্য)।

(i) "সহস্রকোটি প্রণাম-অন্তে নিবেদন শ্রীশ্রীপদে,
মোর শিরোনামে প্রেরিত বিনামা পৌঁছেছে নিরাপদে।
এবারের দান হয়েছে গো প্রভু বড়ই মনঃপূত,
যেমন বেহায়া ঘাঁটাপড়া পিঠ, তেম্‌নি মোলাম জুতো।
তাহে বন্ধুর হাতের ছন্দে উত্তমমধ্যম;—
এ দীন অধীন অধমে তোমার এখনো কত না দম!"

—যতীন্দ্রনাথ।

—প্রশংসার ভাষায় ভগবানের উপর তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত। [যতীন্দ্রনাথের 'দুঃখবাদী' কবিতার উত্তরে যতীন্দ্রমোহন 'দুঃখবিবাদী' নামে যে কবিতা লিখেছিলেন, তারই প্রত্যুত্তর এই 'প্রাপ্তিস্বীকার' কবিতাটি।]

১৫। Sarcasm—পরীবাদ

এতে স্তুতির দ্বারা নিন্দা না ক'রে, একটু বৈচিত্র্যের সাহায্যে নিন্দাটি স্পষ্টই জানানো হয়।

(i) "ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথিকুলমাঝে
তুই রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে। বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?" —মধুসূদন।

[Sarcasm-এর উদাহরণ আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে প্রচুর।]

১৬। Epistrope—অন্ত্যাবৃত্তি

(i) "আঁখি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আত্মা দিয়ে, মৃত্যুর কল্পনা দিয়ে, সেই শোভা পান করি"—বুদ্ধদেব।

(ii) "প্রেম মিথ্যা, স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা"—রবীন্দ্রনাথ।

(iii) "ব্রহ্মহত্যার অপরাধে, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করার অপরাধে, ব্রাহ্মণকে অপমান করার অপরাধে।"—দ্বিজেন্দ্রলাল।

১৭। Zeugma—যুগ্ম

এতে বিশেষ্যযুগলকে এক ক্রিয়ায় বাঁধা হয়। এটিকে দীপক বলা চলে না ; কারণ, এতে দুটি পৃথক্ ক্রিয়ার প্রয়োজন সঙ্গত হ'লেও একটির দ্বারা কাজ সারা হয়।

(i) "নিশ্বাসে কাঁপিয়া ওঠে ক্ষুদ্র তারা, ক্ষীণায়ু প্রহর।"—অজিত দত্ত।

—কেঁপে ওঠা তারায় সঙ্গত, 'ব'য়ে যায়' প্রহরের ক্রিয়া হওয়া উচিত।

১৮। Apostrophe—সংবুদ্ধি

—অনুপস্থিতকে উপস্থিত কল্পনা ক'রে কোনো ব্যক্তিকে বা সচেতনত্ব আরোপ ক'রে কোনো বস্তুকে আকস্মিকভাবে বা তুলনাসূত্রে সংক্ষেপে সম্বোধন

করার নাম Apostrophe অলঙ্কার। আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে এর প্রচুর উদাহরণ আছে।

(i) "কোথা মরি সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকরকররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনী?" —মধুসূদন।

—প্রমীলার কথা বলতে সহসা তুলনায় পঙ্কজিনীর সম্বোধন।

(ii) "থল জল ছলভরা তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জ্জিছে নিত্য, করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ!
হে মাটি, হে স্নেহময়ি, অয়ি মৌন মূক..."

—রবীন্দ্রনাথ।

—জলের বর্ণনা করতে সহসা তুলনায় (এখানে contrast) মাটিকে সম্বোধন।

১৯। Aposiopesis—ছেদাভাস

—বিশেষ ফলসৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলতে বলতে থেমে যাওয়া।

(i) "যখন নিজের কন্যা—যে মাতৃহীনা বালিকাকে আমি বক্ষে ক'রে ঘুম পাড়িয়ে নিজের হাতে খাইয়ে মানুষ করেছি, এই বিজয়যাত্রায় সব ছেড়ে এসেছি শুদ্ধ তাকে ছেড়ে আসতে পারিনি, আজ সে কন্যাও—না, ভাগ্যবিপর্য্যয় বটে! এ পরাজয়শল্য আমার বক্ষে তত বাজেনি, কন্যা, যত—"

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

(ii) "এই কি পলাশীক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেইখানে—কি বলিব? বলিব কেমনে?"—নবীনচন্দ্র।

২০। Anticlimax (Bathos)—নিকর্ষ

(i) 'জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, মান গেল, পোষা শালিকটা পর্য্যন্ত গেল।'

—শ. চ.

উত্তরধারা

Figure, বক্রোক্তি ও অলঙ্কার

Figure কথাটার মূল অর্থ বস্তুর বাহ্য রূপ বা মূর্ত্তি। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ-সম্পর্কে যখন বলা হয়—'He has cut a figure', তখন তার গঠনগত দেহরূপ থেকে স'রে এসে ফিগার জানিয়ে দেয় যে ব্যক্তিটি কোনো বিশেষ গুণে অসামান্যতা লাভ ক'রে সাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হ'য়ে উঠেছে। ঠিক এমনিধারা মানুষের ভাষাও যখন সাধারণ অর্থ-প্রকাশনার সহজ পথ থেকে স'রে এসে অসামান্য রূপে, যেন একপ্রকার ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত হ'য়ে, ভাবকল্পনাকে পরিমূর্ত্ত ক'রে তোলে, তখন তাকেও বলা হয় Figure। এই যে মানুষ আর ভাষার ফিগারত্বের কথা বললাম, এ শুধু গুণের দিকে লক্ষ্য রেখে। মানুষ যখন 'cuts a sorry figure', তখনো সে ফিগারই, কিন্তু অসুন্দর, অনেক ক্ষেত্রে আবার নিন্দনীয়। ভাষাও যখন এইভাবের ফিগার হয়, তখন তার অলঙ্কারত্ব থাকে না।

Figure কথাটি আমাদের সুপরিচিত; কিন্তু জানি না কখন কোন্ দেশে এই বিশেষ অর্থে সাহিত্যশাস্ত্রের পরিভাষারূপে কথাটির প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল।

ইউরোপের আদি আলঙ্কারিক আচার্য্য এ্যারিষ্টটলের (৩৮৪—৩২২ বি. সি.) সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এই Figure শব্দটি; থাকারই কথা, কারণ শব্দটি অ-গ্রীক, অভিধানে এর কোনো গ্রীক মূল (root) দেখা যায় না। ল্যাটিনে শব্দটি Figūra; কিন্তু প্রাক্‌খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমবাসী হোরেসের (Horace) Art of Poetry ('Ars Poetica') গ্রন্থিকায় শব্দটির প্রয়োগ নাই।

উত্তরকালে যার নাম হয়েছে Figure (of Speech), আচার্য্য এ্যারিষ্টটল তার নাম দিয়েছিলেন **Metaphor**। তিনি বলেছেন, "A metaphorical word is a word transferred from its proper sense" ('Poetics')। ভাষান্তরে Metaphor-কে তিনি বলেছেন "translation of a name from one signification into another" ('Rhetoric')। শব্দার্থের এই রূপান্তরীকরণ হয় **চারটি**মাত্র উপায়ে—"from Genus to Species, from Species to Genus, from one Species to another, or in the way of Analogy" ('Poetics') অর্থাৎ (i) **সামান্য** হ'তে **বিশেষে**, (ii) **বিশেষ** হ'তে **সামান্যে**, (iii) **বিশেষ** হ'তে **বিশেষে**, অথবা (iv) **সাদৃশ্য-পন্থায়**। এই উপায়গুলির

শেষেরটি (Analogy—সাদৃশ্য) উত্তরকালের সুপরিচিত 'Metaphor'-নামক বিশেষ ফিগারের ভিত্তি এবং বাকী তিনটি বহু পরবর্ত্তী কালের Metonymy, Synecdoche-জাতীয় কতকগুলি ফিগারের ভিত্তি। এ্যারিষ্টটল-নির্দ্দেশিত পন্থায় সৃষ্ট এবং উত্তরকালে বহুপ্রচলিত নূতন কয়েকটি ফিগারের নাম পাই তাঁর প্রায়সমকালীন ডিমিট্রিয়ুসের (Demetrius : ৩৪৫—২৮৩ বি. সি.) 'On Style'-নামক গ্রন্থে—Allegory, Prospopoia, Aposiopesis, Euphemism ('অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'-য় 'কয়েকটি পাশ্চাত্য অলঙ্কার'দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি। সাদৃশ্যাত্মক Metaphor-সম্বন্ধে এ্যারিষ্টটল বলেছেন, "Metaphors are of four kinds but those esteemed most highly are founded on analogy" ('Rhetoric')।

Figure of Speech শব্দটির বাঙলা প্রতিশব্দ দিতে হ'লে বলতে হয় **বাঙ্‌-মূর্ত্তি**। আধুনিক কালেও Figure-এর যে সংজ্ঞা দেখছি তা প্রাচীন আচার্য্যেরই সংজ্ঞার প্রতিধ্বনিমাত্র—"Words or phrases are used in a sense different from that generally assigned to them" (Nichol)। অর্থের এই বক্রীকরণকে Horace-এর সমকালীন Quintilius বলেছেন 'Tropus' (Trope) যার মানে turning, twisting অর্থাৎ ব্যাপক অর্থের 'Metaphora'।

দেখা গেল যে পাশ্চাত্য Figure-এর জন্মভূমি গ্রীস এবং ভিত্তি **'Metaphora'—অর্থবক্রতা**।

আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রে 'বক্রোক্তি' (শ্লেষবক্রোক্তি, কাকুবক্রোক্তি) নামে একটি শব্দালঙ্কার উত্তরকালে সৃষ্ট হ'য়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার কথা ছেড়ে দিলাম ; কারণ আমার বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় আমাদের অর্থালঙ্কারের স্বরূপকথা।

আচার্য্য **ভামহ অর্থালঙ্কারমাত্রেরই** প্রতীকরূপে যে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, তা হ'ল **'বক্রোক্তি'**। সকল অর্থালঙ্কারেই 'অতিশয়োক্তি'র অন্তর্ভাব এই তত্ত্বটুকু জানাতে গিয়ে তিনি বলছেন, "সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিঃ" ('সৈষা'=সা এষা অতিশয়োক্তিঃ)। আরও স্পষ্টভাষায় তিনি জানিয়ে দিয়েছেন—'বাক্যের বাঞ্ছিত যে অলঙ্কৃতি সে **হচ্ছে বক্র-অর্থবিশিষ্ট-শব্দময়ী উক্তি**' ("বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিঃ ইষ্টা বাচাম্ অলঙ্কৃতিঃ")। দশম শতাব্দীর আচার্য্য **কুন্তক** তাঁর 'বক্রোক্তিজীবিত'-নামক গ্রন্থে বলেছেন "শব্দার্থৌ সহিতৌ" যে কাব্য তার শব্দ আর অর্থ দুইই অলঙ্কার্য্য (objects to be

adorned), বক্রোক্তিই তাদের অলঙ্কৃতি (ornament) এবং **বক্রোক্তি হ'ল রসিকোচিত ভঙ্গিমায় বৈচিত্র্যময়ী উক্তি**—

"উভাবেতাবলঙ্কার্য্যৌ তয়োঃ পুনরলঙ্কৃতিঃ।
বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে॥"

(উভাবেতাবলঙ্কার্য্যৌ=উভৌ এতৌ অলঙ্কার্য্যৌ=এরা অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ উভয়েই অলঙ্কার্য্য)

কুন্তকের এই 'অলঙ্কৃতি' কথাটির অর্থ শুধু অনুপ্রাস উপমা ইত্যাদি পারিভাষিক অলঙ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বাইরেও এর ব্যাপ্তি, ডিমিট্রিয়ুসের 'Ornament'-এর মতন—"Easy to distinguish is she ; and yet all of them are beautiful" : ব্যঞ্জনাসুন্দর এই উক্তিটিকে 'Polished Style'-এর (আমাদের 'বৈদর্ভী'র মতন) উদাহরণরূপে উদ্ধৃত ক'রে ডিমিট্রিয়ুস বলছেন, "these passagos are **ornaments**"। এইভাবের কথা মহেশ্বরও বলেছেন 'কাব্যপ্রকাশ'-ব্যাখ্যায়—"বৈচিত্র্যম্ অলঙ্কারঃ ইতি অলঙ্কারস্য সামান্যলক্ষণম্; **বৈচিত্র্যং চ ভঙ্গীবিশেষঃ প্রতীতিসাক্ষিকঃ**"। বাক্যগত বক্রোক্তির প্রসঙ্গে কুন্তক বলছেন, বক্রোক্তি করা যায় সহস্র প্রকারে এবং পারিভাষিক (উপমা ইত্যাদি) অলঙ্কারগুলি এই বিচিত্র বক্রোক্তিতে অন্তর্ভাবিত—

"বাক্যস্য বক্রভাবোঽন্যো ভিদ্যতে যঃ সহস্রধা।
যত্রালঙ্কারবর্গোঽয়ং সর্ব্বোঽপ্যন্তর্ভবিষ্যতি॥"

অষ্টম শতাব্দীর আচার্য্য **বামন** যে অর্থে **'বক্রোক্তি'** কথাটি প্রয়োগ করেছেন, তাতে **তাঁর 'বক্রোক্তি' এ্যারিষ্টটলের সাদৃশ্যভিত্তিক ('in the way of analogy') Metaphor-এর সগোত্র হ'য়ে গেছে—"সাদৃশ্যাৎ লক্ষণা বক্রোক্তিঃ" (বামন)**। তাঁর প্রদত্ত উদাহরণ :—

"উন্মিমীল কমলং সরসীনাং
কৈরবং চ নিমিমীল মুহূর্ত্তাৎ"

—মুহূর্ত্তেই সরসীগুলির **কমল** হ'ল **উন্মীলিত** আর **কুমুদ** হ'ল **নিমীলিত**। **চোখের ধর্ম্ম উন্মীলন নিমীলন আর পুষ্পের ধর্ম্ম বিকাস সঙ্কোচ ; কিন্তু সাদৃশ্যহেতু চোখের উন্মীলন আর নিমীলন লক্ষণায় উপচরিত হয়েছে কমলে আর কৈরবে ;** অলঙ্কার তাই বক্রোক্তি ('সাদৃশ্যাৎ **লক্ষণা**

বক্রোক্তিঃ')। বামনের এই উদাহরণটি সহজেই মনে পড়িয়ে দেয় 'পৃথিবী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের—

"তোমার অযুতনিযুত বৎসর
সূর্য্য-প্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হ'তে থাকে।"

(এটি ভালো হয় নাই; **'নিমেষ'** মানেই চোখের পাতা-ফেলা অর্থাৎ **নিমীলন**—"অক্ষিপক্ষ্মপরিক্ষেপঃ নিমেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ"—অগ্নিপুরাণ।)

দেখা গেল যে গ্রীস আর ভারত দুই দেশের অলঙ্কারভাবনার প্রকৃতি অসদৃশ নয়। তবু একটা কথা—

অলঙ্কারপুরাণের আদিপর্ব্বে গ্রীক আচার্য্যদের মধ্যে কাজ করেছিল প্রধানতঃ রাষ্ট্রচেতনা আর আমাদের মধ্যে কাব্যগত সৌন্দর্য্যচেতনা। দুই ভূখণ্ডের মনের গঠন স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন; তাই আদর্শ, পন্থা এসবও বিভিন্ন। ওঁদের জীবনে *State* ছিল সর্ব্বস্ব; তাই কাব্যনাটককেও করতে হ'ত State-এর আনুগত্য। রাষ্ট্রে জয়ী হওয়ার অস্ত্র ছিল অসামান্য তর্কশক্তি। তাই Rhetoric-কে বাদ দিয়ে Poetics স্ব-তন্ত্র হ'তে পারে নাই। এই কারণে ওঁদের কাছে বড়ো হ'য়ে উঠেছে বাক্যের শক্তির দিকটা, আমাদের সৌন্দর্য্যের দিকটা।

শব্দ ও অর্থ

এইমাত্র ব'লে এলাম আচার্য্য এ্যারিষ্টটলের কথা। শব্দের **অর্থবক্রীকরণের** চারটি উপায় তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। সূত্রাকার হ'লেও মূল্যবান্ তাঁর পথনির্দ্দেশ। তাঁর পর থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ইউরোপে বাগর্থের বিচিত্র রহস্যময় সম্পর্ক নিয়ে কোনো ধারাবাহিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা হয় নাই। এ্যারিষ্টটলে যার আরম্ভ, বলতে গেলে, এ্যারিষ্টটলেই তার সমাপ্তি ঘটেছে। আমাদের দেশে শব্দার্থরহস্যের দিকে দৃষ্টি যে বৈদিক যুগেই পড়েছিল তার আংশিক প্রমাণ 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'র এই উত্তরধারার 'অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিকথা'-য় দেখা যাবে।

আমাদের মতে **শব্দের শক্তি বা বৃত্তি তিনটি—অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা।**

অভিধা

শব্দের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ প্রকাশিত হয় যে বৃত্তির বলে, তার নাম **অভিধা**। যে গ্রন্থে প্রধানতঃ শব্দের মুখ্যার্থ থাকে, তাকে আমরা বলি অভিধান।

অভিধা-বৃত্তিতে **শব্দটি বাচক** এবং **অর্থটি বাচ্য, মুখ্য, শক্য বা অভিধেয়।**

বাচ্যার্থ তিনরকম :

(i) **লোকপ্রসিদ্ধ**—যেমন, **লাবণ্য**। লবণ কথাটার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নাই ; **লোকে জানে 'লাবণ্য'** মানে **বিশেষভাবের সৌন্দর্য্য**।

(ii) **ব্যুৎপত্তিগত—কৃৎ**প্রত্যয়নিষ্পন্ন : কর্ত্তা=যে করে, সে ('কৃ' ধাতু +কর্ত্তৃবাচ্যে 'তৃচ্' প্রত্যয়); **তদ্ধিত**প্রত্যয়নিষ্পন্ন : নীলিমা=নীলের ভাব ('নীল' শব্দ+ভাবার্থে 'ইমন্' প্রত্যয়)।

(iii) **কতকটা লোকপ্রসিদ্ধ+কতকটা ব্যুৎপত্তিগত**—যেমন, 'পঙ্কজ' মানে 'পদ্ম' : পঙ্কজ জন্মে পঙ্কে (পঙ্ক+জন্ ধাতু+কর্ত্তৃবাচ্যে 'ড' প্রত্যয়)—এইটুকু ব্যুৎপত্তিগত আর পঙ্কে জাত অন্য সব-কিছুকে বাদ দিয়ে মাত্র পদ্মেই সীমাবদ্ধ থাকা মানেটাই লোকে জানে—এইটুকু লোকপ্রসিদ্ধ।

নামান্তরে (i) লাবণ্য **রূঢ়**, (ii) কর্ত্তা নীলিমা **যৌগিক**, (iii) পঙ্কজ **যোগরূঢ়**।

লক্ষণা

নানা কারণে লক্ষণার মূল্য অসামান্য ; এর বিশদ পরিচয় দেব একটু পরে। এখানে স্বল্প পরিসরে লক্ষণার স্বরূপ আর উদাহরণে এর কিঞ্চিৎ রূপায়ণ দেখাচ্ছি।

বাক্যের বা বাক্যাংশের অন্তর্ভূত কোনো শব্দের মুখ্যার্থ যদি ওই বাক্যের বা বাক্যাংশের অর্থের দ্বারা বাধিত (বাধাপ্রাপ্ত) হয় অর্থাৎ মুখ্য অর্থটিকে সমগ্র অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ব'লে মনে হয়, তাহ'লে দেখতে হয় শব্দটির কোন্ অমুখ্য (গৌণ) অর্থ সমগ্রের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে। এইভাবের অমুখ্য অর্থ সৃষ্টি করার শক্তিও শব্দের আছে ; এই শক্তি বা বৃত্তির নাম **লক্ষণা**। **অর্থটি 'লক্ষ্য', শব্দটি লক্ষক**।

(i) 'এই **রিক্সা**, এদিকে এসো'—জড়পদার্থ রিক্সা ; তাকে ডাকতেও পারি না, সে আসতেও পারে না। কাজেই, 'রিক্সা'-র মুখ্যার্থ এখানে বাধিত অর্থাৎ বাক্যার্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। আমরা বলছি বটে রিক্সা, কিন্তু ডাকছি রিক্সাওয়ালাকে। **অমুখ্য অর্থাৎ লক্ষ্যার্থ 'রিক্সাওয়ালা'** অর্থাৎ, লক্ষণার পরিভাষায়, **রিক্সা-সংযোগী** পুরুষ। এখানে সংযোগসম্বন্ধের লক্ষণা (পরে, **লক্ষণা** দ্রষ্টব্য)।

(ii) "ধূলায় **সোনা** ফলিয়ে দিছি সাগরপারের দ্বীপগুলাতে"
—সত্যেন্দ্রনাথ।

—'সোনা'-র মুখ্যার্থ 'ধাতুবিশেষ'। এ অর্থ বাক্যার্থের দ্বারা বাধিত। কিন্তু ধাতুরূপে সোনা বহুমূল্য ; সুতরাং একে ঐশ্বর্য্যের প্রতীক বলা যায়। '**সোনা** ফলিয়ে দিছি'=**ঐশ্বর্য্যে** মণ্ডিত ক'রে দিয়েছি। কত সহজে সোনা তার ধাতুরূপ থেকে মুক্ত হ'য়ে আপন মহার্ঘতারই সূত্রপথে ঐশ্বর্য্য- বা সমৃদ্ধি-রূপ উপচরিত অথচ সুন্দর অর্থে উত্তরণ করল! 'সোনা'র **লক্ষ্যার্থ** ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি।

ব্যঞ্জনা

অভিধা এবং লক্ষণা আপন আপন ভাবে শব্দের অর্থ প্রতিপাদিত ক'রে যখন পরিক্ষীণ হ'য়ে আসে অর্থাৎ আপন শক্তির সীমায় পৌঁছে বিশ্রান্তি লাভ করে, তখন যে-বৃত্তির বলে শব্দ নূতন অর্থের দ্যোতনা করে, সেই বৃত্তির নাম **ব্যঞ্জনা**।

(i) "**সোনার** হাতে সোনার চুড়ি—কে কার অলঙ্কার ?"—মোহিতলাল।

—**অভিধায়** পেলাম স্বর্ণ-নামক ধাতুর হাত। এইখানেই থামলেন অভিধা, এর বেশী আর সাধ্য নাই তাঁর। এ অর্থ সঙ্গতিহীন (বাধিত)—হাতের উপাদান সোনা নয়।

তখন **লক্ষণা** জানিয়ে দিলেন, 'সোনা আর হাত, রঙ মিলিয়ে দেখো; তাছাড়া, সোনা ঐশ্বর্য্যের প্রতীক একথাটাও ভুলো না'। এই ব'লেই চুপ করলেন লক্ষণা, তাঁর দৌড় এই পর্য্যন্ত। তবু একটা সঙ্গতি পেলাম—হাত সোনালি আর সোনারই মতন মূল্যবান্।

কিন্তু 'কে কার অলঙ্কার?'—কবির চোখে এত নেশা কেন? সোনার মূল্য আর্থিক, এ হাতের মূল্য পারমার্থিক; একটি উগ্র ঐশ্বর্য্য, অপরটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্য। খুব ফর্সা অশীতিপরা জরতীর বা ক্ষয়রোগগ্রস্তা তরুণীরও তেঁতুল-গাছের শিকড়ের মতন হাতও তো সোনালি হ'তে পারে। এখানে দেখছি যে হাতকে অলঙ্কৃত করার অহংকার নিয়ে এসেছে সোনা, চুড়ি হ'য়ে। স্বভাবসুন্দর সোনা এসেছে সুন্দরতর রূপে, স্বর্ণকারের কারুশিল্পের অপূর্ব্ব ফলশ্রুতি—"সৃষ্টিরপরা"! আর হাত? চারুশিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শন, মানুষ-শিল্পীর নয়, বিশ্বস্রষ্টার—"সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ"! কবি মুখ টিপে টিপে হাসছেন—"কে কার অলঙ্কার?" এর পরেও কি ব'লে দিতে হবে এ হাত কার এবং কেমন আর এর দ্রষ্টা যিনি তাঁর চোখে রয়েছে রসাঞ্জন?

'সোনা' শব্দের যে-বৃত্তির বলে এই সূক্ষ্মসুকুমার শেষ অর্থটি পাওয়া গেল, তার নাম **ব্যঞ্জনা**। অর্থটি **ব্যঙ্গ্য**, শব্দটি **ব্যঞ্জক**। এ ব্যঞ্জনার সহকারী কিন্তু লক্ষণা (পরে, **প্রয়োজনলক্ষণা** দ্রষ্টব্য)।

ধ্বনি

ব্যঙ্গ্য অর্থ যেখানে প্রধান সেখানে তার নাম **ধ্বনি**; আর যেখানে **অপ্রধান** সেখানে সে **গুণীভূতব্যঙ্গ্য**।

শেষেরটির কথা পরে বলব।

ধ্বনি-সৃষ্টির ব্যাপারে বাচ্যার্থের দুটি ভূমিকা—একটিতে সে অন্যের মুখাপেক্ষী, অন্যটিতে স্বাধীন। **প্রথমটিতে** তার ধ্বনিসৃষ্টি **লক্ষণাসহকৃত ব্যঞ্জনার** পথে, দ্বিতীয়টিতে সে **আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং ব্যঞ্জক হ'য়ে দেখিয়ে দেয় লোকাতীত অর্থ 'ধ্বনি'কে**, ঠিক যেমন প্রদীপ আপনাকে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য বস্তুকেও করে প্রকাশিত।

প্রথম প্রকারের ধ্বনি **লক্ষণামূলক**, তাই **অবিবক্ষিতবাচ্য**, দ্বিতীয় প্রকারের ধ্বনি **অভিধামূলক**, তাই **বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য**।

নাম শুনে ভয় পাওয়ার কারণ নাই; ব্যাখ্যায়, বিশেষ ক'রে উদাহরণ-বিশ্লেষণে সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।
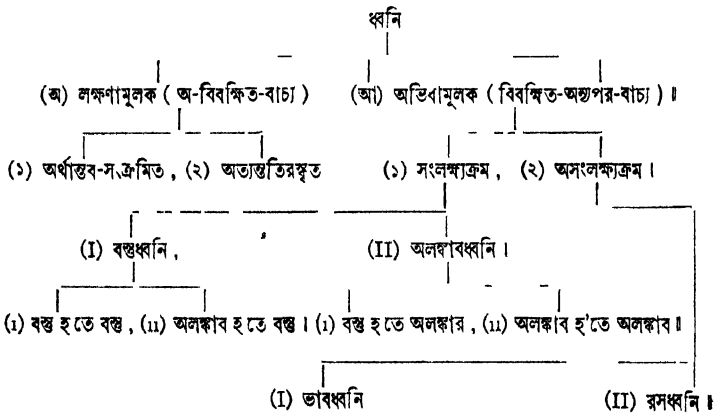
সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির অপর নাম অনুস্বান-সন্নিভ ধ্বনি। পরে এর ব্যাখ্যা করছি। **এ ধ্বনি অর্থশক্তি থেকে উদ্ভূত হয়; আবার শব্দশক্তি থেকেও হয়। শেষেরটিতে শব্দের স্থানে তার প্রতিশব্দ বসালে ধ্বনি নষ্ট হ'য়ে যায়।** যথাস্থানে উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

এখানে ধ্বনির সংক্ষেপে একটু পরিচয় দেব; বিশাল ধ্বনিতত্ত্বের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, কারণ স্থানাভাব।

(অ) **লক্ষণামূলক ধ্বনি ঃ**

এর অপর নাম **অবিবক্ষিতবাচ্য** ধ্বনি। এ নামের কারণ এই যে কবির উক্তিটি বাচ্য অর্থে পাঠক গ্রহণ করুন এই ইচ্ছা কবি করেন না। কবি শব্দ প্রয়োগ করেন লাক্ষণিকভাবে বিশেষ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়োজনে ('প্রয়োজন-লক্ষণা' দ্রষ্টব্য); পাঠক লক্ষণার প্রয়োজনটি অর্থাৎ গোপন সৌন্দর্য্যটি ব্যঞ্জনায় আবিষ্কার ক'রে আনন্দ লাভ করুন, এই হ'ল কবির অভিপ্রায়।

এই অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি দুরকম ঃ (১) **অর্থান্তরসংক্রমিত,** (২) **অত্যন্ততিরস্কৃত**।

(১) **অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি ঃ** বাচ্য অর্থটি এখানে আপনাকে বজায় রেখেই অন্য অর্থে প্রবেশ করে। এই কারণে এর অপর নাম **অজহৎ-স্বার্থ** (নিজের অর্থ যে 'ন জহাতি' অর্থাৎ পরিত্যাগ করে না)। নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই বাচ্য অর্থ এখানে লক্ষক হ'য়ে নূতন অর্থের ব্যঞ্জনা করে ("**স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ**"—'আক্ষেপ' = ব্যঞ্জনা)।

(i) "দুর্যোধন। নাহি জানে
জাগিয়াছে **দুর্যোধন**। মূঢ় ভাগ্যহীন,
ঘনায়ে এসেছে আজি তোদের দুর্দিন।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'দুর্য্যোধন' কথাটার **বাচ্য অর্থ** ধৃতরাষ্ট্রপুত্র। 'তোদের' মানে প্রজাদের; তাদের অপরাধ তারা পাণ্ডবানুরাগী, আজ বনগমনোন্মুখ পাণ্ডবদের দেখবার জন্য তারা পথে পথে প্রতীক্ষা করছে "দীনবেশে সজল নয়নে"। কবির 'দুর্যোধন' ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররূপ বাচ্যার্থটি বজায় রেখেই যে নূতন অর্থের দ্যোতনা করতে যাচ্ছে তার প্রথম পদক্ষেপ **লক্ষণায়**—'মূঢ় ভাগ্যহীন' থেকে 'দুর্দিন' পর্য্যন্ত প্রজাদের উপর প্রতিশোধাত্মক বাক্যটি দুর্য্যোধনকে দিয়ে বলিয়ে কবি একটি নূতন চারিত্রিক ধর্ম্মে (connotation) তাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে আনলেন বিশেষ প্রয়োজনে। এইটুকু হ'ল লক্ষণার কাজ। এ শুধু ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন নয়, প্রতিশোধোদ্যত বিশিষ্ট দুর্য্যোধন। কবির প্রয়োজন এই—প্রতিশোধ নেওয়া এ দুর্য্যোধনের পক্ষে সম্ভব; কারণ পাণ্ডবের নির্ব্বাসন তারই হীনতম চক্রান্তের ফল, সে চিরক্রূর, কুটিল, হিংসাপরায়ণ, ক্ষমতালোভী, কলঙ্কিত পথে সিংহাসনের অধিকারী, চিরপাণ্ডববিদ্বেষী এবং আরও কত কি। এই প্রতীয়মান অর্থটি **অর্থান্তরসংক্রমিত ধ্বনি** কবিপ্রযুক্ত 'দুর্যোধন' শব্দের; এ শব্দের বাচ্য অর্থটি কবির একমাত্র অভিপ্রেত অর্থ নয়, তাই **ধ্বনি** এখানে **অবিবক্ষিতবাচ্য**।

(২) **অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনি :** ধ্বনির সৃষ্টিতে অনুপযোগী হ'য়েও নূতন অর্থলাভের (ধ্বনির) পথটি মাত্র দেখিয়ে যেন স'রে পড়ে এমন যে বাচ্যার্থ, তাকে বলা হয় **তিরস্কৃত** ("যঃ অনুপপদ্যমানঃ উপায়তামাত্রেণ অর্থান্তরপ্রতিপত্তিং কৃত্বা পলায়তে ইব সঃ তিরস্কৃতঃ"—ধ্বন্যালোকলোচনে অভিনবগুপ্ত)।

(i) "ধৃতরাষ্ট্র। **অন্ধ** আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন, তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি।" —রবীন্দ্রনাথ।

'অন্ধ' কথাটার বাচ্যার্থ দৃষ্টিহীন। ধৃতরাষ্ট্র যে 'বাহিরে' **অন্ধ** তা সত্য। কিন্তু 'অন্তরে'? এখানে মুখ্যার্থ বাধিত—অন্তরের তো চর্ম্মচক্ষু থাকে না। ওই 'দৃষ্টিহীন' অর্থটার অনুসরণে **লক্ষণায় অন্তরে 'অন্ধ'** মানে বিচারবোধহীন। আগের উদাহরণে 'দুর্যোধন' শব্দটার বাচ্যার্থ স্বয়ং খানিকটা কাজ করেছে, বাকীটার জন্য লক্ষণাকে নিয়েছে সহকারিরূপে। **এখানে** 'অন্তরে **অন্ধ**' স্বয়ং কিছুই করতে পারল না, লক্ষণার হাতে ভার দিয়ে যেন স'রে পড়ল। **লক্ষ্যার্থ 'বিচারবোধহীন'** স্বয়ং ব্যঞ্জক হ'য়ে অঙ্গুলিসঙ্কেত করল ধৃতরাষ্ট্রের অস্বাভাবিক বাৎসল্যের দিকে, যে বাৎসল্য দুর্য্যোধনেব পাপে কুরুবংশ অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসেব মুখে দ্রুত চলেছে জেনেও আপনাকে সংযত করতে পারছে না, তাব প্রতিটি অন্যায় প্রতিটি পাপকে নির্ব্বিচারে সমর্থন ক'রে যাচ্ছে। এইটুকু হ'ল **ধ্বনি—অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য** ধ্বনি (অত্যন্ততিবস্কৃত=অতীব-তির্য্যক্কৃত=extremely oblique)।

(আ) **অভিপ্রায়মূলক ধ্বনি :**

এর স্বরূপ-পরিচিতি দিয়ে এসেছি ধ্বনি-আলোচনার আবম্ভেই। এ ধ্বনিকে **বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি** বলা হয়। কথাটা ভাঙলে হয় **বিবক্ষিত-অন্যপর-বাচ্য।** 'বিবক্ষিত' আব 'অন্যপর' দুটোই 'বাচ্য'-ব বিশেষণ। লক্ষণামূলক ধ্বনিতে ব'লে এসেছি যে ওখানে বাচ্য অর্থটি কবির অভিপ্রেত নয় ('অবিবক্ষিত')। এখানে তার বিপরীত—বাচ্য অর্থটিও বিবক্ষিত। এর তাৎপর্য্য এই যে বাচ্য আপনাকে বজায় রেখেই প্রকাশ করবে ব্যঙ্গ্য অর্থকে এবং এই ব্যঙ্গ্য অর্থটিই হবে মুখ্য ('অন্যপর'=ব্যঙ্গ্যপ্রধান) আর মুখ্যরূপে প্রকাশমান এই ব্যঙ্গ্যই হবে বস্তুধ্বনির, অলঙ্কারধ্বনির, ভাবধ্বনির, রসধ্বনির বৈশিষ্ট্য ("মুখ্যতয়া প্রকাশমানঃ ব্যঙ্গ্যঃ অর্থঃ ধ্বনেঃ আত্মা"—আনন্দবর্দ্ধন;

'মুখ্যতয়া' অর্থাৎ মুখ্যরূপে=অঙ্গিরূপে : "অঙ্গিত্বেন প্রধানত্বেন অবভাসমানঃ" —অভিনবগুপ্ত)। আনন্দবর্দ্ধনের 'ধ্বনেঃ আত্মা'-র আত্মা soul নয়, স্বভাব ("আত্মশব্দঃ স্বভাববচনঃ"—অভিনবগুপ্ত)।

অভিধামূলক ধ্বনির মূল প্রকারভেদ দুটি—**সংলক্ষ্যক্রম** আর **অসংলক্ষ্য-ক্রম**।

'ক্রম' মানে পৌর্ব্বাপর্য্য (sequence), সোজা কথায়, 'আগেপাছে' এই সম্বন্ধ। অভিধামূলক ধ্বনিতে বাচ্যার্থ নিজেকে প্রকাশ করার সঙ্গে ব্যঙ্গ্যার্থ অর্থাৎ ধ্বনিকেও প্রকাশ করে। কিন্তু কাব্যপাঠক **বাচ্যার্থ** বোঝেন **আগে, ব্যঙ্গ্যার্থ পরে**। সময়-ব্যবধান যতই কম হোক, তবু আছেই একটু। কাজেই 'ক্রম' বা পৌর্ব্বাপর্য্য না মানলে উপায় নাই। তবে **রসধ্বনির** বেলায় পাঠকের বাচ্যার্থপ্রতীতি মাঝখানে বিশ্রাম না নিয়ে এমন রন্‌রন্ ক'রে ছুটে চ'লে যায় ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতিতে যে ক্রম থাকলেও তা লক্ষ্য করা যায় না। ("তৎপর্য্যন্তানুসরণরণবণকত্বরিতা মধ্যে বিশ্রান্তিং ন কুর্ব্বতে ইতি ক্রমস্য সতঃ অপি অলক্ষণম্"—অভিনবগুপ্ত)। এই কারণে রসধ্বনি **অসংলক্ষ্যক্রম**।

বস্তুধ্বনি আর অলঙ্কারধ্বনি সংলক্ষ্যক্রম। আচার্য্য অভিনব এদের কাব্যেব আত্মা ব'লে স্বীকার করেন না ; তাঁর মতে এরা কাব্যের **প্রাণ** মাত্র ("বস্ত্বলঙ্কারধ্বনেঃ জীবিতত্বম্" ; জীবিত=প্রাণ)।

ভাবাস্বাদ রসাস্বাদ যে সব কাব্যেই থাকবে, এমনটা তো আশা করা যায় না। এমন বহু কবিতা আছে, যারা রসোত্তীর্ণও নয়, ভাবোত্তীর্ণও নয় ; অথচ তাদের মধ্যে হয়তো বস্তু বা অলঙ্কার আপন মহিমায় অথবা উভয়ে মিলিত মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে আছে, যেহেতু তাদের উপভোগ্যতা বাচ্যে নয়, ধ্বনিতে। তারাও নিশ্চয় উচ্চাঙ্গের কাব্য।

(১) সংলক্ষ্যক্রম

(I) বস্তুধ্বনি

'বস্তু' মানে বিষয়বস্তু। রসের সঙ্গে এর একটা দূর সম্পর্ক থাকা সম্ভব ; না থাকলেও ক্ষতি নাই—আধুনিক কাব্যে বহুক্ষেত্রে রসপরিভাষায় কাব্যবিচার সম্ভব নয়, অথচ ধ্বনিমহিমায় তারা ভাস্বর এবং উপভোগ্য। পরে আলোচ্য অলঙ্কারধ্বনি-সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

(i) **বস্তু হ'তে বস্তু ঃ**

(১) 'মুক্তাফল-রচিত-প্রসাধনা
সতিনীদের মাঝে
শিখিপুচ্ছকর্ণবিভূষণা
ব্যাধবনিতা গর্ব্বভরে রাজে।'—শ. চ.
('ধ্বন্যালোক' থেকে)

—গজকুম্ভ থেকে মুক্তো সংগ্রহ করতে সুদূর বনে গিয়ে ব্যাধের দিনের পর দিন কাটিয়ে আসার মানে অন্য পত্নীদের উপর তার টানের অভাব; আর বাড়ীতে ব'সেই সহজলভ্য চন্দ্রিকাসুন্দর ময়ূরপুচ্ছের কর্ণাবতংস রচনা ক'রে বনিতাটিকে দেওয়ার মানে ব্যাধের এত ভালোবাসা এর উপর যে এটিকে চোখের আড়াল করাও তার পক্ষে অসম্ভব। এই হ'ল ধ্বনি। 'রতি' স্থায়িভাব রয়েছে বটে, কিন্তু বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাবের অভাবে শৃঙ্গাররসনিষ্পত্তি হয় নাই। 'সতিনীরা' স্বামীর ভালোবাসায় বঞ্চিতা আর 'বনিতাটি' গভীর ভালোবাসার সৌভাগ্যে গর্ব্বিতা—এই **বস্তুটি**মাত্র **ধ্বনিত** হয়েছে এদের **অলভূষণরূপ বস্তুর** দ্বারা।

(২) "এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্তভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা;........." —রবীন্দ্রনাথ।

—আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্গারের ব্যভিচারী 'উন্মাদ' ব'লে মনে হয়; কিন্তু বিশ্বের কবিতারূপা কবির বাসনালোকচারিণী মানসী সন্ততির সঙ্গে তো শৃঙ্গার চলে না। **শুদ্ধ বস্তুধ্বনি—কবির দিগ্‌দিগন্তপরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য্যচেতনা।**

মন্তব্য ঃ প্রথমটিতে 'মুক্তাফল' আর 'শিখিপুচ্ছ' শব্দদুটির অর্থশক্তি থেকে ধ্বনির উদ্ভব। বাচ্যার্থ আর ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যেকার ব্যবধানটুকু দেখা যাচ্ছে; তাই সংলক্ষ্যক্রম। দ্বিতীয়টিতে 'অনন্ত', 'স্বর্গ হ'তে মর্ত্তভূমি' (Space), সন্ধ্যা হ'তে উষা (Time)—এদের অর্থশক্তি থেকে উদ্ভূত ধ্বনি, আগেরটির মতন 'ক্রম' সংলক্ষ্য।

(ii) **অলঙ্কার হ'তে বস্তু ঃ**

(১) 'অযোধ্যার প্রাসাদভবনে
রাম দূর্ব্বাদলশ্যাম লভিলেন জন্ম যেই ক্ষণে,

লঙ্কেশকিরীট হ'তে নিপতিত মাণিক্যের ছলে
স্বর্ণলঙ্কারাজলক্ষ্মী-অশ্রুবিন্দু ঝরিল ভূতলে।'—শ. চ.

—'মাণিক্যের ছলে অশ্রুবিন্দু ঝরিল'-তে **অপহ্নুতি অলঙ্কার**। এই অলঙ্কারের দ্বারা **ধ্বনিত হচ্ছে যে বস্তুটি সে হ'ল অদূর ভবিষ্যতে রাবণরাজ্যের ধ্বংস**।

(২) "নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই" —মধুসূদন।

—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাওয়ার আগে জননীর কাছে বিদায়গ্রহণকারী ইন্দ্রজিতের প্রতি জননীর উক্তি। মন্দোদরীর ইন্দ্রজিৎ ('তুই') 'নয়নের তারা' : **রূপক অলঙ্কার**। জননীর মুখে কবি যে এই অলঙ্কারটি বসিয়েছেন, অলঙ্কারত্বই এর একমাত্র পরিচয় নয়; এর বৃহত্তর এবং গভীরতর পরিচয় এর দ্বারা দ্যোতিত **ইন্দ্রজিতের প্রত্যাসন্ন মৃত্যুরূপ বস্তুধ্বনি**।

(৩) "তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নিচে, কে জানে ঠিকানা,
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।"—রবীন্দ্রনাথ।

—'মাটির আকাশ' : **রূপক**; 'তৃণদল ঝাপটিছে ডানা' : **সমাসোক্তি**। 'মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা বীজের বলাকা' : **সাঙ্গরূপক**। এই সব **অলঙ্কার** ব্যঞ্জক হ'য়ে **ধ্বনিত করছে যে বস্তুকে সে** হ'ল : **দৃশ্য অদৃশ্য সর্ব্বলোকে নিত্যকাল বিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে চলেছে প্রাণশক্তির নিরবচ্ছেদ গতিপ্রবাহ**।

(II) অলঙ্কারধ্বনি

অলঙ্কারের বাহ্য অর্থাৎ পারিভাষিক লক্ষণের অভাব সত্ত্বেও বাচ্যার্থ আপন সামর্থ্যে ব্যঞ্জিত বা ধ্বনিত করে অলঙ্কারবিশেষকে।

(i) **বস্তু হ'তে অলঙ্কার :**

(১) 'পত্রহীন কুব্জদেহ বৃক্ষজন্ম লভিব এবার
বনদেশে। লোকালয়ে না চাহি জন্মিতে
সর্ব্বহারা দরিদ্রের ঘরে।' —শ. চ.

—'পত্রহীন' অর্থাৎ ছায়া দেওয়ার শক্তিটুকু নাই, পুষ্পফল তো দূরের কথা; 'কুব্জদেহ' অর্থাৎ কেউ যে কেটে নিয়ে গিয়ে ঘরের ছুটো খুঁটি কি আড়া তৈরী

করবে, কি একখানা তক্তপোষ বানাবে, সে উপায়ও নাই এত অপদার্থ ঐ কুঁজো স্থাড়া মুড়ো গাছটা—ও তো দেখছি সর্ব্বহারা দরিদ্রেরও অধম। কিন্তু সত্যই কি ও দরিদ্রের মতন অপদার্থ? তা তো নয়—পেঁচায় বাসা বাঁধতে পারে ওর কোটরে, মানুষের অন্য কোনো কাজে না লাগুক অন্ততঃ জ্বালানি কাঠ হ'য়েও তো তার উপকার করতে পারে। সর্ব্বহারা দরিদ্র মানুষের যে কোনো যোগ্যতাই নাই, কত ছোট সে ওই স্থাড়া কুঁজো গাছটার চেয়ে। এই বস্তু-রূপ বাচ্যার্থের ব্যঞ্জনা থেকে পেলাম—**ব্যতিরেক অলঙ্কারধ্বনি :** উপমেয় 'মানুষ' উপমান 'গাছে'র চেয়ে নিকৃষ্ট। **'চাহি না'-র** অর্থশক্তি ধ্বনির স্রষ্টা।

(২) "যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
সুদূর আকাশে আঁকা
আমি ভালোবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা॥" —রবীন্দ্রনাথ।

—এখানেও **ব্যতিরেক অলঙ্কারধ্বনি**; উপমেয় প্রজাপতি উপমান ইন্দ্রধনুর চেয়ে যে উৎকৃষ্ট তাই দ্যোতিত হচ্ছে বাচ্যার্থের দ্বারা। '**মোর** ধরণীর' আর 'প্রজাপতি**টি**র' একদিকে এবং '**সে**' আর '**সুদূর** আকাশ' অন্যদিকে। বর্ণসাদৃশ্যে প্রজাপতি আর ইন্দ্রধনু সমজাতীয়; কিন্তু '**মোর**' আর 'প্রজাপতি'র উত্তর '**টি**' প্রত্যয়টি প্রজাপতির উপর কবির স্নেহপক্ষপাত দ্যোতিত করায় প্রজাপতিটিই হ'য়ে উঠেছে কবির আপনার ধন এবং 'সে' আর 'সুদূর' ইন্দ্রধনুকে ক'রে তুলেছে পর। কবির ভালোবাসার অনুরঞ্জনে প্রজাপতি হয়েছে ইন্দ্রধনুর চেয়ে সুন্দরতর। ব্যতিরেক অলঙ্কারধ্বনি।

(ii) **অলঙ্কার হ'তে অলঙ্কার :**

এইজাতীয় ধ্বনিতে পারিভাষিক লক্ষণযুক্ত স্পষ্ট অলঙ্কার দ্যোতনা করে ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারের।

(১) 'চিরদিন ছিল সাধ—কল্পতরু হেরিব নয়নে;
সে সাধ পূরিল মোর আজিকে তোমার দরশনে।'—শ. চ.
('চিত্রমীমাংসা' হ'তে)

—এখানে লক্ষণযুক্ত পারিভাষিক অলঙ্কার '**বিশেষ**'। বিনা আধারে যদি আধেয় (a thing contained without a container) থাকে তাহ'লে হয় **বিশেষ অলঙ্কার**। কল্পতরু আধেয়, তার আধার স্বর্গের নন্দনকানন। এখানে নন্দনকানন নাই, কল্পতরু রয়েছে; অলঙ্কার **বিশেষ**। এই **বিশেষ** দ্যোতিত করছে—তুমিই কল্পতরু : **রূপকধ্বনি**।

(২) 'কবি-রবির বাণী
হাসিয়া যেন কহিছে, 'পিতামহ,
রচিত মোর নব ভুবনখানি
নয়ন ভরি বারেক দেখি লহ'।' —শ. চ.

—'বাণী'=কাব্য। অচেতন বাণীর পক্ষে হাসি বা কথা বলা সম্ভব নয়, তাই 'বাণী হাসিয়া **যেন** কহিছে': **অলঙ্কার উৎপ্রেক্ষা**। 'পিতামহ' ভুবনভাবন ব্রহ্মা। ভুবন একটিই। কাব্যসৃষ্ট ভুবনকে **'নব'** বিশেষণে বিশিষ্ট করায় **অলঙ্কার** হয়েছে 'অভেদে ভেদ' লক্ষণের **অতিশয়োক্তি**। উৎপ্রেক্ষিত পরিহাস আর এই অতিশয়োক্তি দ্যোতনা করছে যে কাব্যসৃষ্ট জগৎ পিতামহসৃষ্ট জগতের চেয়ে উৎকৃষ্ট: **ব্যতিরেক অলঙ্কারধ্বনি**।

অর্থশক্তি থেকে ধ্বনির উদ্ভব কেমন ক'রে হয়, অনেকগুলি উদাহরণে তা দেখিয়ে দিলাম। এখন একটি উদাহরণ দিচ্ছি, যার ধ্বনি **শব্দশক্তি** থেকে উদ্ভূত:

(১) 'নাহি ভিত্তি, নাহি উপাদান ;
তবু এ জগৎচিত্র লীলায় করিছ নিরমাণ।
কলানাথ শঙ্কর, তোমার
চরণে কবির নমস্কার।'—শ. চ.
(বসুগুপ্তের অনুসরণে)

—বিনা ভিত্তিতে বিনা উপাদানে চিত্র-নির্মাণ পরস্পরবিরোধী ; কিন্তু নির্মাণ করছেন যিনি তিনি শঙ্কর, তাই বিরোধ কেটে গেল: **বিরোধাভাস** অলঙ্কার। এর থেকে দ্যোতিত হচ্ছে যে শিল্পী শঙ্কর, পটের উপর রঙ তুলি ইত্যাদি উপাদানের সাহায্যে চিত্রনির্মাণ করেন যিনি সেই শিল্পীর চেয়ে উৎকৃষ্ট—**ব্যতিরেক অলঙ্কারধ্বনি**। কিন্তু এই ধ্বনির প্রাণ নিহিত রয়েছে **চিত্র** আর **কলা** এই দুটি **শব্দের শক্তিতে**। এরা পরিবর্তন সইবে না ; কারণ এদুটিতে রয়েছে **শব্দশ্লেষ** অলঙ্কার: জগৎ-পক্ষে চিত্র—বিচিত্র (বিশেষণ) আর সাধারণ শিল্পিপক্ষে চিত্র=ছবি এবং শঙ্করপক্ষে কলা=চন্দ্রকলা আর সাধারণ শিল্পীর প্রসঙ্গে শিল্পনৈপুণ্য। এই দুটিরই অনুষঙ্গে 'ভিত্তি' আর 'উপাদান'ও শ্লিষ্ট হ'য়ে গেছে: ভিত্তি=(i) আধার, (ii) পট এবং উপাদান=(i) রূপ রস ক্ষিতি অপ্ ইত্যাদি, (ii) রঙ তুলি।

অনুস্বানসন্নিভ ধ্বনি

আগে বলেছি সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির অপর নাম অনুস্বানসন্নিভ ধ্বনি। **অনুস্বান** মানে **অনুরণন** (resonance)। ধরা যাক, একটা প্রকাণ্ড হলঘরের

দুই প্রান্তে দুটো তবলা 'ডি শার্পে' বাঁধা আছে। এক প্রান্তের তবলায় যদি একটা চাঁটি মারা হয়, অন্য প্রান্তের তবলাটিতে কান পাতলে একটু পরেই শোনা যাবে যে ওই সুরটিই এতেও মিহিভাবে বেজে উঠছে। এটা স্বাভাবিক। দুটোই এক সুরে বাঁধা থাকায় প্রথমটিতে আঘাত করলেই ওতে উৎপন্ন অর্থাৎ আহত-বায়ুকম্পনের (ধরা যাক, সেকেণ্ডে ৩৭৫) ঢেউ দ্বিতীয়টিকে প্রহত করবেই, কারণ আহত অবস্থায় দুটোরই কম্পনসংখ্যা এক। দ্বিতীয়টির ভাইব্রেশন্ সিম্প্যাথেটিক। তবলাদুটি পরস্পর থেকে একটু দূরবর্ত্তী ব'লে প্রথমটির **'রণন'** ('স্বান'=শব্দ) দ্বিতীয় তবলাটিতে হবে **অনু-** (পশ্চাৎ) **রণন**; পূর্ব্বপশ্চাৎ সম্বন্ধটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারায় রণন আর অনুরণনের **ক্রমটি সংলক্ষ্য**। কাব্যে বাচ্যার্থবোধ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতিতে পৌঁছোনোর পথটুকু শব্দশক্তি বা অর্থশক্তি হ'তে বুঝতে (লক্ষ্য করতে) পারা যায় ব'লে **বস্তুধ্বনি** আর **অলঙ্কারধ্বনি সংলক্ষ্যক্রম**।

(২) অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি

কিন্তু কোনো তারের যন্ত্রে দুটি পাশাপাশি তার ওই ডি শার্পে বেঁধে যদি একটি তারে মেজরাপে ক'রে ঘা দিই, সঙ্গে সঙ্গে দেখব দ্বিতীয় তারটি ধোঁয়ার মতন কাঁপছে; এর আওয়াজ দ্বিতীয় তবলার মতন স্পষ্ট ধরতে পারছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি প্রথম তারের আওয়াজটি দানাদার হ'য়ে দীর্ঘায়ত হ'য়ে যাচ্ছে দেখে। এখানেও আগে-পাছে রয়েছে, কিন্তু এত গায়ে গায়ে যে লক্ষ্য করা কঠিন। কাব্যে বাচ্যার্থ আর ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে ক্রমটি থাকা সত্ত্বেও **ভাবধ্বনি** আর **রসধ্বনি**তে তাকে যেন ঠিক ধরা যায় না, বাচ্য-ব্যঙ্গ্য যেন অব্যবহিত ব'লে মনে হয়; এই কারণে এই ধ্বনিদুটিকে বলা হয় **অসংলক্ষ্যক্রম**।

(I) ভাবধ্বনি

কাব্যের বিভাব অনুভাব কথাদুটির শেষ অংশ 'ভাব' হ'লেও এরা ভাব নয়; সত্যকার **ভাব** স্থায়িভাব আর ব্যভিচারী ভাব। ভাবধ্বনি মানে ধ্বনিত ব্যভিচারী ভাব।

(i) 'দেবর্ষি যবে কহিলা একথা,
পিতার পার্শ্বে পার্ব্বতী নতাননী
হেরিতে লাগিল লীলাকমলের
দলগুলি গণি গণি।' —শ. চ.

(কুমারসম্ভবের "এবংবাদিনি দেবর্ষৌ......"এর অনুবাদ)

—'একথা' মহেশ্বরের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহের প্রস্তাব। **দেবর্ষি—অঙ্গিরা** (নারদ **নয়** : পার্ব্বতীর সঙ্গে নিজের বিবাহের ঘটকালি করতে হিমাচলের কাছে শিব পাঠিয়েছিলেন বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী সহ অঙ্গিরাপ্রমুখ সপ্তর্ষিকে ; সপ্তর্ষি=অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ আর ক্রতু। **দেবর্ষি=অঙ্গিরা**।)।

একটা অদ্ভুত ভুল :

কুমারসম্ভবের এই শ্লোকটির 'দেবর্ষি' কথাটার মানে (১) অতুল গুপ্ত মশায় 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় লিখেছেন 'নারদ', (২) 'কাব্যালোক'-এ সুধীরকুমার লিখেছেন 'নারদ', (৩) সাহিত্যদর্পণ-ব্যাখ্যায় রামচরণ তর্কবাগীশ লিখেছেন 'নারদ' ["দেবর্ষৌ নারদে"]—আশ্চর্য্য ! কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে (৪) প্রখ্যাত কবি এবং প্রখ্যাততর আলঙ্কারিক পণ্ডিতরাজ **জগন্নাথ**ও তাঁর **'রসগঙ্গাধর'** গ্রন্থে লিখেছেন 'নারদ' ["নারদকৃতবিবাহপ্রসঙ্গবিজ্ঞানোত্তরম্……"] !

সকলেই কাজ করেছেন সংস্কারের বশে ; 'কুমারসম্ভব' কেউ খুলে দেখেন নাই !

মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক। অঙ্গিরা হিমাচলের কাছে করলেন পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের পরিণয়প্রস্তাব ; পিতার পার্শ্বে উপবিষ্টা পার্ব্বতী ওই কথা শুনে নতমুখে লীলাকমলের পাপড়ি গুনতে লাগলেন। এই হ'ল কবিতাটির বাচ্যার্থ—একেবারে সাদাসিধে। কিন্তু এইটুকুর মধ্যেই অথচ একে অতিক্রম ক'রে আর একটি অর্থ প্রকাশমান হ'য়ে উঠেছে, যার পারিভাষিক নাম **অবহিত্থা**। **অবহিত্থা** তেত্রিশটি **ব্যভিচারী ভাবের অন্যতম**। স্থায়িভাবের মতন ব্যভিচারীও **ভাব**; এই কারণে **এরও থাকে নিজস্ব বিভাব অনুভাব**। ভাব হ'লেও ব্যভিচারী স্বাধীন নয়, স্থায়ীর পরতন্ত্র—স্থায়ী হ'তেই তার জন্ম, স্থায়ীতেই ক্ষণিক স্থিতি, স্থায়ীতেই লয়। এ অবস্থা তার **রসধ্বনিতে,** যেখানে রসই ব্যঙ্গ্য (আত্মা)। কিন্তু **কাব্যে অনেক সময় ব্যভিচারী প্রাধান্য লাভ ক'রে স্বয়ং আস্বাদ্য হ'য়ে ওঠে ভাবধ্বনিরূপে**।

আমাদের আলোচ্যমান 'দেবর্ষি যবে' ইত্যাদি কবিতাটিতে **অবহিত্থা হয়েছে ভাবধ্বনি**। এ অবহিত্থার সম্পর্ক রয়েছে শৃঙ্গাররসের সঙ্গে দূরগতভাবে। **ভাবাস্বাদই এখানে প্রত্যক্ষ, রসাস্বাদ অতিপরোক্ষ**। উপযুক্ত বিভাব অনুভাবের অভাবে শৃঙ্গার এখানে পূর্ণতা লাভ করতে পারে নাই, ব্যভিচারী পেয়েছে তার বিভাব অনুভাব রয়েছে ব'লে।

পার্ব্বতীর **অবহিত্থাকে** বুঝতে চেষ্টা করা যাক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথে। একান্তবাঞ্ছিত মহেশ্বরের প্রতি পার্ব্বতীমনের সহজ-প্রবণতা, যার নাম রতি। এই রতি উদ্দীপিত হ'ল বিবাহপ্রস্তাবে। উদ্দীপিত রতির স্বাভাবিক ফল হর্ষ, যার অবশ্যম্ভাবী প্রকাশভূমি তাঁর চোখমুখ। কিন্তু এই হর্ষজনিত বিকার প্রকাশিত হওয়ার আগেই এল লজ্জা—সম্মুখে গুরুজন। লজ্জা জাগিয়ে দিলে সেই গৌণ বাসনাকে যার নাম **অবহিত্থা**। **অবহিত্থা** ব্যভিচারী হ'লেও **ভাব**, তাই সে স্বয়ং অবিকৃত; কিন্তু সে যে জেগেছে তার প্রমাণ মিলল পার্ব্বতী-দেহের নূতন বিকারে—মুখ অবনত করায় আর লীলাপদ্মের দলগণনায়। 'কাব্যপ্রদীপে' গোবিন্দঠাকুরদত্ত **অবহিত্থার** সংজ্ঞা :

"লজ্জাদ্যৈর্বিক্রিয়াগোপোঽবহিত্থাত্মঙ্গবিক্রিয়া।
ব্যাপারান্তরসক্তিত্ব-বদনানমনাদয়ঃ॥"

আমাদের আলোচ্যমান কবিতায় ব্যভিচারী ভাব অবহিত্থা, এর বিভাব লজ্জা, অনুভাব আনন-নতি ('বদনানমন') আর লীলপদ্মদলগণনা ('ব্যাপারান্তর-সক্তিত্ব')। 'দশরূপকে' ধনঞ্জয় বলছেন, "লজ্জাদ্যৈর্বিক্রিয়াগুপ্তৌ অবহিত্থা **অঙ্গবিক্রিয়া**" (সন্ধি ভেঙে দিলাম); টীকায় বলা হয়েছে—বিক্রিয়ার অর্থাৎ বিকারের লজ্জাদিহেতু যে গুপ্তি, তার নাম অবহিত্থা এবং অঙ্গবিক্রিয়া (আমাদের উদ্ধৃতির স্থূলাক্ষর কথাটি) তার **অনুভাব** ("বিক্রিয়ায়াঃ বিকারস্য লজ্জাদিবশেন যা গুপ্তিঃ সা অবহিত্থা, তত্র অঙ্গবিক্রিয়া **অনুভাবঃ**")।

বাচ্যাতিশায়ী বিভাব-অনুভাবসংবলিত ব্যভিচারিচর্ব্বণাই এ কবিতার প্রাণ; তাই **ধ্বনি এখানে অসংলক্ষ্যক্রম (অবহিত্থানামক ব্যভিচারি-) ভাবধ্বনি**। বাচ্যবোধ আর ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হয় ব'লে 'ক্রম' **অসংলক্ষ্য**।

মন্তব্য : 'কাব্যালোকে' সুধীরকুমার লিখেছেন, "ইহাও যে অবসানে রসধ্বনি হইয়াছে, তাহা আনন্দবর্দ্ধন লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য—'ইহ তু সামর্থ্যাক্ষিপ্ত-ব্যভিচারিমুখেন রসপ্রতীতিঃ'।" কথাটি ঠিক নয়। **আনন্দবর্দ্ধন "এবংবাদিনি…"-র ধ্বনিকে সংলক্ষ্যক্রম অনুস্বান ধ্বনি বলেছেন**; তাঁর মতে সাক্ষাৎ স্বশব্দনিবেদিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাব হ'তে রসাদিপ্রতীতি অর্থাৎ **রসধ্বনিই অলক্ষ্যক্রম**। কিন্তু এখানে অর্থাৎ "এবংবাদিনি…"-তে (**"ইহ তু"**) সামর্থ্যব্যঞ্জিত ব্যভিচারীর **প্রাধান্যের** ফলে ("ব্যভিচারি**মুখেন**") রসপ্রতীতি; তাই এটি অর্থাৎ "এবংবাদিনি…"-র ধ্বনি অন্য প্রকারের অর্থাৎ **সংলক্ষ্যক্রম** ("তস্মাৎ অয়ম্ অন্যঃ ধ্বনেঃ প্রকারঃ")।

আনন্দবর্দ্ধনের এই সিদ্ধান্তবাক্যটি এবং এর **অব্যবহিত** পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের **"ইহ তু"** আর **"মুখেন"** কাব্যালোককার লক্ষ্য করেন নাই।

আনন্দবর্দ্ধন "এবংবাদিনি…"-কে সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি বলেছেন; 'রসগঙ্গাধরে' পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁকে সমর্থন করেছেন। তবু আমি এ কবিতার ধ্বনিকে **অসংলক্ষ্যক্রম** কেন বললাম? অভিনবগুপ্ত প্রথমে অনেক যুক্তি দিয়ে এটিকে আনন্দবর্দ্ধনের মতন সংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি ব'লে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন; **কিন্তু** পরক্ষণেই তিনি বলেছেন—শুধু 'লজ্জা'-র দৃষ্টিতে বিচার করলে লক্ষ্যক্রম বলতে হয়; কিন্তু ব্যভিচারিরূপে পর্য্যালোচনায় এখানেও কিন্তু রস দূরবর্ত্তী হ'লেও ভাসমান; এ অবস্থায় **বলতেই হবে** যে ঐ **রসাপেক্ষায়** অর্থাৎ রসের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে **ধ্বনি এখানে অসংলক্ষ্যক্রম** ("রসস্ত অত্রাপি দূরতঃ এব ব্যভিচারিস্বরূপে পর্য্যালোচ্যমানে ভাতি ইতি **তদপেক্ষয়া অলক্ষ্যক্রমতা এব**। লজ্জাপেক্ষয়া তু তত্র লক্ষ্যক্রমত্বম্।") তদপেক্ষয়া= ভাবধ্বনির অসংলক্ষ্যক্রমতা relatively to রস। আমি এই অংশটুকুই গ'ড়ে তুলেছি আমার ব্যাখ্যায়।

একটা মূল্যবান্ প্রসঙ্গ :

মূল ধ্বনিকারিকায় **রসধ্বনি ভাবধ্বনি** (রসাভাস-, ভাবাভাস-, ভাবোদয়-, ভাবসন্ধি-, ভাবশান্তি-, ভাবশবলতা-ধ্বনি) **'অক্রম' (অসংলক্ষ্যক্রম)** ধ্বনি ব'লে সূত্রিত হয়েছে (ধ্বন্যালোক, ২।৩)। আনন্দবর্দ্ধনের মতে রসধ্বনি ভাবধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে অনুস্বানসন্নিভ সংলক্ষ্যক্রম হ'তে পারে। তিনি বলেন —যেখানে **সাক্ষাৎ শব্দনিবেদিত** বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী হ'তে রস বা ভাবের প্রতীতি হয়, সেইখানেই ক্রম **অসংলক্ষ্য**; আর যেখানে শব্দব্যাপার (অভিধা) ছাড়াই **অর্থ** নিজের সামর্থ্যে অন্য অর্থকে অভিব্যঞ্জিত করে, ক্রম সেখানে **সংলক্ষ্য** (ধ্ব. ২।২২ বৃত্তি)। কথাটা সুন্দর, কারণ যুক্তিসঙ্গত। 'সাক্ষাৎ শব্দনিবেদিত' মানে (স্থায়ীর বা ব্যভিচারীর) নিজস্ব, সুগঠিত বিভাব-অনুভাবরূপ বাচ্য হ'তে দ্রুত রসাদির প্রতীতি; আর 'অর্থ-সামর্থ্য' মানে বিভাব অনুভাব যেখানে অগঠিত বা অস্পষ্ট, মাত্র অর্থবিশেষ স্বয়ং বিভাব অনুভাব না হ'য়েও হওয়ার সম্ভাব্যতার দিকে ইঙ্গিত ক'রে সেই ইঙ্গিতের বলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রতীত করে রস বা ভাবকে। যে কখনো কুমারসম্ভব পড়েও নাই, শোনেও নাই, "এবংবাদিনি দেবর্ষৌ…"-এর মধ্যে ভাবরসের গন্ধও সে পাবে না। পূর্ব্বসূত্রটুকু ধরিয়ে দিলে তখন সে দেবর্ষির কথা আর পার্ব্বতীর

নতমুখে পদ্মদলগণনার সম্পর্কটি (অর্থাৎ 'ভাবে সপ্তমী'র পূর্ণ তাৎপর্য্যটি) বুঝবে এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে তার যদি অধিকার থাকে, তাহ'লে ঋষির বচনরূপ বিভাব আর পার্ব্বতীর কার্য্যরূপ অনুভাব থেকে হবে তার 'অবহিত্থা'-প্রতীতি। **ক্রম এ অবস্থায় নিশ্চয় সংলক্ষ্য।**

আনন্দবর্দ্ধনের মত যে যুক্তিসঙ্গত, তাতে সন্দেহ নাই; তবু তাঁর মত মেনে নেওয়া কঠিন। নিখুঁত অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনির সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন উদাহরণ অমরু, শীলাভট্টারিকা, বিজ্জকা, বিকটনিতম্বা ইত্যাদি কবির ক্ষুদ্রকায় স্বয়ংপূর্ণ নিটোল কবিতাবলীতে সহজেই মেলে; কিন্তু মহাকাব্য খণ্ডকাব্য ইত্যাদি হ'তে এবং আধুনিক কালের দীর্ঘ কবিতা হ'তে উদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষের মধ্যে নিখুঁত অসংলক্ষ্যক্রম ধ্বনি পাওয়া সুকঠিন। পূর্ব্বপ্রসঙ্গের (context) অনুস্মরণ এইজাতীয় কবিতায় আপনা হ'তেই আসে। কিন্তু কাব্যের ধারাবাহিক পাঠকের পক্ষে এই স্মরণ কবিতাটির ধ্বনিকে সংলক্ষ্যক্রম ক'রে তুলবে কেন? সত্যকার পাঠকের মানসপটভূমিতে context তো ভাসমান থাকে; এ অবস্থায় রসপ্রতীতি বা ভাবপ্রতীতি ঝটিতি হবে না কেন? কুমারসম্ভব যিনি গোড়া থেকে প'ড়ে আসছেন, "এবংবাদিনি"-তে তাঁকে হোঁচট খেতে হবে কেন?

আমার মনে হয় এই সব চিন্তা ক'রেই একাদশ শতকের মম্মটভট্ট, চতুর্দ্দশের বিশ্বনাথ রসধ্বনির সংলক্ষ্যক্রমতা স্বীকার করেন নাই।

(ii) "জান তুমি, তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে
সে ইচ্ছাটি তাঁরি
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি।"
"না, না, ছিছি, ছিছি।"
এই ব'লে সে মঞ্জুলিকা দুহাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে।
ভাবলে, "পোড়া মনের কথা এড়ায়নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো, এবার মরণ হোক॥"

—এখানেও 'রতি' পারস্পরিক ব'লে দূরবর্ত্তী পূর্ব্বরাগ-বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রয়েছে। এখানেও **অবহিত্থা**, কিন্তু শুধু প্রথম দিকে; পরক্ষণেই **বিষাদ**—

দুটি ব্যভিচারী। অবহিত্থার **বিভাব** লজ্জা, কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর **সমাজ-ভয়**—মঞ্জুলিকা বিধবা ; **অনুভাব** "না, না, ছিছি, ছিছি" আর "দুহাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে ছুটে গেল ঘরের থেকে।" যার প্রতি গোপন প্রেম সেই প্রিয়তমই যদি তা ধ'রে ফেলে, তবুও মেয়েদের লজ্জা হয় ; কিন্তু সে লজ্জার চেহারা আলাদা। মঞ্জুলির সেই লজ্জা আর লোকলজ্জা একাকার হ'য়ে গেছে—**"ছিছি, ছিছি"** আর "পোড়া মনের কথা"-র **পোড়া**-র ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। **দ্বিতীয় ব্যভিচারী** ভাব **বিষাদ** ; এর **বিভাব** মঞ্জুলির "মায়ের সাধ" পূর্ণ করার দুঃসাধ্যতা, যার ব্যঞ্জনা রয়েছে "আর কেন গো, এবার মরণ হোক"-এর মধ্যে আর **অনুভাব** "আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে…মরণ হোক"। শৃঙ্গার-রস অগঠিত। কবিতাংশটির আস্বাদ্যতা যুগপৎ দ্যোতিত দুটি ব্যভিচারীতে—**অবহিত্থা-বিষাদাত্মক ভাব (সন্ধি-) ধ্বনি।**

(iii) "ভাল হৈল আরে বঁধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥
আই আই পড়েছে মুখে কাজরেরই আভা।
ভালে সে সিন্দুরবিন্দু মুনির মনোলোভা ॥…
চারিদিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥"

—খণ্ডিতার পদ। **ব্যভিচারী** ভাব **অমর্ষ**, মোটামুটি যার নাম রোষ। এর **বিভাব** রাধাকর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গে **প্রতিনায়িকা** (চন্দ্রাবলী)-**সম্ভোগচিহ্ন-দর্শন** আর **অনুভাব** কৃষ্ণের প্রতি রাধার **উৎপ্রাস** (উপহাসময়ী উক্তি) বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রসের এ ব্যভিচারীর সম্পর্ক দূরবর্ত্তী, কারণ শৃঙ্গার অগঠিত। বিভাব-অনুভাবসহকৃত ব্যভিচারি-চর্ব্বণাই এ কবিতার আনন্দাত্মা। **অমর্ষ-ভাবধ্বনি।**

রসধ্বনি

রসাদি অর্থ যদি **বাচ্যের** প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের **অঙ্গি**-রূপে অবভাসিত হয়, তবেই সেই অর্থকে বলা হয় অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি।

রসাদি মানে রস, (ব্যভিচারী) ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবোদয়, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি আর ভাবশবলতা। শেষের এই পাঁচটি ভাবই ব্যভিচারী। এরা প্রত্যেকেই একটা অর্থ; অর্থের বাইরে রস বা ভাবের অস্তিত্ব নাই। যথাযোগ্য বিভাবাদির সহযোগে এই অর্থের চর্ব্বণাই আনন্দ-প্রতীতি। **বাচ্য** মানে সুসংগঠিত বিভাব অনুভাব। **অঙ্গী** মানে প্রধানতম অর্থ।

রসধ্বনি কথাটা **অভিনবগুপ্তের সৃষ্টি**। মূল ধ্বন্যালোকে বা আনন্দ-বর্দ্ধনের ব্যাখ্যায় 'রসধ্বনি' নাম কোথাও নাই, যদিও **ধ্বন্যালোকে কাব্যের সত্যকার আত্মা রস** এবং তার প্রকাশ ধ্বনিরূপে আর রসই হ'ল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি। অভিনবগুপ্ত তাই এর নাম দিলেন রসধ্বনি এবং বললেন এই **রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা** আর ভাবধ্বনি, বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি **প্রাণ**মাত্র ("**রসধ্বনেঃ** এব সর্ব্বত্র **মুখ্যভূতম্ আত্মত্বম্**"; "ব্যভিচারিণঃ **প্রাণত্বং** ভবতি"; "বস্তুলঙ্কারধ্বনেঃ অপি **জীবিতত্বম্**"—ধ্বন্যালোক-'লোচন'। 'জীবিত' = প্রাণ)।

ভাবধ্বনিপ্রসঙ্গে ব'লে এসেছি যে উপযুক্ত বিভাব আর অনুভাবের সংযোগে ব্যভিচারিচর্ব্বণাই ভাবধ্বনি। ধ্বন্যালোক ভাবধ্বনিকেও সংলক্ষ্যক্রম আর অসংলক্ষ্যক্রম এই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। উত্তরকালের বহু আলঙ্কারিক এ ভাগ স্বীকার করেন নাই।

কিন্তু ভাবধ্বনির নিজস্ব চমৎকারিত্ব যতই থাক, তবু সে রসের মুখাপেক্ষী। 'স্থায়ী' সমুদ্র, ব্যভিচারী তার ঢেউ। স্থায়ীকে বৈচিত্র্যদান তার জীবনধর্ম্ম। স্থায়ী মুখ্য, ব্যভিচারী গৌণ। গৌণ যতই আপনাকে জ্যোতির্ম্ময় ক'রে তুলুক, তবু পরমজ্যোতিঃস্বরূপ মুখ্যেরই সে অনুজ্যোতিঃ—"তমেব ভান্তম্ অনুভাতি"।

রসধ্বনির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা :

কাব্যের বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের সংযোজনায় পাঠকচিত্তে সমুদিত এবং পাঠককর্ত্তৃক সাক্ষাৎকৃত তাঁর যে নিজস্ব স্থায়িভাব, সেই স্থায়ীরই আনন্দময়ী চর্ব্বণা অর্থাৎ প্রতীতিই হ'ল **রসধ্বনি**।

("**রসধ্বনিঃ** স এব যো বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোজনোদিতস্থায়িপ্রতিপত্তিকস্য প্রতিপত্তুঃ স্থায্যংশচর্ব্বণাপ্রযুক্তঃ আস্বাদপ্রকর্ষঃ"—**অভিনবগুপ্ত**)।

ব্যাপারটা এইরকম :

কবি একটা রসকে রূপায়িত করতে তারই অনুগতভাবে গঠন করেন বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাব। বিভাববোধের, বিশেষ ক'রে, অনুভাববোধের পরেই কাব্যের নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে পাঠকের ঘটে **হৃদয়সংবাদ**। **সংবাদ** মানে **সমতা অর্থাৎ সমধর্ম্মতা**। এই মানসী ক্রিয়ার অপর নাম **তন্ময়ীভবন**। স্থায়ী তখন আর নায়কনায়িকাগত অর্থাৎ Objective থাকে না, হ'য়ে যায় পাঠকচিত্তগত অর্থাৎ Subjective। কাব্যপাঠের ফলে এই যে তন্ময়ীভবন, এর বীজ রয়েছে মানুষের লৌকিক জীবনে। রতি শোক ইত্যাদি মুখ্য বৃত্তি সংস্কাররূপে বর্ত্তমান মানুষের বাসনায়। জেগে ওঠার কারণ ঘটলে এরা ভেসে ওঠে চেতনায়, আত্মপ্রকাশ করে তার দেহ ভাষা ইত্যাদিকে আশ্রয় ক'রে। মানুষ আপন জাগ্রত বাসনাকে চেনে প্রত্যক্ষভাবে, অন্যের ওই বাসনাকে চেনে অনুমানে। অভ্যাসের ফলে এই অনুমান হয় প্রত্যক্ষবৎ, ঝটিতি। কখনো পায় সুখ, কখনো ব্যথা—সহানুভূতি, যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব। এর উপর যদি কারুর থাকে কাব্যের কলাকৌশল-সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তার সঙ্গে কাব্য-অনুশীলনের অভ্যাস, কবির কল্পনায় সৃষ্ট অলৌকিক বাঙ্ময় জগৎ আর তার নারীপুরুষকে সে প্রত্যক্ষ করে আপন ইন্দ্রিয়াতীত ভাবলোকে। সেইখানে চলে তন্ময়ীভবন। লৌকিক জগতের সহানুভূতি, অলৌকিক জগতের হৃদয়সংবাদ। নায়কনায়িকার স্থায়ীর অভিমুখী বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর এখানে অভিনব সুন্দর রূপ—এখানে এরা নায়কনায়িকাকে পিছনে ফেলে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় পাঠকচিত্তের স্থায়ীর দিকে। এদেরই সংযোজনায় স্থায়ীর রসায়ন।

এই কারণেই সংক্ষেপে বলা হয় বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগে স্থায়িচর্ব্বণাই রসপ্রতীতি। **প্রকারান্তরে স্থায়ীই রস ; স্থায়ীর স্থায়িত্ব বা রসের রসত্ব ততক্ষণ, যতক্ষণ চলে চর্ব্বণা।**

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন—

"শব্দসমর্প্যমাণ-হৃদয়সংবাদসুন্দর-বিভাবানুভাবসমুচিত-প্রাগ্‌বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমার-স্বসংবিদানন্দচর্ব্বণাব্যাপাররসনীয়রূপো **রসঃ** ॥"

(ধ্বন্যালোক-'**লোচন**' ১।৪)

আশ্চর্য্যসুন্দর এই একটি সমাসে গাঁথা রস-পরিচিতিটি।

কবির কাব্যরচনা থেকে আরম্ভ ক'রে সেই কাব্যপাঠে সহৃদয় পাঠকের চিত্তে রসের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত সমগ্র ধারাটির প্রতিটি স্তরের পরিচয় রয়েছে এই রসসংজ্ঞায়।

বিশ্লেষণপন্থায় এর ব্যাখ্যা করছি :

(কাব্যের উপাদান শব্দ। এই শব্দের উপাদানে কবি নির্ম্মাণ করেন বিভাব অনুভাব যথাযোগ্যরূপে তাঁর অভিপ্রেত স্থায়িভাবের অনুগত ক'রে। পাঠক যখন এই কাব্য পাঠ করেন, তখন প্রথমে হয় এই বিভাব অনুভাবের অর্থবোধ। তারপর, পাঠক যদি সহৃদয় হন, এই অর্থবোধ থেকে হৃদয়সংবাদের দ্বারা তাঁর চিত্তে কাব্যের স্থায়ীর সজাতীয় স্থায়ীর উদ্বোধন হয়। এই উদ্বোধনের ফলে কাব্যের বিভাব অনুভাব পাঠকের আত্মচিত্তের সঙ্গে সংযোজিত হওয়ায় নবীভূত, অতএব সুন্দর হ'য়ে ওঠে। এই অভিনব সুন্দর বিভাব অনুভাব পাঠকের চিত্তে জন্মান্তরনিবিষ্ট সংস্কাররূপা বাসনাকে করে রঞ্জিত। সুন্দর বিভাব অনুভাবে রঞ্জিত এই বাসনা পাঠকের স্ব-সংবিৎকে অনু-রঞ্জিত (উপরে উদ্ধৃতির 'অনুরাগ' দ্রষ্টব্য) ক'রে তাকে ক'রে তোলে সুকুমার। রস একটা সংবিৎমাত্র; তাই সংবিৎ আর আনন্দ অভিন্ন। কিন্তু এখানে সংবিৎ বিভাবানুভাবরঞ্জিত বাসনার অনুরঞ্জনে সুকুমার ব'লে আনন্দও বিশিষ্ট (absolute নয়; qualified)। এই বিশিষ্ট আনন্দসংবিৎ-এর যে চর্ব্বণাব্যাপার, এর দ্বারা রসনীয় অর্থাৎ স্বাদযোগ্য যে রূপ, তার নাম **রস**।)

এই হ'ল অভিনবগুপ্তকৃত রস-পরিচিতির বিশদীকৃতি। মনে হ'তে পারে যে এর শেষের দিক্‌টা একটু ঝাপ্‌সা হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু ঝাপ্‌সা মোটেই হয় নাই। যাকে বলা হয়েছে পাঠকের 'স্বসংবিদানন্দচর্ব্বণাব্যাপার', আসলে সে এই—বিভাব অনুভাবে রঞ্জিত (পাঠকের) **বাসনা** মানে তাঁর নিজস্ব **স্থায়ী**। এই স্থায়ীর অনুরঞ্জনে সুকুমার পাঠকের স্বসংবিৎ। স্থায়ি-অনুরঞ্জিত মধুর সংবিৎই সংবিদানন্দ। বড়ো বড়ো দার্শনিক পরিভাষা বাদ দিলে সহজ-বোধ্য সারতত্ত্ব যা পাওয়া যায়, তা হ'ল এই যে **পাঠকচিত্তে অভিব্যক্ত তাঁর নিজস্ব যে স্থায়ী ভাব, তারই প্রতীতিই রস**। ধ্বন্যালোকে **প্রতীতি, রসনা, চর্ব্বণা, আস্বাদন** একই অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, অভিব্যক্ত স্থায়িভাবটাই রস—"ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ", বলেছেন কাব্যপ্রকাশে মম্মটভট্ট। "ব্যক্তঃ"=অভিব্যক্তঃ।

রসের সংজ্ঞাটি শেষ ক'রেই অভিনব বলেছেন—এই হ'ল রসধ্বনি, এই হ'ল সত্যকার ধ্বনি, এই-ই হ'ল মুখ্য কাব্যাত্মা ("স চ কাব্যব্যাপারৈক-

গোচরো **রসধ্বনিঃ** ইতি, স চ **ধ্বনিঃ এব** ইতি, স **এব মুখ্যতয়া আত্মা** ইতি"—১।৪)।

শুধু বিভাব **অনুভাবের** কথা বললাম, ব্যভিচারীর নাম করি নাই ; কারণ, ব্যভিচারী স্থায়ীর অধীন ব'লে ওকে বিভাব অনুভাবের দলভুক্ত ব'লেই গণ্য করা হয় ("ব্যভিচারী তু চিত্তবৃত্ত্যাত্মত্বেঽপি মুখ্যচিত্তবৃত্তিপরবশ এব চর্ব্ব্যতে ইতি বিভাবানুভাবমধ্যে গণিতঃ"—ধ্বন্যালোক-**লোচন**, ১।১৮)।

কাব্যের স্থায়ীর স্থায়িত্ব ক্ষণিক—মাত্র ততক্ষণ, যতক্ষণ চলে তার আনন্দময়ী চর্ব্বণা। বিরোধী অবিরোধী কেউ এসে তাকে তার মণিপীঠ থেকে একচুল সরাতে পারে না ; এইখানেই তার 'স্থায়ী' নামের সার্থকতা।

কাব্য আর অকাব্য কাকে বলে নীচের উদাহরণদুটি থেকে তার কিঞ্চিৎ ধারণা হবে :

'আমার বঁধুর রতিপতি জিনি অনুপম মুখখানি ;
কথা কয় যবে কণ্ঠে তাহার বীণা যেন বেজে ওঠে।
সম্মুখে আসি সে যখন মোরে শোনায় প্রেমের বাণী,
কথা শুনি না কি মুখানি নিরখি ভাবিয়া পাই না মোটে।'—শ. চ.

—'রতি'-কে আশ্রয় ক'রেই যে চরণচারটি তৈরী করা হয়েছে, সে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যে-জাতীয় বিভাব অনুভাব তন্ময়ীভূত পাঠকচিত্তের রতিবাসনারূপ স্থায়ীকে, রস্যমানতা যার প্রাণ সেই স্থায়ীকে অভিব্যক্ত করে অভিব্যঞ্জনার রশ্মিপাতে, সেই বিভাব অনুভাব এখানে নাই—লৌকিক কারণ-কার্য্যকে বিভাব অনুভাবের অলৌকিক মহিমা কবি দান করতে পারেন নাই।

কিন্তু এই বিষয় নিয়েই প্রাচীন কবি (অষ্টম শতাব্দী) অমরু রচনা করেছেন সত্যকার কাব্য—

(i) "সুমুখে আসি প্রেমের বাণী শোনায় যবে প্রিয়,
বুঝিতে নারি তখন মোর নিখিল ইন্দ্রিয়
নয়ান হ'য়ে বয়ানখানি নিরখে বঁধুয়ার,
কিম্বা শোনে শ্রবণ হ'য়ে মধুর ঝঙ্কার।"

—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী ('অমরুশতক'—'পরিচয়' পত্রিকা)।

—স্থায়িভাব **রতি** যার **আশ্রয়ালম্বন নায়িকা**, বিষয়ালম্বন নায়ক। **উদ্দীপনবিভাব** প্রিয়কর্ত্তৃক প্রিয়ার সম্মুখে আসা আর 'প্রেমের বাণী' শোনানো, যা আবার নায়করতির অনুভাব। নায়িকারতির **অনুভাব** "বুঝিতে নারি··· মধুর ঝঙ্কার"। এ অনুভাবের ব্যঞ্জনা দ্বিমুখী—একটি মুখ প্রিয়তমের রূপ-

মাধুর্য্যের তথা প্রেমবাণীমাধুর্য্যের দিকে, অপরটি নায়িকার **অনুভবের** (-ভাবের নয়, -ভবের) দিকে। অপূর্ব্ব এই **অনুভব**—'নিখিল ইন্দ্রিয়' যদি 'নয়ান' হ'য়ে যায়, প্রিয়তমের মর্ম্মখানি উদ্‌ঘাটিত করছে যে 'প্রেমের বাণী' তা শোনা হয় না; আবার, যদি 'শ্রবণ' হ'য়ে যায়, প্রিয়তমের প্রেমকে কিঞ্চিৎ অনুভব করা যায় বটে, কিন্তু তার অন্তরের ভালোবাসার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না স্বভাবসুন্দর মুখখানিকে ক্ষণে ক্ষণে যে অভিনব মাধুর্য্য দান করছে, সেই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের বিকাশরূপ দেখা হয় না। দেখা আর শোনা একসঙ্গে চললে 'নিখিল ইন্দ্রিয়'-র ব্যঞ্জনার হয় অপমৃত্যু। তৃষ্ণার আতিশয্যজনিত এই যে অতৃপ্তি, এ হয় প্রেমের সেই অবস্থায় যার নাম **অনুরাগ**। বিভাব অনুভাবের, বিশেষ ক'রে অনুভাবের **অভিব্যঞ্জনায়** সহৃদয় পাঠকচিত্তে যার **অভিব্যক্তি** এবং **আনন্দময়ী প্রতীতি**, সে হ'ল **নায়িকার অনুরাগাত্মিকা রতি—বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গাররসধ্বনি**।

(ii) "এই ত মাধবীতলে আমারই লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনা হিয়া মোর ফাটিয়া না যায় কেন,
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি, বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরায় রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে॥" —গোবিন্দদাস।

—স্থায়িভাব **রতি**। এ রতির **আশ্রয়-আলম্বন রাধা** আর **বিষয়-আলম্বন** মথুরাগত **কৃষ্ণ**। **উদ্দীপন**বিভাব **'মাধবী'**। **অনুভাব** 'বড় দুখ …রহল গিয়া'। **ব্যভিচারী ভাব** (১) 'পিয়া বিনা…নাহি যায়' আর (২) 'এই বিধি লিখিল করমে'। **রস** বিরহবিপ্রলম্ভশৃঙ্গার। এই হ'ল স্থূল বিশ্লেষণ—রসের ব্যাকরণের দিকটি।

বিরহবিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসের ধ্বনিমুখ বিশ্লেষণঃ

উদ্দীপনবিভাব 'মাধবী'—মাধবীর দুটি বিশেষণঃ (১) 'এই ত' ('ত' নির্দ্ধারণ-বাচক অব্যয়), (২) 'আমারই…ধেয়ায়'। 'যোগী যেন' (উৎপ্রেক্ষা); কৃষ্ণ যোগীই তো—প্রেমযোগে ধ্যানমগ্ন তিনি, তাঁর ধ্যানৈকদেবতা রাধা ('আমারই')। এই তো সেই মাধবী, যার তলে কৃষ্ণ ব'সে থাকতেন রাধার ধ্যানে নিমগ্ন হ'য়ে। রাধার এবং তাঁর প্রিয়তম কৃষ্ণের যুগ্ম-সম্পর্কে এত সত্য

এই মাধবী যে আজও এই মাধবীর তলে প্রিয়তমকে যেন দেখতে পাচ্ছেন রাধা —কবির 'থেয়ায়' ক্রিয়াপদে বর্ত্তমানকালপ্রয়োগের এই দ্যোতনা। **সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা এই উদ্দীপনবিভাব মাধবীর।**

অনুভাব—এমনি অনুপম 'পিয়া' রাধার। এই পিয়া রাধাকে 'ছাড়িয়া মথুরায় রহল গিয়া'। রাধার বেদনা সীমাহীন—'বড় দুখ রহল মরমে'।

ব্যভিচারী ভাব—(১) **নির্ব্বেদ**। নির্ব্বেদ 'আত্মধিক্কার'। এর বিভাব রাধার 'মহতী আর্ত্তি', অনুভাব—

"পিয়া বিনা হিয়া মোর ফাটিয়া না যায় কেন
নিলাজ পরাণ নাহি যায়।"

(২) প্রিয়তম যে রাধাকে ছেড়ে মথুরায় রয়েছেন, তার জন্য দায়ী রাধা—কৃষ্ণকে হারাতে হবে এই যে তাঁর বিধিলিপি। রাধার মতন অভাগিনী জগতে আর কেউ নাই। এও **নির্ব্বেদ**—আত্মধিক্কার।

ব্যভিচারী অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দান করেছে রাধার রতিকে পরিপোষিত ক'রে।

গুণীভূতব্যঙ্গ্য

ললনালাবণ্যের মতন **প্রতীয়মান যে অর্থ, তার** প্রাধান্যে ধ্বনি, **অপ্রাধান্যে গুণীভূতব্যঙ্গ্য।**

'গুণীভূত' মানে অপ্রধান। ব্যঙ্গ্য অর্থ এখানে বাচ্যকে অতিক্রম ক'রে যায় না, বাচ্যের বাচ্যত্ব বজায় রেখেই তাকে সুন্দরতর ক'রে তোলে।

(i) 'প্রিয়তমের আঁখির আলোয় প'ড়ে নিলাম মন—
কখন্ হবে আজকে মোদের মধুরমিলনক্ষণ?
অম্‌নি করের কমলখানি কৈনু নিমীলন।'—শ. চ.

—শেষ চরণের ব্যঞ্জনালব্ধ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য অর্থ: রাত্রিতে। কিন্তু এ ব্যঙ্গ্য স্ব-তন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হ'তে পারে নাই; পারলে, 'সূক্ষ্ম' অলঙ্কার-দ্যোতিত বস্তুধ্বনি হ'য়ে যেত। নায়িকা প্রথম আব দ্বিতীয়, বিশেষ ক'রে দ্বিতীয়, চরণে যা স্বকণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, তার থেকেই তৃতীয় চরণের ব্যঙ্গ্যার্থবোধ সম্ভবপর হয়েছে। ব্যঙ্গ্য তাই এখানে গুণীভূত।

(ii) 'শরৎ মুগ্ধহিয়া
ধরালক্ষ্মীর আরতি করিছে কাশফুলে বীজনিয়া।'—শ. চ.

—অলঙ্কার এখানে একদেশবিবর্ত্তিরূপক; 'কাশফুল'-এর উপর 'শ্বেতচামর' আরোপটি ব্যঙ্গ্য। কিন্তু 'ধরালক্ষ্মী'-তে যে রূপক রয়েছে, তার উপমান 'লক্ষ্মী'। এই 'লক্ষ্মী' বাচ্য এবং বাচ্যেরই গুণীভূত হয়েছে ব্যঙ্গ্য 'শ্বেতচামর' অর্থাৎ 'শ্বেতচামর' ভাষায় প্রকাশিত না হ'য়ে প্রতীয়মান হওয়ায় বাচ্য 'লক্ষ্মী'-ই অধিকতর সুন্দর এবং উপভোগ্য হয়েছে।

(iii) 'উষসীর মুখ রাঙা হ'য়ে গেছে অরুণের অনুরাগে।'—শ. চ.

অলঙ্কার এখানে সমাসোক্তি 'উষসী'র উপর নায়িকাব্যবহার আরোপিত হওয়ার ফলে। **প্রস্তুত হ'তে অপ্রস্তুতের ব্যঞ্জনা হয় সমাসোক্তিতে** আর **অপ্রস্তুত হ'তে প্রস্তুতের ব্যঞ্জনা হয় অপ্রস্তুতপ্রশংসায়।** এখানে বস্তুধ্বনি বলা যায় না এই কারণে যে অরুণের অনুরাগে উষার রাঙা হ'য়ে যাওয়াটাই বাচ্যার্থ—অনুরাগ=অনু (পশ্চাৎ)-রাগ (রঙ); রক্তবর্ণ অরুণের অনুরঞ্জনে উষা রক্তাভ। সমাসোক্তির বেলায় অনুরাগ=প্রেম (রসশাস্ত্রের পরিভাষায় পূর্ব্বরাগ)। দেখা যাচ্ছে যে অরুণের রক্তরাগে উষার রক্তাভ

হওয়া-রূপ বাচ্যার্থটিকেই চমৎকৃতি দান করেছে ব্যঙ্গ্য অর্থটি। ব্যঙ্গ্য, অতএব, গুণীভূত।

যে সব অলঙ্কার ব্যঞ্জনার পথে সৃষ্ট, তাদের প্রত্যেকটিরই প্রতীয়মান অর্থ বাচ্যার্থের প্রতি গুণভাবাপন্ন ব'লে তারা গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণ।

এইবার যে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের কথা বলতে যাচ্ছি তার প্রকৃতির মধ্যে অসামান্যতা আছে ; তাই ভালো ক'রে তাকে বুঝতে হবে।

বিশেষক্ষেত্রে রস নিজেই গুণীভূতব্যঙ্গ্য হ'য়ে যায়। যে কবিতায় **অঙ্গী** অর্থাৎ প্রধানতম **রসের** এক বা একাধিক **অঙ্গও রস** হয়, সেখানে অঙ্গরসকে বলা হয় **রসবৎ অলঙ্কার**। এই অঙ্গরস স্বয়ং প্রাধান্য লাভ করতে পারে না অর্থাৎ কাব্যের আত্মা ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, তাকে পরিপোষণ করে বৈচিত্র্য দান ক'রে ; এই কারণে, **অঙ্গরস হয় অঙ্গী** রসের প্রতি গুণভাবাপন্ন।

(iv) 'আকাশে সূর্য্যেরে হানি একখানি রোষরক্ত আঁখি,
উচ্ছ্বসিত-অশ্রুভরা অন্যখানি কান্তমুখে রাখি
আসন্নবিরহভীতা দিনান্তে চাহিয়া চক্রবাকী।'—শ. চ.

—চক্রবাক-চক্রবাকীর রাত্রিতে বিরহ, দিনে মিলন। সূর্য্য এখন অস্তগমনোন্মুখ, বিরহ আসন্ন। বলতে গেলে সূর্য্য অস্তগত হ'য়ে এই বিরহ ঘটিয়ে দিচ্ছে। **প্রথম** চরণে **রৌদ্ররস** ('ক্রোধ' স্থায়ী ভাব), **দ্বিতীয়**টিতে **করুণরস** ('শোক' স্থায়ী ভাব); **কিন্তু সকলের মূলে বিরহবিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস**। এইটিই কাব্যাত্মা, রৌদ্ররস আর করুণরস গুণীভূতব্যঙ্গ্য।

লক্ষণা পরিচয়

(বাক্যের বা বাক্যাংশের অর্থের সঙ্গে তার অন্তর্গত কোনো পদের মুখ্য (বাচ্য) অর্থের যদি সঙ্গতি না পাওয়া যায়, তাহ'লে বলা হয় যে পদটির মুখ্যার্থ বাধিত (বাধাগ্রস্ত) হয়েছে। কবি তো নিরর্থক পদের প্রয়োগ করেন না; তাই, অর্থসঙ্গতি পদটির কোনো অমুখ্য অর্থের সাহায্যে হয় কি না, দেখতে হয়। সঙ্গত অমুখ্য অর্থ একটু চিন্তা করলে পাওয়া যাবেই, কারণ পদ ওইরকম অর্থও সৃষ্টি করতে পারে অন্য এক বৃত্তির বলে। এই বৃত্তির নাম **লক্ষণা**। নূতন অর্থটি **লক্ষ্য**; পদটি **লক্ষক**।

মনে রাখতে হবে যে নূতন অর্থাৎ লক্ষ্যার্থটির মুখ্যার্থের সঙ্গে, নিকট হোক বা দূর হোক, **একটা সম্বন্ধ থাকতেই হবে। মুখ্যার্থের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক এমন কোনো অর্থ লক্ষ্যার্থ হ'তে পারে না।**)

এইজাতীয় সম্পর্কের আংশিক আভাস রয়েছে ইংরিজি Metonymy, Synecdoche-র মাথায় লেখা সাধারণ ভিত্তি 'Association' কথাটিতে।

(পদ লক্ষণায় অর্থ প্রকাশ করে মাত্র দুটি **কারণে—রূঢ়ি** আর **প্রয়োজন**। **রূঢ়ি**=লোকপ্রসিদ্ধি; **প্রয়োজন**=উদ্দেশ্যসাধন। এদুটি ছাড়া লক্ষণা আর কোনো কারণেই হয় না।

রূঢ়িলক্ষণা: (i) "**নন্দীপুর** হেরে গেল, দুয়ো!" (প্রভাতকুমার)—অচেতন গ্রাম নন্দীপুরের পক্ষে 'হার' তো সম্ভব নয় (মুখ্যার্থে বাধা); তাই 'নন্দীপুর'-এর লক্ষ্যার্থ উক্তগ্রামবাসী (অবশ্য 'মাষ্টার'কে তাদের প্রতিনিধি ধ'রে)।

(ii) "**সেক্ষপীয়র** বড় বেশী পড়িতাম" (বঙ্কিমচন্দ্র)—সেক্ষপীয়র=তদ্রচিত নাটকাবলী। এদুটিতে Metonymy।

(iii) "**পরিবার** তার সাথে যেতে চায়" (রবীন্দ্রনাথ)—'পরিবার'=গার্হস্থ্যজীবনে যাদের দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে থাকা যায় (মুখ্যার্থে); কিন্তু এখানে পরিবার=পত্নী (লক্ষ্যার্থে)। এটিতে Synecdoche।

প্রয়োজনলক্ষণা:

এই লক্ষণাটি একটু জটিল, কিন্তু নানা কারণে অত্যন্ত মূল্যবান্। একটা উদাহরণের বিশ্লেষণমুখী ব্যাখ্যা করলে ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে।

"বুকভরা **মধু** বঙ্গের বধূ জল নিয়ে যায় ঘরে"—রবীন্দ্রনাথ।

—'মধু'র মুখ্যার্থ পুষ্পরস। বধূর বুকে পুষ্পরসের অবস্থিতি সম্ভব নয় ব'লে এ অর্থ এখানে বাধিত। এখন লক্ষণাবৃত্তিতে, সঙ্গত অথচ মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কি অর্থ পাওয়া যায়, দেখতে হবে। মধুর একটি গুণ উপাদেয়তা। বাঙলার বধূদের হৃদয়ও উপাদেয়। সুতরাং **উপাদেয়তা** এখানে **'মধু'-র লক্ষ্যার্থ। এইখানেই লক্ষণাবৃত্তির পরিসমাপ্তি।**

কবি কোনো বিশেষ **প্রয়োজনে**—সূক্ষ্মসুন্দর অর্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে চমৎকারসৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্যে (আচার্য্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যায় 'প্রয়োজন'= 'গোপনকৃত সৌন্দর্য্যাদিলাভের অভিসন্ধি'—ধ্বন্যালোক, ৩।৩৩) এখানে 'মধু'-শব্দপ্রয়োগে লক্ষণার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু **গোপন অর্থটি ব্যঙ্গ্য**, লক্ষ্য নয় ("প্রয়োজনেন সহিতং লক্ষণীয়ং ন যুজ্যতে"—কাব্যপ্রকাশ ২।১২)। ব্যাপারটা এইরকম—মধুর মুখ্যার্থ পুষ্পরস বাধিত, লক্ষ্যার্থ 'উপাদেয়তা' (এইখানেই লক্ষণার বিরতি), **প্রয়োজন** 'বাঙলাব বধূর স্নেহপ্রীতিসেবাপ্রেম প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়বৃত্তির আতিশয্যে'র দ্যোতনা: এ অর্থ ব্যঙ্গ্য এবং শুধু ব্যঙ্গ্য নয়, অবিবক্ষিতবাচ্য **ধ্বনি**।

একমাত্র প্রয়োজনলক্ষণারই ব্যঙ্গ্য অর্থ (অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি, যাকে বলে লক্ষণামূলক ধ্বনি) সৃষ্টি করার সামর্থ্য আছে, অবশ্য আপন শক্তিতে নয়, ব্যঞ্জনার সহকারিরূপে। রূঢ়িলক্ষণার এ শক্তি একেবারেই নাই। **'রূঢ়ি' স্থূল ব'লে অসুন্দর**, 'প্রয়োজন' সূক্ষ্ম ব'লে সুন্দর। তবে, সূক্ষ্মতার এবং সৌন্দর্য্যের তরতম আছে। 'তম'-রাই ধ্বনি।

সম্বন্ধভিত্তিতে লক্ষণার প্রকারভেদ :

আগে বলেছি, মুখ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের নিকট বা দূর একটা সম্বন্ধ থাকতেই হবে। এই সম্বন্ধকে ভিত্তি ক'রে আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণ লক্ষণার পাঁচটি প্রকার নির্দ্দেশ করেছেন। সম্বন্ধপঞ্চক—**সামীপ্য, সারূপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য, ক্রিয়াযোগ :**

"অভিধেয়েন সামীপ্যাৎ, সারূপ্যাৎ, সমবায়তঃ।
বৈপরীত্যাৎ, ক্রিয়াযোগাৎ লক্ষণা পঞ্চধা মতা॥"

অভিনবগুপ্ত বলেছেন, "অনয়া লক্ষণয়া পঞ্চবিধয়া বিশ্বম্ এব ব্যাপ্তম্" (ধ্বন্যালোক ১।১৮)। কথাটা অত্যন্ত সত্য। শুধু এদেশে নয়, সকল দেশে সকল কালে মানুষের মুখের ভাষাতেও শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ অত্যন্ত বেশী। ব্যঞ্জনার প্রয়োগও প্রচুর, তবু লক্ষণারই জয়জয়কার, কারণ বহুক্ষেত্রে লক্ষণাই মুক্ত ক'রে দেয় ব্যঞ্জনার পথ।

লক্ষণার আলোচ্যমান প্রকারপাঁচটির মধ্যে 'রূঢ়ি' ও 'প্রয়োজন' দুইই আছে।

প্রকারপঞ্চকের কথা—

(ক) **সামীপ্য :**

(i) "যাইতে **মানসসরে** কার না মানস সরে?"

(ii) **গোলদীঘিতে** আজ একটা সাহিত্য-সভা আছে।

—প্রত্যেকটিতে লক্ষ্যার্থ 'জলসমীপবর্ত্তী তটভূমি'। প্রথমটিতে শীতলতা এবং তীর্থ ব'লে পবিত্রতা ('গঙ্গায়াং ঘোষঃ'-র মতন)-গোছের একটা 'প্রয়োজন' থাকলেও, তার কোনো চমৎকারিত্ব নাই। দ্বিতীয়টি তো একেবারে অসুন্দর। আমাদের অলঙ্কার তো এদের অপাঙ্‌ক্তেয় ক'রে রেখেছেই; অর্থ 'transferred from the original sense' হওয়া সত্ত্বেও এইজাতীয় প্রয়োগকে ইংরেজও Figure বলতে পারেন নাই, যদিও তাঁদের Wordsworth-প্রমুখ কবিরা 'Lake-Poets' এবং Lake = লেকের ধার ('Association')। অথচ, আমাদের বাঙলায় এঁরা সম্প্রতি অলঙ্কার হয়েছেন!

(খ) **সারূপ্য :**

"পুত্রসুখ রাজ্যসুখ অধর্ম্মের পণে
জিনি ল'য়ে চিরদিন বহিব কেমনে
দুই **কাঁটা** বক্ষে আলিঙ্গিয়া?"—রবীন্দ্রনাথ।

—পুত্রসুখ এবং রাজ্যসুখ সত্যই কাঁটা নয়; কাজেই কাঁটার মুখ্যার্থ দুই সুখসম্পর্কে বাধিত। কাঁটা বেদনাদায়ক, অধর্ম্মে জয় করা সুখও বেদনা-দায়ক। এই বেদনাদায়কতা-ধর্ম্মে কাঁটা আর সুখের সারূপ্য অর্থাৎ সমান-রূপতা (অভেদ)। কাঁটার লক্ষ্যার্থ 'বেদনাদায়কতা'। সংস্কৃত উদাহরণ: 'রাজা গৌড়েন্দ্রং **কণ্টকং** শোধয়তি' (সাহিত্যদর্পণ)।

(গ) **সমবায় :**

এই সম্বন্ধটির ক্ষেত্র বহুব্যাপক। ন্যায়বৈশেষিকের জটিলতায় প্রবেশ না ক'রে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে—

(১) **অবয়ব-অবয়বী** (Part versus Whole),

(২) **জাতি-ব্যক্তি** (Genus vs. Species),

(৩) **আধার-আধেয়** (Container vs. Contents),

(৪) **সামান্য-বিশেষ** (General vs. Particular),

(৫) **গুণ-গুণী** (Abstract vs. Concrete),

(৬) ***স্বত্ব-স্বামিত্ব** (নানাভাবের Possession vs. Possessor),

(৭) **সংযোগ**।

[**মন্তব্য :** সংযোগ আর সমবায় শাস্ত্রমতে বিভিন্ন ; তবু আমি সংযোগকে সমবায়েরই অন্তর্ভুক্ত করলাম। 'যষ্টিগুলিকে প্রবেশ করাও' ("যষ্টীঃ প্রবেশয়") এই উদাহরণটির ব্যাখ্যাসূত্রে অভিনবগুপ্ত বলেছেন "সমবায়াৎ ইতি" (ধ্বন্যালোক ১।১৮)। এর 'বালপ্রিয়া' টীকায় বলা হয়েছে সমবায়সম্বন্ধ মানে 'আধার-আধেয়ভাবরূপ সম্বন্ধ'—যষ্টি=যষ্টিধারী লোক ; লোক আধার, যষ্টি আধেয়। এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়। মম্মটভট্ট উদাহরণটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, "**স্বসংযোগিনঃ** পুরুষাঃ আক্ষিপ্যন্তে" (কাব্যপ্রকাশ ২।১০)। এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত মনে করি ; কাব্যশাস্ত্রগত 'সমবায়' ঠিক ন্যায়বৈশেষিকের পথে চলে না।]

(১) **অবয়ব-অবয়বী :**

মাথাপিছু একটাকা চাঁদা।

'মাথা'-র লক্ষ্যার্থ 'লোক'। Synecdoche (Part for the Whole)। অলঙ্কার নয়।

(২) **জাতি-ব্যক্তি :**

(i) "ভালো, আমি **ভাষায়** বলিব" —রবীন্দ্রনাথ।

—ভাষা=বাঙলাভাষা (Genus for Species)

(ii) "এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি
কিসে **কড়ি** আসে ছুটো ?" —রবীন্দ্রনাথ।

—কড়ি=অর্থ (Species for Genus)

Synecdoche। অলঙ্কার নয়।

(৩) **আধার-আধেয় :**

(i) "নারিবে শোধিতে ধার কভু **গৌড়ভূমি**" —মধুসূদন।

(ii) "সমুদায় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জন" —কামিনী রায়।

—গৌড়ভূমির লক্ষ্যার্থ তার অধিবাসী বাঙালী ; জগতের=জগৎবাসীর। Metonymy (Container for Contents)। অলঙ্কার নয়।

* ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা থেকে নেওয়া।

(৪) **সামান্য-বিশেষ :**

(i) "তুমি, লাঠি। আর **লাঠি** নও" —বঙ্কিমচন্দ্র।

—লাঠির মুখ্যার্থ 'মানুষের দৈর্ঘ্যের সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বংশখণ্ড'। অন্যায়ের প্রতিরোধ, অত্যাচারীর শাস্তি, আত্মরক্ষা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে লাঠির প্রয়োগ শস্ত্ররূপে। এই প্রয়োগের দৃষ্টিতে লাঠির লক্ষ্যার্থ 'বাহুবল'। স্থূলাক্ষর 'লাঠি' সামান্য (সাধারণ) লাঠিরই বিশেষ (specialised) রূপ ; 'বিশেষ' এই কারণে যে এ লাঠি অন্যায়ের প্রতিরোধ ইত্যাদি ধর্মের (attributes) দ্বারা বিশিষ্ট ; যেমন, (ii) "পণ্ডিতকবিই **কবি**" : স্থূলাক্ষর 'কবি' বিশিষ্ট, যেহেতু খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ এঁরই ভাগ্যে জোটে (সাধারণ কবির পক্ষে যা সম্ভব নয়)।

(iii) "সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ **বাঙালী** করে, **মানুষ** করনি।"—রবীন্দ্রনাথ।

—প্রথম দুটিতে Figureও নাই, অলঙ্কারও নাই, যদিও লক্ষণা প্রয়োজন-মূলা এবং প্রয়োজন অর্থটি ব্যঙ্গ্য। শেষেরটিতে আমাদের মতে অলঙ্কার নাই অসুন্দর ব'লে ; বিলিতি মতে Innuendo, অর্থটি (নিন্দাটি) ঘোরালো এবং জোরালো হয়েছে ব'লে। উক্তিটি কাব্য হয় নাই, বক্তৃতা হয়েছে।

(৫) **গুণ-গুণী :**

(i) "স্থাথ' **ধলা** ফেললে বুঝি"—যতীন সেন।

—'ধলা'-র লক্ষ্যার্থ 'ধলা ('ধবলে'র অপভ্রংশ) রঙের বলদ' (abstract for concrete, যেমন, 'Bolt from the *blue*'-র blue = blue sky)। এটিতে Synecdoche ; আমাদের মতে অলঙ্কার নাই।

(ii) 'একই মানুষের মধ্যে পশুও আছে, দেবতাও আছে।'

—পশু (গুণী), এর লক্ষ্যার্থ নির্বুদ্ধিতা, হিংস্রতা ইত্যাদি (গুণ) ; 'দেবতা' (গুণী), এর লক্ষ্যার্থ মহত্ত্ব, উদারতা, ক্ষমা প্রভৃতি (সাত্ত্বিক গুণ)। Concrete for abstract—Synecdoche।

(iii) "পদাহত **সতীত্বের** ঘুচাও ক্রন্দন"—রবীন্দ্রনাথ।

সতীত্বের = সতী দ্রৌপদীর (abstract for concrete—Synecdoche)।

(৬) **স্বত্ব-স্বামিত্ব** (নানাভাবের) :

(i) "দেই তুলসী তিল এ **দেহ** সমর্পলুঁ"—বিদ্যাপতি।

'দেহ'-র লক্ষ্যার্থ দেহের অধিকারী 'দেহী' অর্থাৎ 'অহং'-অভিমানী জীবাত্মা। (দেহ পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত জড়পদার্থ, তার সম্বন্ধে 'গণইতে দোষ

গুণলেশ ন পাওয়বি' ইত্যাদি বলা যায় না।) এটি ইংরিজি Synecdoche-র উদাহরণ "Dust *thou* art"-এর বিপরীত, কারণ thou=Body। আমাদের উদাহরণেও Synecdoche। অলঙ্কার নাই।

(ii) "সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে—আছে কি কি বীজ
কবিত্বকলায়—**শেলি, গেটে, কোল্‌রীজ্‌,**
কার কোন্ শ্রেণী।" —রবীন্দ্রনাথ।

—শেলি, গেটে, কোল্‌রীজ্‌=এঁদের রচিত কাব্য। এটিতে 'author for his work'-লক্ষণাক্রান্ত Metonymy। অলঙ্কার নাই।

(৭) **সংযোগ** (নানাভাবের) :

(i) "মত্ত রণ-মদে
...**গজ, অশ্ব** চলে রাজপথে।"—মধুসূদন।

—'গজ অশ্ব' লক্ষ্যার্থে গজারোহী, অশ্বারোহী সেনা।

(ii) **তরবারির** চেয়ে **লেখনীর** শক্তি বেশী ('The pen is mightier than the sword')।

—তরবারি আর লেখনীর লক্ষ্যার্থ যথাক্রমে যোদ্ধা আর লেখক।

দুটি উদাহরণেই 'Instrument for the agent'-লক্ষণাক্রান্ত Metonymy ; অলঙ্কার নাই।

(iii) "সেই যে **চটি** উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে শিষ্ট ব্যবহার।" —সত্যেন্দ্রনাথ।

—'চটি'র লক্ষ্যার্থ বিদ্যাসাগরের চটি-পরিহিত চরণ (প্রেসিডেন্সি কলেজের উদ্ধত অভদ্র ইংরেজ অধ্যক্ষকে সৌজন্য শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার সামনে বিদ্যাসাগর টেবিলের উপর তুলেছিলেন)।

(iv) "বাহির হইয়া গেল সমস্ত
সভাস্থ দলবল—
...উচ্চতুচ্ছ বিবিধ **উপাধি**
বন্যার যেন জল।"

—উপাধি=উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি। 'Abstract for concrete'-লক্ষণাক্রান্ত Synecdoche ; অলঙ্কার নাই।

(v) "এ রাজ্যের **টিকি** যত হবে কণ্টকিত"—রবীন্দ্রনাথ।

—টিকি=ব্রাহ্মণ ; 'symbol for the symbolised'-লক্ষণাক্রান্ত

Metonymy। তৃতীয় উদাহরণের 'চটি'-ও কতকটা এইভাবের—Metonymy। অলঙ্কার নাই। ..

সমবায়সম্বন্ধ দেখালাম ; এইবার—

(ঘ) **বৈপরীত্য ঃ**

"কি **সুন্দর মালা** আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ!" —মধুসূদন।

—দুর্ব্বার স্বাধীন সিন্ধুর উপর রামচন্দ্রনির্ম্মিত সেতু 'মালা' নয়, বন্ধনশৃঙ্খল এবং 'সুন্দর' নয়, কুৎসিত। এই 'বন্ধনশৃঙ্খল' আর 'কুৎসিত' যথাক্রমে 'মালা' আর 'সুন্দর'-এর লক্ষ্যার্থ। এর নাম **বিপরীতলক্ষণা**। এইজাতীয় অর্থ অধিকাংশ স্থলেই বক্তার বাচনভঙ্গী, বিশেষতঃ কণ্ঠধ্বনির কাকুর উপর নির্ভর করে।

Irony-র সঙ্গে কতকটা মিল থাকায় সুধীরকুমার এটিকে Irony-র উদাহরণ-রূপে গ্রহণ করেছেন। এ-সম্বন্ধে আমার বিচার 'ব্যাজস্তুতি' অলঙ্কারে দ্রষ্টব্য।

(ঙ) **ক্রিয়াযোগ ঃ**

'ক্রিয়াযোগ' শব্দটির অর্থ হেতুহেতুমদ্‌ভাব অর্থাৎ কারণ-কার্য্যভাব। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন, "ক্রিয়াযোগাৎ ইতি কার্য্যকারণভাবাৎ ইতি। যথা, অন্নাপহারিণি ব্যবহারঃ প্রাণান্ অয়ং হরতি ইতি" (ধ্বন্যালোক ১।১৮)। উদাহরণটি সুন্দর। মানুষের অন্ন যে অপহরণ করে, তাকে সোজাসুজি অন্নাপহারী না ব'লে প্রাণাপহারী বলা ; এতে অন্নই প্রাণ হ'য়ে যায় ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'অন্ন' কারণ, 'প্রাণ' তার কার্য্য। 'প্রাণ' শব্দের প্রয়োগটি লাক্ষণিক : তার লক্ষ্যার্থ 'অন্ন'। এইভাবের বাঙলা উদাহরণ ঃ

(i) "মরণঞ্জয় **মরণ** পিয়ে রে"—যতীন সেন।

—'মরণ' কার্য্য ; তার কারণ 'বিষ'—সমুদ্রমন্থনজাত হলাহল (মরণঞ্জয় =মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব)। 'মরণ'-এর লক্ষ্যার্থ 'বিষ'।

(ii) "হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ **পূর্ণিমা**,...
কখন দুয়ারে এসে
মু'খানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে" —রবীন্দ্রনাথ।

—এ উদাহরণটির একটু বৈচিত্র্য আছে। 'পূর্ণিমা'-র মুখ্যার্থ শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি। আকাশ হ'তে কবির কক্ষে অভিসারে আসা তিথির পক্ষে

সম্ভব নয়—মুখ্যার্থ বাধিত। লক্ষণায় পূর্ণিমা=পূর্ণচন্দ্র। কিন্তু সেও কবিকঙ্কে অভিসারে আসে নাই; সুতরাং লক্ষ্যার্থও বাধিত। লক্ষ্যার্থের (পূর্ণচন্দ্র) লক্ষ্যার্থ **'জ্যোৎস্না'। 'পূর্ণিমা'** (চন্দ্রার্থে) **কারণ, 'জ্যোৎস্না' তার কার্য্য**। এটিতে ক্রিয়াযোগসম্বন্ধের **লক্ষণ-লক্ষণা।**

প্রথমটিতে 'Effect for cause' এবং দ্বিতীয়টিতে 'Cause for effect'—Metonymy।

দেখা গেল, **হেতু বা কারণের ভিত্তিতে লক্ষণা দুরকম**—'রূঢ়ি' আর 'প্রয়োজন' এবং **সম্বন্ধভিত্তিতে পাঁচরকম**—সামীপ্য, সারূপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য, ক্রিয়াযোগ।

এইবার আর একভাবে লক্ষণার প্রকারভেদ দেখাচ্ছি—**শুদ্ধা** লক্ষণা আর **গৌণী** লক্ষণা। দুটিই 'প্রয়োজন'মূলা। 'রূঢ়ি' নিকৃষ্ট ব'লে ওর সম্বন্ধে শুধু 'লোকপ্রসিদ্ধি' ছাড়া আর কিছু বলবার নাই।

যে লক্ষণায় মুখ্যার্থ আর লক্ষ্যার্থের সম্বন্ধটি সাদৃশ্যাত্মক, তার নাম গৌণী (আমাদের পূর্ব্বে আলোচিত 'সারূপ্য')। **সম্বন্ধ যেখানে সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছু, লক্ষণা সেখানে শুদ্ধা।**

আমাদের অলঙ্কারসূত্রে এদুটি অতীব মূল্যবান্।

গৌণী লক্ষণা:

'বাঙলার বাঘ আশুতোষ'—বাঘ পশুবিশেষ, আশুতোষ মানুষ; সুতরাং মুখ্যার্থে বাঘ আশুতোষ-সম্পর্কে বাধিত। কিন্তু বাঘ নির্ভীক তেজস্বী, আশুতোষও তাই। নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার বাঘের সঙ্গে যেমন, আশুতোষের সঙ্গেও তেমনি নিত্যসম্বন্ধ ('অবিনাভাব')। 'বাঘ'-এর লক্ষ্যার্থ নির্ভীকতা-তেজস্বিতারূপ গুণ; এই গুণের যোগ আশুতোষে। কাজেই 'বাঘ'-এর সত্যকার লক্ষ্যার্থ নির্ভীকতাতেজস্বিতাগুণযুক্ত আশুতোষ। অতএব লক্ষণা এখানে গৌণী (গুণবৃত্তিগত)। সহজ কথায়, নির্ভীকতা-তেজস্বিতারূপ সমান ধর্ম্মের ভিত্তিতে বাঘ ও আশুতোষ বিজাতীয় (dissimilar) হ'য়েও প্রবলভাবে সদৃশ হ'য়ে উঠেছে; ফলে বিভেদসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। **এইজাতীয় গৌণী লক্ষণার নাম সারোপা** (আরোপান্বিকা)। এতে **বিষয়ী** (আমাদের 'বাঘ') এবং **বিষয়** (আমাদের 'আশুতোষ') ভাষায় প্রকাশিত থাকে ("গৌণে শব্দপ্রয়োগঃ"—অভিনবগুপ্ত: ধ্বন্যালোক ১।১৮) এবং ভেদসত্ত্বেও অভেদপ্রতীতি হয় ("ভেদেঽপি তাদ্রূপ্যপ্রতীতিঃ"—

কাব্যপ্রকাশ ২।৭ বৃত্তি)। বিশ্বনাথ বলেছেন, 'রূপক অলঙ্কারের মূলে সারোপা গৌণী লক্ষণা' ("ইয়ম্ এব রূপকালঙ্কারস্য বীজম্"—সাহিত্যদর্পণ ২।১৮)।

যখন বিষয়ী বিষয়কে গ্রাস ক'রে ফেলে' স্বয়ং দেদীপ্যমান থাকে, তখন গৌণী হয় সাধ্যবসানা। 'অধ্যবসান' শব্দটির অর্থ বিষয়ীর দ্বারা বিষয়ের প্রতীতি-উৎপাদন এবং এর প্রয়োজন হ'ল সর্ব্বতোভাবে অভেদব্যঞ্জনা ("সর্ব্বথা এব অভেদাবগমঃ প্রয়োজনম্"—কাব্যপ্রকাশ, ২।৭ বৃত্তি)।

রবীন্দ্রনাথের "হানিতে দিলাম হেন **অপমানশর**" গৌণী **সারোপার** উদাহরণ; কিন্তু,

"অয়ি হৃদি-লগ্না **লতা**!"

গৌণী **সাধ্যবসানার** উদাহরণ। বিক্রমদেব বলছেন রাণী সুমিত্রাকে। লতার ধর্ম্ম তরুকে অবলম্বন ক'রে থাকা; পুরুষসম্পর্কে রমণীর ধর্ম্মও তাই। 'লতা'-র লক্ষ্যার্থ পরাবলম্বনগুণযুক্তা সুমিত্রা। সমান ধর্ম্মের ভিত্তিতে দুই বিজাতীয়ের সাদৃশ্যনিবন্ধন অভেদপ্রতিষ্ঠা। বিষয়ী 'লতা'র দ্বারা বিষয় 'সুমিত্রা' গ্রস্ত ('নিগীর্ণ')। এর প্রয়োজন সম্পূর্ণ অভেদব্যঞ্জনা। সুন্দর। লক্ষণা **গৌণী সাধ্যবসানা**।

প্রথমটিতে ('অপমানশর') **রূপক** অলঙ্কার; দ্বিতীয়টিতে **অতিশয়োক্তি**।

শুদ্ধা:

'তেল জল বাঙালীর পরমায়ু'—'তেল জল' আর 'পরমায়ু'-র মধ্যে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু সাদৃশ্যসম্বন্ধের ভিত্তিতে নয়, যাকে আগে 'ক্রিয়াযোগ' বলেছি সেই অর্থাৎ কার্য্যকারণসম্বন্ধের ভিত্তিতে। অভেদব্যঞ্জক শুদ্ধা লক্ষণা; **কিন্তু সাদৃশ্যের অভাবে রূপক অলঙ্কার হ'তে পারে নাই।**

"লক্ষ্যোক্তি"

সুধীরকুমার তাঁর 'কাব্যশ্রী'-নামক পুস্তকে বলেছেন, "**অলঙ্কার অর্থ**... কাব্যশাস্ত্রের প্রয়োগে **কাব্যসৌন্দর্য্য; ইহাই আমরা অন্ততঃ বাঙ্গালা অলঙ্কারশাস্ত্র আলোচনায় নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া লইতে চাই**"; "অলঙ্কারশাস্ত্র যথার্থই কাব্যসৌন্দর্য্য-বিজ্ঞাপক শাস্ত্র"।

তিনি 'Metonymy' আর 'Synecdoche' Figure-দুটিকে বাঙলা অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং নাম দিয়েছেন 'লক্ষ্যোক্তি' অলঙ্কার। বলা বাহুল্য, তাঁর তথাকথিত 'লক্ষ্যোক্তি' অলঙ্কারে তিনি চলেছেন আমাদের

'লক্ষণা'র পথ ধ'রে অর্থাৎ **লক্ষণা**-নামক **শব্দবৃত্তিকেই তিনি অলঙ্কার বলেছেন।**

তাঁর 'লক্ষ্যোক্তি'-র উদাহরণগুলিকে দুভাগে ভাগ ক'রে বিচার করব। প্রথম শ্রেণীর উদাহরণগুলি পড়লে মনে হয় 'লক্ষ্যোক্তি' নামে নূতন অলঙ্কার সৃষ্টি করার প্রবল ইচ্ছায় সুধীরকুমার অলঙ্কারকে কাব্যসৌন্দর্য্য ব'লে বাঙলা অলঙ্কার-শাস্ত্র আলোচনায় নিঃসংশয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়ার প্রতিজ্ঞাটুকু সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলেন—এগুলিতে সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণগুলিতে সৌন্দর্য্য আছে; কিন্তু সে 'লক্ষ্যোক্তি' ব'লে নয়, অন্য কারণে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লক্ষণার সঙ্গে আমাদের বহু অলঙ্কারের সম্পর্ক আলোচনা ক'রে দেখাব যে **'লক্ষ্যোক্তি' ব'লে কোনো অলঙ্কারই হ'তে পারে না।**

উদাহরণবিচার আরম্ভ করি।

প্রথম শ্রেণী (সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই):

(i) "**বোতলেই** তাহার সর্ব্বনাশ করিল" ("বোতলেই" = "মদেই")।

(ii) "**ভাতের হাঁড়ি** টগবগ করিয়া ফুটিতেছে" ("ভাতের হাঁড়ি = হাঁড়ির ভাত")।

(iii) "**জাপানের** সহিত মিত্রতা" ("জাপান = জাপানের অধিবাসী")।

(iv) "যত পায় **বেত**, না পায় বেতন…" ("বেত = বেতের আঘাত")।

(v) "**হায়দরাবাদের** অভিপ্রায়" ("হায়দরাবাদের অধিপতি নিজামের…")।

(v) **অর্থাৎ শেষেরটির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য:** দেশের অধিপতি বোঝাতে দেশটির নাম সেক্‌স্‌পীয়ার কোথাও কোথাও প্রয়োগ করেছেন; যেমন '**হ্যামলেট**' নাটকে "buried Denmark", "the ambitious Norway"। এইজাতীয় প্রয়োগ Figure ব'লে স্বীকৃত হয় নাই।

(vi) "ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার খেলা…" ("ইংলণ্ড = ইংলণ্ডের প্রতিনিধি-স্থানীয় খেলোয়াড়")।

(vii) "এক শ' **শরৎ** বাঁচব মোরা সুস্থ সবল বুক"

—সুধীরকুমার মন্তব্য করেছেন, "শরৎ—শরৎ ঋতু, **এখানে বৎসর**" অর্থাৎ তাঁর মতে 'শরৎ'-এর লক্ষ্যার্থ 'বৎসর'। এ ধারণা ঠিক নয়। 'শরৎ' শব্দটির দুটি অর্থ—ঋতুবিশেষ এবং বৎসর; **দুটিই বাচ্যার্থ**। তুলনীয়: "**শরদাময়ুতং** যযৌ" (রঘুবংশ, ১০।১)—"শরদাং বৎসরাণাম্‌, 'স্যাৎ **ঋতৌ, বৎসরে শরৎ**' ইত্যমরঃ" (মল্লিনাথ)।

(viii) "**হিমগিরি** হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু বদন উমার" ("অধিপতি বুঝাইতে")।

—'হিমগিরি' শব্দে 'অধিপতি' অর্থ বোঝাবার **কোনো লক্ষণাই এখানে নাই**—হিমালয় পতি, মেনকা তাঁর পত্নী, পার্ব্বতী আর গঙ্গা তাঁদের দুই কন্যা এই কল্পনা পৌরাণিক, অত্যন্ত প্রাচীন।

(ix) "কোন্ নিরুদ্দেশের পানে" ("নিরুদ্দেশ—নিরুদ্দিষ্ট স্থান")।

(x) "হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা" ("হীরামুক্তামাণিক্য—সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য")।

(xi) "পাণিনি আয়ত্ত করিয়াছ কি?" ("পাণিনি—পাণিনিরচিত ব্যাকরণ")।

প্রসাদমাধুর্য্যাদিগুণগতই হোক আর অনুপ্রাস-উপমাদি পারিভাষিক অলঙ্কারগতই হোক, সর্ব্বপ্রকার কাব্যসৌন্দর্য্যের নাম অলঙ্কার। অলঙ্কারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বৈচিত্র্যে, যে বৈচিত্র্যের স্বাদ গ্রহণ করেন সহৃদয় তাঁর প্রতীতিরূপ রসনা দিয়ে—"বৈচিত্র্যম্ অলঙ্কারঃ ইতি অলঙ্কারস্য সামান্যলক্ষণম্; বৈচিত্র্যং হি ভঙ্গীবিশেষঃ প্রতীতিসাক্ষিকঃ", বলেছেন মহেশ্বর 'কাব্যপ্রকাশ'-ব্যাখ্যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণী (সৌন্দর্য্য যা আছে, তা 'লক্ষ্যোক্তি' ব'লে নয়) ঃ

(i) "চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা"

—সুধীরকুমার বলছেন, "বসন্ত—বসন্ত ঋতু, **এখানে বৎসর বুঝাইতেছে। লক্ষণার** প্রয়োগে এখানে পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জনা হইয়াছে"।

প্রথম কথা—উদ্ধৃতিটুকু যেভাবে পাচ্ছি, তাতে 'বসন্ত—এখানে বৎসর' ব'লে লক্ষ্যার্থ আবিষ্কার করতে যাব কেন? মুখ্যার্থ 'বসন্তঋতু' ধরলেই তো অর্থসঙ্গতি ঠিক থাকে—'একবার এক বসন্তকালে একগাছা মালা গাঁথা হয়েছিল, তারপর তেরোটা বসন্তঋতু চ'লে গেল, মালাটা এখনো রয়েছে' বললে, এর প্রতিবাদ করার কি কোনো পথ আছে? দ্বিতীয় কথা—'বসন্ত এখানে বৎসর' বললেও তো ফল একই দাঁড়ায়ঃ 'চৌদ্দ বছরের একগাছা মালা'—সৌন্দর্য্যের নামগন্ধও মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"ওই দেহখানি বুকে তুলে লব, বালা,
চতুর্দ্দশ বসন্তের একগাছি মালা।"

—'অয়ি বালা, চতুর্দ্দশ-বসন্তের-একগাছি-মালা ওই-দেহখানি বুকে তুলে লব',

এই হ'ল অন্বয়। **মালা** বালা নয়, তার **দেহখানি**। অলঙ্কার **রূপক**। আবার, 'বসন্তের মালা' বলায় বসন্তের উপর ফুলের আরোপ দ্যোতিত হচ্ছে ব'লে অলঙ্কার **ব্যঙ্গ্যরূপক**। এতদূর পর্য্যন্ত বসন্তের সঙ্গে তার লক্ষ্যার্থ 'বৎসরে'র সম্পর্ক নাই।

এইবার লক্ষ্যার্থের কথা অর্থাৎ 'বসন্ত—এখানে বৎসর'। কিন্তু এখানে বসন্তের মুখ্যার্থ বসন্তঋতুর সঙ্গে লক্ষ্যার্থ বৎসরের সম্বন্ধটি, 'সমগ্রের স্থলে অংশ' হ'লেও, অভেদকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত (Synecdoche-তে অনেকক্ষেত্রে "the relation is practically one of identity"—Smith)।

ব্যাপারটা এইরকম: কবি কল্পনা করেছেন যে এই চতুর্দ্দশী কিশোরীর জীবনের প্রতিটি বৎসর এক-একটি আনন্দময় বসন্তঋতু হ'য়েই তার দেহখানিকে এই লাবণ্যময় রসমধুর পরিণতি দান করেছে। **বিষয়** 'বৎসর'; **বিষয়ী** 'বসন্ত', **সাধর্ম্ম্য** 'আনন্দময়তা'; বিষয়ী 'বসন্ত'কর্ত্তৃক বিষয় 'বৎসর' গ্রস্ত: অলঙ্কার (রূপক-) **অতিশয়োক্তি**। সংক্ষেপে, সমগ্র একটি বৎসরে একটিমাত্র ঋতু বসন্তের কল্পনা, বসন্তে ফুলকল্পনা, বসন্তের সঙ্গে বসন্তের অচ্ছেদ্য যোগ চৌদ্দ-বসন্তফুলের একগাছি মালাকল্পনা, চৌদ্দ বৎসরের মেয়েটির দেহের উপর এই চৌদ্দ ফুলের মালার আরোপ এবং দেহমালার সার্থকতা 'বুকে তুলে লব'-তে। রূপক, ব্যঙ্গ্যরূপক, অতিশয়োক্তি এখানে 'পুঞ্জ পুঞ্জ সৌন্দর্য্যের' স্রষ্টা, 'লক্ষ্যোক্তি' নয়। ইংরেজি উদাহরণ "A boy of thirteen summers"-এর মতন রবীন্দ্রনাথ যদি লিখতেন 'চতুর্দ্দশ বসন্তের বালা' লক্ষণাসত্ত্বেও এ হ'ত অসুন্দর অর্থাৎ কাব্যই হ'ত না।

(ii) "নদীবক্ষে দশখানি পাল যেন উড়িয়া চলিল"

—এখানে পাল=নৌকা ('সমগ্রের স্থলে অংশ') কোনো সৌন্দর্য্যেরই সৃষ্টি করে না। 'উড়িয়া চলিল' বলায় 'পাল' (অবয়ব)-এর লক্ষ্যার্থ নৌকা (অবয়বী)-তে যে পাখীকল্পনা রয়েছে, সৌন্দর্য্য সেইখানে। **'যেন উড়িয়া চলিল'—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি" (অন্ধকার যেন সর্ব্বাঙ্গ লেপে দিচ্ছে)-র মতন।

(iii) "শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদি
চিরকাল কি রইবে খাড়া"
("শিকল—পরাধীনতাস্থলে প্রযুক্ত")

—প্রথম কথা, 'শিকল পরাধীনতাস্থলে প্রযুক্ত' নয়; শিকলের লক্ষ্যার্থ এখানে জীবনকে যা জীর্ণ জরাগ্রস্ত করেছে সেই সংস্কারবন্ধন। চরণদুটির সৌন্দর্য্য

রূপক অলঙ্কারে—শিকলের উপর দেবীর অভেদারোপ এবং তারই অনুষঙ্গ পূজাবেদি এবং এই 'বেদি'-র বিশেষণ 'খাড়া'। মাত্র লক্ষ্যার্থ কোনো সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে নাই।

(iv) "পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্য অরোরার"

("পক্ককেশে—বার্দ্ধক্যে, বার্দ্ধক্যই কারণ")

—'পক্ককেশে=বার্দ্ধক্যে' চরণটিকে শুষ্ক গদ্যে পরিণত করেছে। কিন্তু সুন্দর কাব্য রয়েছে চরণটিতে এবং এ সৌন্দর্য্যের উৎস অন্যত্র। অরোরা (Aurora, আমাদের উষসী) পাশ্চাত্যপুরাণে নারীরূপে কল্পিত। 'বরমাল্য' হ'তে দেখা যাচ্ছে অরোরায় নায়িকাকল্পনা। জ্যোতির্ম্ময়ীর বরণমালা শুভ্র আলোর কুসুমে গাঁথা; শুভ্রকেশে সে মালা নির্ম্মল সাত্ত্বিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। অরোরায় নায়িকাব্যবহার আরোপিত—**অলঙ্কার সমাসোক্তি**। সৌন্দর্য্য এইখানে। 'অরোরা' আর 'বরমাল্য' এ চরণের সৌন্দর্য্যরহস্যের মূলে।

(v) "বাম হাতে যার কমলার ফুল ডাহিনে মধুকমালা"

("কমলার ফুল—শ্রীহট্টের প্রতীক। মধুকমালা—সাঁওতালপরগণার প্রতীক। এখানে প্রতীকের ধর্ম্মে অপরূপ সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জনা হইয়াছে"।)

—এখানে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উৎস 'হাত', 'প্রতীকের ধর্ম্ম' গৌণমাত্র। যদি লেখা হ'ত 'বামাংশে যার কমলার ফুল ডাহিনে মধুকমালা', অপরূপ সৌন্দর্য্য ব্যঞ্জিত হ'ত না। সত্যেন্দ্রনাথ 'আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে —বরদ বঙ্গে' ব'লে বঙ্গকে নিষ্প্রাণ নিশ্চেতন ভূমিমাত্রে পর্য্যবসিত করেছেন; কিন্তু পরক্ষণেই বঙ্গকে প্রমূর্ত্ত করেছেন স্নেহকোমলা রাজরাজেশ্বরী দেবীর রূপে —ভালে তাঁর কাঞ্চনশৃঙ্গমুকুট, কোলভরা কনকধান্য, বুকভরা স্নেহ, চরণে পদ্ম, বাম হাতে কমলার ফুল ডাহিনে মধুকমালা, সাগর শততরঙ্গভঙ্গে তাঁর বন্দনা রচনা করছে, উজ্জ্বল তনুখানি তাঁর অতসী অপরাজিতায় অলঙ্কৃত। পাঠকের চোখের সম্মুখে জেগে ওঠে এই মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি; এই উৎস থেকেই উৎসারিত হয় সৌন্দর্য্যনির্ঝরিণী। এই কারণেই বলেছি **সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উৎস 'হাত', পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তিকল্পনায় অপরিহার্য্য এই 'হাত'**; কমলার ফুল, মধুকমালা আংশিক সহকারী মাত্র। বিচ্ছিন্ন চরণ 'বাম হাতে যার কমলার ফুল ডাহিনে মধুকমালা'-তে সৌন্দর্য্যের প্রধানহেতুভূত **অলঙ্কার ব্যঙ্গ্যরূপক**, —'যার' অর্থাৎ বঙ্গের উপর মূর্ত্তি-আরোপের দ্যোতনা করছে 'হাত'।

অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

লক্ষণা ও অলঙ্কার

আমাদের বিচিত্রভাবের বহু শ্রেষ্ঠ অর্থালঙ্কারের গঠন-প্রকৃতির দিকে একটু সাভিনিবেশ দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে যে এরা শব্দের এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাক্যাংশের বা বাক্যের বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থকে বীজরূপে গ্রহণ ক'রে সাদৃশ্য, বিরোধ ইত্যাদি নানা ভিত্তির উপর পরিমূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। এদের চিত্তচমৎকারী সৌষম্য-সৌন্দর্য্য বিকসিত ক'রে তুলেছে কবিশিল্পীর 'অপূর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি সর্ব্বলক্ষণসত্ত্বেও 'ভ্রান্তিমান্' অলঙ্কার হ'তে পারে নাই, যেহেতু কবিপ্রতিভার স্পর্শমণির স্পর্শ সে পায় নাই; যা হয়েছে তাও অবশ্য প্রতিভারই ফল, তবে সে প্রতিভা দার্শনিক—আচার্য্য শঙ্করের 'অধ্যাস', সহৃদয়ের জন্য নয়, 'বিদ্বান্'-এর জন্য।

অলঙ্কারের ব্যঙ্গ্যার্থ উপাদানের কথা একটু পরে বলছি। আপাততঃ আমার লক্ষ্য লক্ষ্যার্থ উপাদান। এখানেও অবশ্য ব্যঙ্গ্যার্থই বড়ো কথা, কিন্তু তার **সহকারিণী লক্ষণা**। যে-সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের সমপ্রাণ সখা, সেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার সামর্থ্য একমাত্র 'প্রয়োজন-হেতুকা লক্ষণার'ই আছে এবং এই 'প্রয়োজন'টি ব্যঙ্গ্য—'অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি'। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলছেন, "প্রয়োজনম্ ধ্বন্যমানম্ এব···কেবলং পূর্ব্বত্র লক্ষণা এব প্রধানং ধ্বননব্যাপারে সহকারি" (ধ্বন্যালোক ১।১৩)। কথাগুলো বড়ো বড়ো শোনাচ্ছে; কিন্তু উদাহরণে সব জলের মতন প্রাঞ্জল হ'য়ে যাবে। উদাহরণের সহজসরণিই ধরলাম:

১। রূপক অলঙ্কার:

রূপক অলঙ্কারের মূলে **গৌণী সারোপা লক্ষণা**। (লক্ষণাসূত্রে যে পারিভাষিক শব্দগুলি এখানে ব্যবহার করছি, তাদের ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছি লক্ষণা-আলোচনায়।)

"**চাঁদের পেয়ালা** ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।"—রবীন্দ্রনাথ।

—চাঁদ আর পেয়ালা দুটি সম্পূর্ণ বিজাতীয় বস্তু; পরিচিত বাচ্যার্থের দিক্ থেকে কোথাও এদের মিল নাই। তবু মিল ঘটেছে কবিকল্পনায়—মদের ফেনার আধার পেয়ালা, জ্যোৎস্নার আধার চাঁদ। (জ্যোৎস্না আর মদ মাদকতায় দুইই সমান, একথাটিও মনে রাখতে হবে।) আধারত্ব গুণটি হ'ল চাঁদ-পেয়ালার সাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে এরা অভিন্ন। অলঙ্কার **রূপক**।

এইবার লক্ষণার ক্রিয়া। আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাঁর দ্বারা বহুমানিত আলঙ্কারিক ভট্ট-উদ্ভট বলছেন :

"শ্রুত্যা সংবন্ধবিরহাৎ যৎ-পদেন পদান্তরম্।
গুণবৃত্তিপ্রধানেন যুজ্যতে **রূপকং** হি তৎ ॥" (কা. সা. স. ১।১১)

—একটি পদ (আমাদের উদাহরণের 'পেয়ালা') শ্রুতির পথে (অভিধায়) অন্যপদের (আমাদের 'চাঁদ') সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে অসমর্থ হ'য়ে যদি গুণবৃত্তির (গৌণী লক্ষণার) আশ্রয়ে ওর সঙ্গে (আমাদের 'চাঁদ'-এর সঙ্গে) যুক্ত হয়, তবে হয় **রূপক** অলঙ্কার। এর ব্যাখ্যায় আচার্য্য অভিনবগুপ্তের গুরু ভট্ট-ইন্দুরাজ বলছেন : "প্রধানার্থানুরোধেন উপসর্জ্জনস্য **লক্ষণয়া** গুণবৃত্তিত্বম্ উপপন্নং প্রধানবশবর্ত্তিত্বাৎ গুণানাম্ ইতি অভিপ্রায়ঃ"। আমাদের উদাহরণটির উপর প্রয়োগ ক'রে ইন্দুরাজের বক্তব্যটি পরিস্ফুট করছি : 'চাঁদ'ই কবির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় ব'লে **প্রাকরণিক** ; 'পেয়ালা' আগন্তুক ব'লে **গৌণ, অপ্রাকরণিক**। এই **'পেয়ালা'** ইন্দুরাজের **'উপসর্জ্জন'** (উপসর্জ্জন= 'অপ্রধান'—অমরকোষ)। **কবি বলছেন বাসন্তী পূর্ণিমার আনুষঙ্গিক চাঁদের কথা, পেয়ালা বসন্তসূত্রে অপ্রাসঙ্গিক**। কবিদৃষ্টিতে জ্যোৎস্না চাঁদে ধরছে না ; সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন তিনি আর একটি দৃশ্য তাঁর প্রাতিভ চক্ষু দিয়ে—মদের শুভ্র ফেনোচ্ছ্বাস পেয়ালায় ধরছে না। দুই দৃশ্য পরস্পর বিজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও একসূত্রে বাঁধা প'ড়ে গেল—অভেদপ্রতীতির স্বর্ণসূত্রে। রূপক অলঙ্কার অতিশয়োক্তির মতন অভেদসর্ব্বস্ব নয়, অভেদপ্রধান। চাঁদ পেয়ালা হ'য়ে গেল না—শিশিরবাবু রাম হ'য়ে যান না, রামের ভূমিকায় অভিনয় করেন। শিশিরবাবু শিশিরবাবু—এখন তিনি রামের ভূমিকায় সীতাকে হারিয়ে কাঁদছেন, ইণ্টারভ্যালের পর নামবেন 'চন্দরদা'-র ভূমিকায়, হাসবেন এবং হাসাবেন। চাঁদ এখন পেয়ালার ভূমিকায় ; পরক্ষণেই দরকার হ'লে আকাশসায়রের স্বর্ণকমলরূপে অভিনয় করবে। **চাঁদ সর্জ্জন, পেয়ালা উপসর্জ্জন**। চাঁদের অর্থের খাতিরে (ইন্দুরাজের 'প্রধানার্থানুরোধেন') উপসর্জ্জন পেয়ালার **লক্ষণায়** গুণবৃত্তিত্ব-লাভ (গৌণী সারোপা লক্ষণায় ভেদে অভেদপ্রত্যয়সৃষ্টি) ; অপ্রধানের গুণ প্রধানেরই বশবর্ত্তী হ'য়ে থাকে, কতকটা 'reflected glory'-র মতন ; তবে কাব্যে reflection-এর চেয়ে deflection বেশী।

কাব্যপ্রদীপের টীকায় বৈদ্যনাথ ভট্ট-উদ্ভট ও ইন্দুরাজের মতের পরিপোষক একটি কারিকা উদ্ধৃত করেছেন :

"যদোপমানশব্দানাং গৌণবৃত্তিব্যপাশ্রয়াৎ।
উপমেয়ে ভবেৎ বৃত্তিঃ তদা তৎ রূপকং ভবেৎ॥"

অর্থাৎ, উপমান (বিষয়ী) যখন গৌণবৃত্তির (গৌণী লক্ষণার) আশ্রয়ে উপমেয়ের (বিষয়ের) সঙ্গে সমবৃত্তিত্ব (অর্থসাম্যে সমানাধিকরণতা—একই বিভক্তির যোগে অভেদপ্রতীতির যোগ্যতা) লাভ করে, তখন হয় রূপক অলঙ্কার। এই কথারই সংক্ষিপ্তসার বৈদ্যনাথের "সারোপলক্ষণয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন প্রতিপাদনম্" রূপক। এই উক্তির সরলতম সহজবোধ্য রূপ অলঙ্কারভাষ্যকারের **"লক্ষণাপরমার্থং যাবতা রূপকম্"**। গৌণী সারোপালক্ষণাপ্রসঙ্গে সাহিত্য-দর্পণে বিশ্বনাথও বলেছেন "ইয়মেব রূপকালঙ্কারস্য বীজম্"।

২। অতিশয়োক্তি অলঙ্কার ঃ

অতিশয়োক্তির মূলে **গৌণী সাধ্যবসানা লক্ষণা**।

"চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় **মদের ফেনা**।"

—স্থূলাক্ষর অংশটিতে অতিশয়োক্তি। সমগ্র বাক্যটিকে একদেশবিবর্ত্তী সাঙ্গরূপকের উদাহরণ বলা চলবে না, যদিও চাঁদ অঙ্গী, জ্যোৎস্না তার অঙ্গ এবং পেয়ালা অঙ্গী, মদের ফেনা তার অঙ্গ। এইজাতীয় রূপক অলঙ্কারে উপমেয়টি ভাষায় প্রকাশিত থাকে, ব্যঞ্জনায় প্রতীত হয় উপমান। আমাদের উদাহরণে উপমান 'মদের ফেনা' রয়েছে, উপমেয় জ্যোৎস্না নাই। অলঙ্কার এখানে অতিশয়োক্তি এই কারণে যে উপমান (বিষয়ী) মদের ফেনা উপমেয়কে (বিষয় জ্যোৎস্নাকে) গ্রাস ক'রে স্বয়ং একমেবাদ্বিতীয়ম্ হ'য়ে রয়েছে। গৌণী সাধ্যবসানা লক্ষণার লক্ষণই এই। আচার্য্য মম্মটভট্ট বলছেন,

"সারোপান্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা।
বিষয্যন্তঃকৃতেঽন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা॥" (কাব্যপ্রকাশ ২।৬)

—সারোপায় বিষয় বিষয়ী দুইই উক্ত থাকে ; আর, সাধ্যবসানায় বিষয়ীর দ্বারা বিষয় অন্তঃকৃত (গ্রস্ত, নিগীর্ণ) হ'য়ে যায় (আমাদের উদাহরণে বিষয়ী 'মদের ফেনা'-র দ্বারা বিষয় জ্যোৎস্না যেমন হয়েছে)। ভট্টমম্মট দশম অধ্যায়ের চুয়ান্নসংখ্যক কারিকায় ('সঙ্কর' অলঙ্কারসূত্রে) একটি উদাহরণ দিয়েছেন ঃ

"নয়নানন্দদায়ীন্দোর্বিম্ব**মেতৎ** প্রসীদতি"।

—'নয়ন-নন্দন **এই** চন্দ্রবিম্ব বিতরে প্রসাদ'—শ. চ.

এই উদাহরণটি সারোপা-সাধ্যবসানা লক্ষণার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন

গোবিন্দঠাকুর তাঁর 'কাব্যপ্রদীপ'-এ। উদাহরণটিতে দুরকম অলঙ্কার রয়েছে অপৃথক্‌ভাবে। কবির বর্ণনীয় বিষয় একটি রমণীর মুখ। 'এই' (সংস্কৃত চরণটির 'এতৎ') কথাটিকে মুখের সর্ব্বনাম ধ'রে তার উপর 'বিম্ব' আরোপ করলে হয় রূপক অলঙ্কার। আবার, 'এই' কথাটিকে বিম্বের বিশেষণ ধ'রে বিম্ব মুখকে গ্রাস করেছে বললে, হয় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। দশম অধ্যায়ের অলঙ্কারের উদাহরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লক্ষণায় গোবিন্দঠাকুর যে নিয়ে এসেছেন, তার কারণ স্পষ্ট—**গৌণী সাধ্যবসানা লক্ষণা অতিশয়োক্তির এবং সারোপা গৌণী রূপকের মূলে।**

৩। **লুপ্তোপমা:**

"রঞ্জিত মেঘের মাঝে **তুষারধবল**
তোমার প্রাসাদ-সৌধ।" —রবীন্দ্রনাথ।

—দেখা যাচ্ছে যে 'প্রাসাদ-সৌধ' উপমেয়, 'তুষার' উপমান, 'ধবল' সাধারণ ধর্ম্ম; তুলনাবাচক শব্দ লুপ্ত। অতএব অলঙ্কার **লুপ্তোপমা**। এখানে গোপনসঞ্চারিণী লক্ষণার চরণচিহ্ন পড়েছে এইভাবে: 'তুষার' কথাটি মনে হ'লেই আমাদের জ্ঞানে সে যে-আকার লাভ করে, তাতে ধবলতার সঙ্গে জড়িত থাকে শীতলতা, কঠিনতা, তাপস্পর্শ-অসহিষ্ণুতা, লঘুতা এবং আরও কত কি। এই বিচিত্র অর্থাবলীর (connotations) সমন্বয়ে তুষারের তুষারত্ব। সুতরাং আমাদের উদাহরণে '**ধবল**' তুষারের অর্থরাজ্যের **একদেশমাত্র**। কবির এখানে বর্ণনীয় বিষয় ধবল প্রাসাদ-সৌধ। এই ধবলতার বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে পড়েছে তুষারকে। তুষারের অন্য connotations তাঁর বাঞ্ছনীয় নয়; তাই শুদ্ধমাত্র ধবলতায় 'তুষার'পদের অর্থকে তিনি সঙ্কুচিত ক'রে এনেছেন অর্থাৎ বর্ত্তমান context-এ তুষার শুধু ধবল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। তুষার-পদের এ অর্থ **লক্ষণার** পথে এসেছে। প্রাচীন মতে 'চন্দ্রসুন্দর (মুখ)' কথাটির চন্দ্র-পদে **লক্ষণা** ("**চন্দ্র**পদস্য **লক্ষণা**। তস্যাঃ ভেদেন অর্থে পদার্থৈকদেশে অপি সৌন্দর্য্যে অন্বয়ঃ"—কাব্যপ্রদীপের টীকায় বৈদ্যনাথ)। এ মতে লক্ষণা চন্দ্র-পদের (অর্থাৎ উপমানের); কিন্তু নব্যমতে লক্ষণা উপমেয় মুখের ("চন্দ্রসুন্দরম্ ইতি সমাসে চন্দ্রপদস্য তদ্‌বৃত্তিসমান-ধর্ম্মবৎ মুখম্ ইতি ধীঃ।" "লক্ষণয়া সাদৃশ্যবোধনাৎ পরমার্থিত্বম্"—ঐ)।

৪। **সমাসোক্তি:**

"পড়িবে ললাটে চক্ষে বক্ষে বেশবাসে
কৌতূহলী চন্দ্রমার সহস্র চুম্বন"—রবীন্দ্রনাথ।

—'চুম্বন' কথাটি হ'তে প্রতীত হচ্ছে যে 'চন্দ্রমা'য় নায়কব্যবহার আরোপিত হয়েছে। 'কুমুদসরসীকূলে' 'সপ্তপর্ণতরুমূলে মালতীদোলায়' 'রাণী' যখন বসবে, তখন পাতার ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রের অসংখ্য কিরণলেখা রাণীর অঙ্গে অঙ্গে বেশবাসে পড়বে—এই হ'ল কবির বর্ণনীর বিষয়, সুতরাং **'প্রস্তুত'**; নায়ককর্তৃক প্রেয়সীর অঙ্গে অঙ্গে সহস্র চুম্বন কবির বর্ণনীয় নয় ব'লে **'অপ্রস্তুত'**। কবির বিবক্ষিত (অভিপ্রেত বক্তব্য) রাণীর অঙ্গে চন্দ্রের কিরণ-পাতবর্ণনা। কিন্তু সোজাসুজি একথা বললে সৌন্দর্য্যের অভাব হয়। তাই, বক্তব্যটিকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে কবি নূতন একটি ব্যঙ্গ্যার্থের সৃষ্টি করেছেন 'চুম্বন' শব্দের প্রয়োগে 'চন্দ্রমা'য় নায়কব্যবহার দ্যোতিত ক'রে। চুম্বনের সঙ্গে নায়কের নিত্যসংযোগ সম্বন্ধ। চুম্বনের মুখ্য অর্থ চন্দ্রসম্পর্কে বাধিত ; কিন্তু স্ব-সংযোগী নায়ককে এনে চন্দ্রমাঁর উপর আরোপ করায় লক্ষণার পথে চুম্বন এক মধুর সার্থকতা লাভ করেছে। এইজাতীয় লক্ষণার নাম **উপাদানলক্ষণা**। এটি গৌণী নয়, **শুদ্ধা** এবং **এর লক্ষণ "স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ"** (কাব্যপ্রকাশ ২।৫) অর্থাৎ অর্থ এখানে বাক্যার্থে অন্বয়সিদ্ধি লাভ করতে না পেরে আপনাকে সার্থক করতে নূতন এক অর্থের প্রতীতি জাগিয়ে দেয়। পথটি লক্ষণার, কিন্তু প্রতীত অর্থের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যটুকু ব্যঙ্গ্য। সুতরাং **উপাদানলক্ষণা 'প্রয়োজন'-হেতুকা শুদ্ধা লক্ষণা**। 'সমাসোক্তি' ইত্যাদি কয়েকটি অলঙ্কারসম্পর্কে আচার্য্য রুয্যক বলছেন,

"বস্তুমাত্রং গম্যমানং বাচ্যোপস্কারকত্বেন স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ" ('উপস্কারক'=সৌন্দর্য্যজনক)। এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন টীকাকার সমুদ্রবর্দ্ধন—"যত্র বাচ্যং বর্ণনীয়তয়া বিবক্ষিতং সৎ অন্যথা অনুপপদ্যমানম্, উপপাদকতয়া স্বস্য শোভাতিশয়জনকতয়া বা পরম্ আক্ষিপতি তত্র **পর্য্যায়োক্তসমাসোক্ত্যুপমেয়োপমাসু স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ**।"

৫। **ব্যাজস্তুতি** :

'পরের ঘরের কথা না বলাই ভালো।
কিন্তু মুখ বুজে থাকা সেও সুকঠিন,
অন্তত আমার পক্ষে—বঙ্গজননীর
সন্তানেরা, জানোই তো, কথঞ্চিৎ পরচর্চ্চাপ্রিয়।
শুনে লজ্জা পাবে—
পথে ঘাটে ঘরে ঘরে বাজারে হোটেলে রেস্তরাঁয়

রঙ্গশালে ট্রেনে ট্রামে ছোটবড়ো সকলের মাঝে
দিনরাত ঘুরে ফিরে লজ্জাহীনা স্বৈরিণীর মতো
তোমার প্রেয়সী কীর্ত্তি সুন্দরী বনিতা!' —শ. চ.

(আচার্য্য অভিনবগুপ্ত-উদ্ধৃত ব্যাজস্তুতির উদাহরণ প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার মৎকৃত নব্যরূপায়ণ)

—বাইরে (বাচ্যার্থে) নিন্দা, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থে সর্ব্বত্রগামিনী কীর্ত্তির (fame) প্রশংসা। ব্যঙ্গ্য অর্থটি পাওয়া যাচ্ছে 'বিপরীতলক্ষণা'য়। বাচ্য নিন্দাটি 'অপ্রস্তুত'; সুতরাং কবির 'অবিবক্ষিত' (meaning not intended)। ব্যঙ্গ্য প্রশংসাটিই 'প্রস্তুত', কবির 'বিবক্ষিত' (intended)। এখানে নিন্দা আপন সত্তা বিসর্জ্জন ক'রে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে নূতন অর্থ প্রশংসার কাছে। তাই, এখানে ঘটেছে, ভট্ট-মম্মটের ভাষায়, **"পরার্থে স্বসমর্পণম্" লক্ষণের শুদ্ধা লক্ষণা। রাজানক রুয্যক তাঁর 'অলঙ্কার-সর্ব্বস্ব' গ্রন্থে ব্যাজস্তুতিপ্রসঙ্গে বলেছেন, "অত্র বিপরীতলক্ষণয়া বাচ্যবৈপরীত্য-প্রতীতিঃ"।**

এমনি ব্যাপার ঘটে 'অপ্রস্তুত-প্রশংসা' অলঙ্কারে।

৬। অপ্রস্তুত-প্রশংসা :

(i) "কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।
তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি॥"—রবীন্দ্রনাথ।

—নকল হীরার কথা কবির বর্ণনীয় নয় ব'লে **অপ্রস্তুত**। হীরা আবার অপ্রাণী অচেতন বস্তু; তার পক্ষে কথা বলা অসম্ভব। সুতরাং এ কবিতার বাচ্যার্থটিকেই একমাত্র অর্থ ব'লে গ্রহণ করলে, তা সঙ্গতিহীন প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই হয় না। আসলে কবির বক্তব্য হ'ল এই : যে-মানুষের মধ্যে বস্তু নাই, বাইরে তার ভড়ং বেশী; পদে পদে আপনাকে গুণী ব'লে জাহির করা তার স্বভাব; বিজ্ঞজনের বুঝতে দেরী হয় না যে লোকটি **অন্তঃসারশূন্য**। এই অর্থটিই কবির বিবক্ষিত; সুতরাং **'প্রস্তুত'**; কিন্তু এই প্রস্তুতটি ব্যঙ্গ্য। অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কারে প্রস্তুত-অপ্রস্তুতে সম্পর্ক হ'তে পারে তিনরকম : সামান্যবিশেষ (General-particular), কার্য্যকারণ (Cause-effect) অথবা সারূপ্য (সমানরূপতা, সাদৃশ্য—Analogy)। আমাদের উদাহরণে প্রস্তুত-অপ্রস্তুতে সম্বন্ধ সারূপ্য—প্রস্তুত উপমেয়, অপ্রস্তুত উপমান (যথাক্রমে গুণী মানুষ—হীরা, গুণীর ভাণযুক্ত নির্গুণ মানুষ—নকল হীরা)। ঠিক এইভাবের অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কারের উদাহরণ 'গ্রে' সাহেবের এলিজির

(ii) "Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air."

এবং আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃত কবিতা—

(iii) ["যান্তি স্বদেহেষু জরামসংপ্রাপ্তোপভর্ত্তৃকাঃ।
ফলপুষ্পর্দ্ধিভাজোঽপি দুর্গদেশবনশ্রিয়ঃ॥"
—উদ্ভটকৃত 'কুমারসম্ভব'।]

মুক্তানুবাদ :

'সুদুর্গম দেশে
পুষ্পফলে ঋদ্ধিমতী বনলক্ষ্মী শুকাইয়া যায়—
কারেও সে নাহি পায় করাইতে পান
আপন যৌবনরস।' —শ. চ.

—'flower' বা 'বনশ্রী' কবির বিবক্ষিত নয়; বিবক্ষিত (প্রস্তুত) হচ্ছে (ii) মিণ্টন ইত্যাদির মতো প্রতিভাবান্, কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিভাকে অভিব্যক্ত করার সুযোগ পায় নাই এমন গ্রাম্য লোক অথবা (iii) ব্যর্থযৌবনা নারী। সারূপ্যের ফলেই অপ্রস্তুত হ'তে এই প্রস্তুতের দ্যোতনা বা আক্ষেপ। **"স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ"** এবং **"পরার্থে স্বসমর্পণম্"** এই দুরকম লক্ষণাতেই **'পর'** অর্থাৎ নূতন অর্থটি আক্ষিপ্ত (suggested) হয় লক্ষণায়; পার্থক্য শুধু এইটুকু যে **প্রথমটিতে বাচ্যার্থ আপনাকে কতকটা বজায় রেখে সৌন্দর্য্যের খাতিরে নূতন অর্থটির দ্যোতনা করে** এবং **দ্বিতীয়টিতে বাচ্যার্থ আপনাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়েই নূতনের দ্যোতনা করে** —এই কারণে এই শুদ্ধা লক্ষণাদুটিকে যথাক্রমে বলা হয় **'অজহৎ-স্বার্থা'** (which does not give up its own meaning) এবং **'জহৎ-স্বার্থা'** (which gives up its own meaning)।

৭। আক্ষেপ :

'আসিয়াছ যদি, দাঁড়াও, বন্ধু, শুধু ক্ষণেকের তরে—
ক্ষুব্ধ এ হিয়া শান্ত করিতে চাই;
মনের কুহরে যে-বাণী গুমরে জানাইব তার পরে…
না, না, চ'লে যাও, বলিবার কিছু নাই।' —শ. চ.
(সংস্কৃত উদাহরণের মুক্তানুবাদ)

—এখানে 'বলিবার কিছু নাই' কথাটিতে যে নিষেধ বা denial অর্থ রয়েছে,

তা বাচ্যার্থ। পূর্ব্ববর্ত্তী চরণের 'জানাইব' কথাটির সঙ্গে এর অর্থসঙ্গতি নাই, সুতরাং বাক্যান্বয়ে এ বাচ্যার্থ বাধিত। কাজেই লক্ষণার পথ ধরতে হবে। Denial-আত্মক বাচ্যার্থটি মিথ্যা, মায়ামাত্র; বিপরীতলক্ষণায় affirmation-আত্মক **লক্ষ্যার্থটিই** সত্য—নায়িকার হৃদয়বেদনার নিঃসহপ্রচণ্ডতারূপ গূঢ় ব্যঙ্গ্যই এ **লক্ষণার** 'প্রয়োজন'। তথাকথিত নিষেধের দ্বারা ভাবে যে তীব্রতার সৃষ্টি হয়েছে, নায়িকার মুখে বর্ণনা বসিয়ে দিলে তা সম্ভব হ'ত না। আচার্য্য **রুষ্যক** এই নিষেধকে বলেছেন "**প্রস্খলদ্রূপঃ**"—লক্ষণার লক্ষণই এই। **লক্ষণা হয়** তখনই যখন বাচ্যার্থের পা হ'য়ে যায় খোঁড়া, গতি হয় স্খলিত, লক্ষ্যার্থের হাত ধরা ভিন্ন তখন তার আর অন্য উপায় থাকে না। **'ধ্বন্যালোকে'র** প্রথম উদ্যোতের সপ্তদশ কারিকার **'স্খলদ্গতিঃ'** পদটির ব্যাখ্যায় আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলছেন, "যতঃ স্খলন্তী বাধকব্যাপারেণ বিধুরীক্রিয়মাণা গতিঃ অববোধনশক্তিঃ যস্য শব্দস্য তদীয়ো ব্যাপারো লক্ষণা" [যে শব্দের গতি অর্থাৎ অর্থপ্রকাশের শক্তি বাধার ফলে স্খলিত অর্থাৎ বিধুরীকৃত (অপ্রকৃতিস্থ, দুর্ব্বল) হ'য়ে পড়ে, তারই ব্যাপারের নাম লক্ষণা]।

বিভিন্ন ভিত্তিতে গঠিত সাতটি প্রধান অলঙ্কারের আলোচনায় দেখলাম যে এদের অলঙ্কারত্বসিদ্ধির অন্যতম প্রধান সহকারী **'লক্ষণা'**। অনন্বয়, উপমেয়োপমা, বিরোধ ইত্যাদি আরও অনেক অলঙ্কার রয়েছে, যাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেখানেও লক্ষণার ক্রিয়া বর্ত্তমান। বিশ্লেষিত সাতটি অলঙ্কার হ'তেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে ব'লে, অনন্বয়াদির আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

আমার উদ্দেশ্য একটি সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এ কাজ সহজ হবে ব'লে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের শরণ নিচ্ছি। একরকম রোগজীবাণুকোষ (Bacteria cell) আছে যার নাম কক্কাস্ (Coccus), **আকৃতিতে এরা এক**—গোল (Spheroidal); কিন্তু **প্রকৃতিতে বহু**—Pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus। এই বহুরূপে এরা বহু রোগের স্রষ্টা—Pneumonia, Erysepellas, Carbuncle (যথাক্রমে)। দেখা যাচ্ছে যে **এক Coccus মানবদেহে বিচিত্রভাবে লীলা ক'রে বিচিত্র নামরূপের ব্যাধিকে প্রকাশ করছে।** মানুষের দেহে বিশেষভাবের রোগ সৃষ্টি করে বিশেষ প্রকৃতির কক্কাস, অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগ নির্ণয় করেন কক্কাসের বিশিষ্ট প্রকৃতির থেকে। জীবাণুকোষটা বড়ো নয়, **বড়ো তার বিশেষ প্রকৃতি**। শুধু কোষের নামে যে রোগের নামকরণ হয় না চিকিৎসাবিজ্ঞানী মাত্রেই তা জানেন।

সুতরাং যদি কেউ রোগের নাম দেন Coccusitis, কি Coccusalgia, ব্যাপারটা একান্ত অবৈজ্ঞানিক হ'য়ে ওঠে। ঠিক এমনি অবৈজ্ঞানিক আমাদের কোনো অলঙ্কারের 'লক্ষ্যোক্তি' নামকরণ। 'ব্যঙ্গ্যোক্তি'-র সম্বন্ধেও এই কথা। 'লক্ষ্যোক্তি' বা 'ব্যঙ্গ্যোক্তি'কে পৃথক্ অলঙ্কার ব'লে স্বীকার করতে পারি না। প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি যাঁদের বেশী, সেই আচার্য্যদের কারুর গ্রন্থে 'ব্যঙ্গ্যোক্তি' নাম পাই নাই।

অলঙ্কারের ইতিকথা

আবিষ্কৃত ভারতীয় অলঙ্কারগ্রন্থগুলির প্রাচীনতমখানির রচনাকাল ষষ্ঠ শতাব্দী। কিন্তু দেখা যায় অলঙ্কারের ওখানে রীতিমতন বয়ঃসন্ধি। কখন, কেমন ক'রে ওর জন্ম হ'ল, কেমন ক'রে নবজাতক দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান হ'তে লাগল, এসব এখনো রহস্যাবৃত। এ রহস্য অপসারিত করা সুকঠিন; তবু চেষ্টা ক'রে দেখা যেতে পারে কতকটা তরল করা যায় কিনা।

অলঙ্কার আর **উপমা** দুটি কথারই প্রয়োগ ভারতীয় সাহিত্যে সুপ্রাচীন:

(i) ঋক্-মন্ত্রের ঋষি বলছেন, 'হে প্রিয়দর্শন বায়ুদেবতা, তুমি এসো, তোমার জন্য এই সোমরস **অলঙ্কৃত** ক'রে রেখেছি ("বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা **অরংকৃতাঃ**"—ঋগ্‌বেদ ১।১।৩; '**অরংকৃতাঃ অলংকৃতাঃ**'—যাস্কমুনি)।

(ii) ব্রহ্মবিদ্ এসেছেন ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্ম বললেন বুদ্ধিরূপা অপ্সরাদের, 'বিজরা নদী পার হ'য়ে এসেছেন ইনি; আমার যোগ্য সম্মান দিয়ে এঁকে অভ্যর্থনা ক'রে আনো'। কুঙ্কুমচূর্ণ, বসন, ফল, অঞ্জন, পুষ্পমালা হাতে নিয়ে গেলেন পাঁচশো অপ্সরা। আগন্তুককে করলেন তাঁরা **ব্রহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত**। **ব্রহ্মালঙ্কারে** অলঙ্কৃত ব্রহ্মবিদ্ চললেন ব্রহ্মাভিমুখে ("তং ব্রহ্ম আহ অভিধাবত মম যশসা বিজরাং বা অয়ং নদীং প্রাপৎ···। তং পঞ্চশতানি অপ্সরসাং প্রতিযন্তি শতং চূর্ণহস্তাঃ, শতং বাসোহস্তাঃ, শতং ফলহস্তাঃ, শতম্ আঞ্জনহস্তাঃ, শতং মাল্যহস্তাঃ তং **ব্রহ্মালঙ্কারেণ অলঙ্কুর্ব্বন্তি**। স **ব্রহ্মালঙ্কারেণ অলঙ্কৃতো** ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি"—ঋগ্‌বেদীয় কৌষীতকি উপনিষৎ ১।৩,৪)।

(iii) যাজ্ঞবল্ক্য বনস্পতির সঙ্গে পুরুষের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে বলছেন, 'পুরুষের লোমরাজি বৃক্ষের পত্র, ত্বক্ বল্কল, রুধির রস, অস্থি কাষ্ঠ, বৃক্ষের মজ্জা পুরুষদেহের মজ্জার **উপমা**' ("যথা বৃক্ষো বনস্পতিঃ তথৈব পুরুষঃ। তস্য লোমানি পর্ণানি, ত্বক্ অস্য উৎপাটিকা বহিঃ, ত্বচঃ রুধিরো রসো বৃক্ষাৎ ইব, অস্থীনি অন্তরতঃ দারূণি, মজ্জা **মজ্জোপমা**"—যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখার শতপথ-ব্রাহ্মণ, সপ্তদশ কাণ্ড; এরই অপর নাম বৃহদারণ্যক উপনিষৎ—বৃঃ ৩।৯।২৮)।

মহর্ষি বাল্মীকির 'রামায়ণে' 'অলঙ্কার' আর 'উপমা' কথাদুটির প্রয়োগ অজস্র:

(iv) **ক্ষমাই** নারীদের **অলঙ্কার—"অলঙ্কারো** হি নারীণাং **ক্ষমা**" (বালকাণ্ড, ৩৪)।

(v) আকাশ-পথে রাবণের অঙ্কগত সীতার সুন্দরনয়নযুক্ত মুখখানি শুভ্র সুনির্মল জ্যোতির্ময় দন্তপঙ্ক্তির দ্বারা **অলঙ্কৃত**—

"শুক্লৈঃ সুবিমলৈর্দন্তৈঃ প্রভাবদ্ভির**লঙ্কৃতম্**।

তস্যাঃ সুনয়নং বক্ত্রম্ আকাশে রাবণাঙ্কগম্॥" (অরণ্যকাণ্ড, ৫২)

(vi) কুটজ-অর্জ্জুনতরুশ্রেণীর উপর দিয়ে মেঘসোপানপরম্পরা বেয়ে আকাশে আরোহণ ক'রে তাকে **অলঙ্কৃত** করার শক্তি রাখেন দিবাকর—

"শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপঙ্ক্তিভিঃ।

কুটজার্জ্জুনমালাভিঃ **অলঙ্কর্ত্তুং** দিবাকরঃ॥" (ঐ, ২৮)

(vii) দেবারণ্য যার **উপমা** সেই মতঙ্গবনে ("মতঙ্গবনম্...তস্মিন্ দেবারণ্যো**পমে** বনে"—অরণ্যকাণ্ড, ৭৩)।

(viii) নির্মল জলের সরসী প্রিয়দর্শনা পম্পা, যে-জলের **উপমা** স্ফটিক, রাম তাকে দেখে...("পম্পাং তাং প্রিয়দর্শনাম্... স্ফটি**কোপম**তোয়াং...স তাং দৃষ্ট্বা"—অরণ্যকাণ্ড, ৭৫)।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে আধুনিক বাঙলাকাব্যেও এইজাতীয় প্রয়োগ বিরল নয়:

"কীর্ত্তিবাস কীর্ত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের **অলঙ্কার**" —মধুসূদন।

"তুমিই তোমার মাত্র **উপমা** কেবল" —গিরিশচন্দ্র।

"যেখানে শরতের শিউলিফুলের **উপমা** তুমি"—রবীন্দ্রনাথ।

প্রাচীন উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ঋষিদেরও কাছে অলঙ্করণ মানে ছিল সুন্দরীকরণ—প্রত্যক্ষভাবে বস্তুবিশেষের এবং পরোক্ষভাবে সমগ্র উক্তিটির। তাঁরা জানতেন যে সূক্ষ্ম সত্যই হোক বা স্থূল তথ্যই হোক, তার নগ্ন প্রকাশ মানবচিত্তে বা দেবচিত্তে কোথাও আনন্দের স্পন্দন তোলে না, চেষ্টা করতে হয় যাতে **প্রকাশটি স্বয়ং অলঙ্কার** হ'য়ে ওঠে। বামদেব ঋষি যজমানকে বলছেন, 'হে যজমান, তোমার **বাক্য দিয়ে** সর্ব্বজ্ঞ অমৃত অগ্নিকে **অলঙ্কৃত করো** ("...বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহম্ অমর্ত্ত্যম্...**ঋঞ্জসে গিরা**"—ঋগ্বেদ ৩।৫)। বৈদিক 'ঋঞ্জ্' ধাতুর অর্থ অলঙ্করণ ("ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মা"—যাস্কমুনি)। তাঁদের অলঙ্করণের প্রধান পথ ছিল বিজাতীয় বস্তুদ্বয়ের মধ্যে আবিষ্কৃত চমৎকৃতিময় সাদৃশ্যের—**উপমার** পথ।

কিন্তু আর্ষযুগে অলঙ্কার পৃথক্ শাস্ত্ররূপে গ'ড়ে ওঠে নাই, যেমন উঠেছিল ছন্দঃশাস্ত্র। এ অবস্থায় উপমাকে অন্যতম অলঙ্কাররূপে সে যুগের কোনো গ্রন্থে

পাওয়ার আশা দুরাশামাত্র। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে উত্তর-কালীন অলঙ্কারশাস্ত্রের ঈষৎ অঙ্কুরিত বীজ দেখা যাচ্ছে ওই আর্ষ সাহিত্যে।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এইখানে ব'লে রাখি। যে অর্থে **অলঙ্কার** শব্দটা আমরা প্রয়োগ ক'রে থাকি, সেই **অর্থটি** কিন্তু **লাক্ষণিক**। সোনার কাঁকন, মোতির মালা, হীরের আংটিকে আমরা বলি অলঙ্কার। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে এরা অলঙ্কার নয়, স্বর্ণকাররচিত সুন্দর শিল্পমাত্র। নারীদেহে যথাযোগ্য আশ্রয় যতক্ষণ না পাচ্ছে, ততক্ষণ একটা গজদন্তের ময়ূরপঙ্খীও যা একজোড়া সোনার কাঁকনও তাই—শিল্পীর স্বয়ংসম্পূর্ণ উপভোগ্য সৃষ্টি। কিন্তু এই শিল্পরচনায় স্বর্ণকারেরও চোখের সামনে থাকে নারী, শো-কেসে দেখে আমাদেরও চোখে ভেসে ওঠে বাহুবল্লরী, চাঁপার কলি আঙুল, এই সব—এমনি একটা সংস্কার হ'য়ে গেছে। **কাঁকন চুড়ির অলঙ্কারত্ব আপেক্ষিক**, শিল্পত্বই তার স্বাভাবিক পরিচয়। স্বকীয় রূপগত সৌন্দর্য্যে সে শিল্প, **পরের সৌন্দর্য্যসাধনে সে অলঙ্কার**। এ তত্ত্ব ঋষিরাও জানতেন; জানতেন ব'লেই অপ্সরাদের হাতে যা ছিল শুধু পুষ্পমালা ব্রহ্মবিদের কণ্ঠ আশ্রয় ক'রে তা-ই অনায়াসে অলঙ্কার হ'য়ে উঠল।

উপমার কাজ অলঙ্করণ; তবু বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণ-মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত কোথাও উপমাকে যে অলঙ্কাব বলা হয় নাই, তার কারণ অলঙ্কার নামে সাহিত্যতত্ত্বেরই সৃষ্টি তখনো হয় নাই।

কিন্তু অলঙ্কারদৃষ্টিতে না দেখলেও বেদোত্তর যুগের ভারতীয় চিন্তায় **উপমা** যে এক ক্রমবর্দ্ধমান মর্য্যাদা লাভ করছিল, তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাচ্ছি আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বৎসর আগে রচিত

যাস্কমুনির নিরুক্ত গ্রন্থে:

ষড়ঙ্গ বেদের অন্যতম মূল্যবান্ অঙ্গ এই **নিরুক্ত—একাধারে ব্যাকরণ আর ভাষাতত্ত্ব** (Philology)।

যাস্কমুনির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই উপমার সংজ্ঞা রচিত হয়েছিল, যার সঙ্গে আমাদের পরিচিত সংজ্ঞার কোনো পার্থক্য নাই। প্রাচীন সংজ্ঞাটির রচয়িতা মহামুনি গার্গ্য।

নানা অর্থে নিপতিত হয় (অর্থাৎ নানা অর্থ প্রকাশ করে) ব'লে কতকগুলি অব্যয়ের নাম 'নিপাত' এবং এই নানা অর্থের অন্যতম হ'ল **উপমা** অর্থ ("অথ নিপাতাঃ। উচ্চাবচেষু অর্থেষু নিপতন্তি। **উপমার্থে** অপি")—এই

ব'লে যাস্ক চারটি নিপাতের উপমার্থক প্রয়োগ দেখালেন তাঁর '**নিরুক্তে**'র প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে।

তারপর, **"অথাতঃ উপমাঃ"** ব'লে আরম্ভ ক'রে উপমার বিশদ পরিচয় দিলেন তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে। **উপমার** সংজ্ঞা নিজে নির্দ্দেশ না ক'রে উদ্ধৃত করলেন তিনি **গার্গ্যরচিত সংজ্ঞাটি—"যদতত্তৎসদৃশম্ ইতি"**। সন্ধি ভাঙলে এটির চেহারা হয় 'যৎ অতৎ তৎ-সদৃশম্' অর্থাৎ যৎ (যে-বস্তু) অতৎ (ন তৎ—সে বস্তু নয়) (তবু) তৎ-(সেই বস্তুর) সদৃশম্ (মতন)। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে—মুখ (যৎ) ফুল নয় (অতৎ—ন তৎ; তৎ=ফুল), তবু ফুলের মতন (তৎ-সদৃশম্); এমনি হ'লেই হয় উপমা। বলা বাহুল্য যে তুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে উপমা হয় এমন ধর্ম্মের ভিত্তিতে, যা দুপক্ষেই সাধারণ (property common to both); আমাদের উদাহরণটিতে স্নিগ্ধঅকোমলতার ভিত্তিতে মুখ ('যৎ') আর ফুলের ('অতৎ'-এর) সাদৃশ্য উপমা সৃষ্টি করেছে।

যাস্কমুনি উপমার বহু উদাহরণ দিয়েছেন ঋগ্‌বেদ থেকে।

(i) ক্রিয়া যে-উপমার সাধারণ ধর্ম্ম যাস্কমতে তার নাম **কর্ম্মোপমা**—'দীপ্যমান অগ্নির মতন সূর্য্যরশ্মি দেখা যাচ্ছে'।

(ii) 'বৎ'-অব্যয়যুক্ত উপমার নাম **সিদ্ধোপমা**—'হে মহিব্রত অগ্নি, অত্রিবৎ, অঙ্গিরবৎ, প্রিয়মেধবৎ কণ্বপুত্র প্রস্কণ্বেরও আহ্বান শ্রবণ করো।' সাধারণ লোক এই 'বৎ'যুক্ত উপমা খুব বেশী প্রয়োগ করত বৈদিক যুগে; লোকপ্রসিদ্ধিই 'সিদ্ধোপমা' নামের কারণ।

(iii) বর্ণ, রূপ ইত্যাদি যদি উপমাগর্ভ বহুব্রীহির উত্তরপদ হয়, তাহ'লে হয় **রূপোপমা**—'হিরণ্যরূপ' (হিরণ্যের রূপের মতন রূপ যার, সেই অগ্নি); 'হিরণ্যবর্ণ' আদিত্য; 'হিরণ্যবর্ণরূপ' (হিরণ্যের বর্ণের মতন বর্ণ যার সে হিরণ্যবর্ণ, আদিত্য; হিরণ্যবর্ণের রূপের মতন রূপ যার সে হিরণ্যবর্ণরূপ, অগ্নি:—"হিরণ্যবর্ণস্য ইব অস্য রূপম্": যাস্কমুনি)।

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে **লুপ্তোপমা**:

"অথ **লুপ্তোপমানি** ইতি **আচক্ষতে**"—'আচক্ষতে' মানে (যাস্কের পূর্ব্বাচার্য্যগণ) বলেন; বলেন যে—তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ না থাকায়, অর্থ থেকে যেখানে উপমাবোধ হয়, সেখানে হয় **লুপ্তোপমা**; যেমন প্রশংসার্থে পুরুষসিংহ, কুৎসার্থে নরকুক্কুর। 'লুপ্তোপমা' নামটি যে যাস্ক স্বয়ং সৃষ্টি করেন নাই, তাঁর পূর্ব্বকালীন কোনো আচার্য্যের গ্রন্থ থেকে নিয়েছেন, তার প্রমাণ

'আচক্ষতে' ক্রিয়াপদটি। গার্গ্য, শাকটায়ন, বার্ষায়ণি, মৌদ্‌গল্য, কাৎথক্য, শাকপুণি, ঔপমন্যব ইত্যাদি বহু প্রাচীন আচার্য্যের নাম উল্লেখ ক'রে তাঁদের মত উদ্ধৃত করেছেন যাস্ক।

যাস্কের পর পাণিনি :

মাঝখানে প্রায় **অর্দ্ধসহস্র** বর্ষের ব্যবধান। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনির আবির্ভাবকাল প্রাক্‌খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। শুধু উপমা নয়, **'উপমান'**, **'উপমিত'** (উত্তরকালের উপমেয়) এবং **'সামান্য'** (সামান্য ধর্ম্ম বা সাধারণ ধর্ম্ম) উপমার এই অঙ্গতিনটিকে পাণিনি **অন্তরঙ্গভাবে** জানতেন।

উপমাপ্রসঙ্গে পাণিনির কথা বলতে গেলে আরও দুজন মনীষীর কথা এসে পড়ে—**কাত্যায়ন** আর **পতঞ্জলি**। প্রাক্‌খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনিসূত্রের পরিপূরক 'বার্ত্তিক'সূত্র রচনা করেন কাত্যায়ন। এর অল্পকাল পরে ভগবান্ পতঞ্জলি রচনা করেন সবার্ত্তিক পাণিনিসূত্রের অতুলনীয় **'মহাভাষ্য'**। এও খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ শ'দুই বছর আগের কথা।

পাণিনির ব্যাকরণে উপমাত্মক সূত্র অনেকগুলি রয়েছে :

(i) **"উপমানানি সামান্যবচনৈঃ"**—ঘনশ্যামঃ ('শ্যাম' সামান্য-বচন, সাধারণ ধর্ম্ম ; এই সামান্যবচনকে নিয়ে উপমান 'ঘন' কর্ম্মধারয় সমাস সৃষ্টি করেছে)।

(ii) **"উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে"**—পুরুষব্যাঘ্রঃ (উপমিত অর্থাৎ উপমেয় 'পুরুষ', উপমান 'ব্যাঘ্র', সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্ম প্রয়োগ করা হয় নাই কারণ তা নিয়ম নয়, সমাস কর্ম্মধারয়)।

(iii) **"উপমানাৎ চ"**—পদ্মগন্ধিঃ (পদ্মের মতন গন্ধ যার—বহুব্রীহি ; **'পদ্ম'** লাক্ষণিকভাবে **উপমান**)।

(iv) **"উপমানাৎ আচারে"**—পুত্রীয়তি (গুরু পুত্রের প্রতি যেমন আচরণ করেন তেমনি করেন ছাত্রের প্রতি—'পুত্রম্ ইব আচরতি পুত্রীয়তি ছাত্রম্' ; পুত্র **উপমান**, ছাত্র উপমেয় ; নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।

(v) **"উপমানং শব্দার্থপ্রকৃতৌ এব"**—ধ্বাঙ্ক্ষরাবী (ধ্বাঙ্ক্ষের অর্থাৎ কাকের মতন রাবী অর্থাৎ রব করে যে ; 'ধ্বাঙ্ক্ষ' **উপমান**) ইত্যাদি।

কাত্যায়নকৃত বার্ত্তিকে

"সপ্তম্যুপমানপূর্ব্বপদস্য উত্তরপদলোপঃ"—পাণিনির ২।২।৪ সূত্রের বার্ত্তিক (বারাণসী সংস্করণের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' দ্রষ্টব্য)।

—সপ্তম্যন্ত পূর্ব্বপদের এবং **উপমানপূর্ব্বপদের** বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের উত্তরপদটি লুপ্ত হয়: এই হ'ল বার্ত্তিকটির বাঙলা অনুবাদ। গোবিন্দঠাকুর তাঁর 'কাব্যপ্রদীপ' গ্রন্থে এই বার্ত্তিকটি উদ্ধৃত করেছেন লুপ্তোপমাপ্রসঙ্গে। আমার **'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'য়** উপমা অলঙ্কারের বিশিষ্ট উদাহরণ **"তড়িত্তবরণী হরিণনয়নী**..." বোঝাতে এই বার্ত্তিকটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি ব'লে এখানে শুধু অনুবাদ ক'রে দিলাম। 'লুপ্তোপমা' দ্রষ্টব্য)।

পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্যে' পাণিনির "উপমানানি সামান্য-বচনৈঃ" সূত্রটির ব্যাখ্যায় **'উপমেয়'** কথাটির চমৎকার একটি **সংজ্ঞা** রচনা করেছেন—উপমানের পাশে থেকে তার সঙ্গে আপন সাদৃশ্য অংশতঃ যাচাই ক'রে নেয় যে, সে **উপমেয়** ("উপ সমীপে ন অত্যন্তায় মীয়তে পরিচ্ছিদ্যতে যৎ তৎ **উপমেয়ম্**")।

ইচ্ছার্থে 'সন্'প্রত্যয়-সম্পর্কে পাণিনিসূত্রের (৩।১।৭) পরিপূরক কাত্যায়নকৃত **বার্ত্তিক—"উপমানাৎ বা সিদ্ধম্"**। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে কাত্যায়নের এই মত আংশিকভাবে খণ্ডন করছেন এই ব'লে যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াপদের উপমেয়-উপমান সম্বন্ধ হয় না ("পিপতিষতি ইব পিপতিষতি। **ন বৈ তিঙন্তেন উপমানম্ অস্তি**")।

'সন্'প্রত্যয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা'য় পূর্ণোপমার xxii-সংখ্যক উদাহরণের **'মন্তব্য'** অংশে।

যাঁদের কথা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তাঁরা সকলেই বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক নন। কিন্তু শব্দে শব্দে যে-সম্পর্ক নিয়ে উল্লিখিত বিশেষ সূত্রগুলি তাঁদের রচনা করতে হয়েছে, সে সম্পর্ক সহজ নয়, ঔপচারিক অর্থাৎ অভিধার পথে সে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই ব'লে তাঁদের চলতে হয়েছে লক্ষণার পথে। বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য (উপমা) যে বাস্তব নয়, উপচারগত যাস্কমুনি সে কথা তো স্পষ্টই বলেছেন—"উপমার্থীয়ঃ উপচারঃ তস্য যেন উপমিমীতে" (নিরুক্ত ১।২।১)। 'ঘনশ্যাম', 'পুরুষসিংহ' প্রকৃতপক্ষে বক্রোক্তি এবং বক্রোক্তিই অলঙ্কার। ব্যাকরণ বৈয়াকরণের সৌন্দর্য্যবোধপ্রকাশের স্থান নয়; তবু এ বোধ আভাসিত হয়েছে অনেক স্থলে। 'বাক্'-সূক্তের ঋষি বৃহস্পতি একটি ঋক্-এ (ঋগ্বেদ ৮।২।২৩) বলছেন, 'বাক্‌কে দেখেও দেখতে পান না শুনেও শুনতে পান না এমন পাঠক আছেন; আবার এমন পাঠকও আছেন যাঁর কাছে বাক্ আপন তনুকে প্রকাশ করেন' (**"উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ**

শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্। উত ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে…")। শুধু এইটুকুই ঋষির বক্তব্য, কিন্তু এইখানেই তিনি থামলেন না ; বক্তব্যটিকে সুন্দরতর করার উদ্দেশ্যে এর সঙ্গে তিনি যোগ করলেন একটি উপমা : বাক্ কেমন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেন বিশেষ (বিদ্বান্) পাঠকের কাছে ? না, 'কৃতপ্রসাধনা বাসনাময়ী জায়া যেমন আত্মপ্রকাশ করেন দয়িতের কাছে, তেমনি' ("জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ")। যাস্কমুনি ঋষির মূল কথাটির উপর জোর না দিয়ে জোর দিলেন **উপমার** উপর ; বললেন তিনি "প্রকাশনম্ অর্থস্য **উপমোত্তময়া** বাচা"। যাকে আমরা বলি **অলঙ্কার**, সেই **সৌন্দর্য্যময় পর্য্যাপ্ত কারুকর্ম্মের** ফলে অর্থের শক্তি তথা আবেদন যে অনেক বেড়ে যায়, এ সত্য তাঁদের অজ্ঞাত ছিল না।

ঋগ্‌বেদ থেকে রামায়ণের ভিতর দিয়ে পতঞ্জলির মহাভাষ্য পর্য্যন্ত আমরা অলঙ্কার পেলাম, উপমা এবং তার অঙ্গ 'উপমান' 'উপমিত' 'সামান্য' পেলাম ; কিন্তু পেলাম না কাব্যতত্ত্বের অঙ্গীভূত পারিভাষিক অলঙ্কারকে এবং অন্যতম কাব্যালঙ্কাররূপে গৃহীত উপমাকে।

প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখা ভালো যে প্রাচীন ব্যাকরণে না পেলেও '**রূপক**' নামটি প্রাচীন গ্রন্থেই পাচ্ছি—"…শরীর**রূপক**বিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তি চ" (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।১)। এর মানে হ'ল, 'কঠ' উপনিষৎ আত্মা, শরীর ইত্যাদির সঙ্গে রথী, রথ ইত্যাদির যে **রূপক**-কল্পনা গৃহীত হয়েছে এইটুকু দেখাচ্ছেন। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেব তু ॥…" ('কঠ')।

কিন্তু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে অলঙ্কার স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে জন্মলাভ করেছিল ব্যাকরণযুগেই ; তা না হ'লে প্রাক্‌খৃষ্ট প্রথম শতকে অর্থাৎ পতঞ্জলির প্রায় সমকালে **ভরতমুনি** তাঁর '**নাট্যশাস্ত্রে**'

"**উপমা দীপকং** চৈব **রূপকং যমকং** তথা।
কাব্যস্যৈতে হ্যলঙ্কারাশ্চত্বারঃ **পরিকীর্ত্তিতাঃ** ॥" (১৬।৪১)

কখনই লিখতে পারতেন না ; '**পরিকীর্ত্তিতাঃ**' কথাটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান্ : উপমা, দীপক, রূপক অর্থালঙ্কার এবং **যমক** শব্দালঙ্কার ভরতমুনি সৃষ্টি করেন নাই ; তাঁর পূর্ব্বকালীন আচার্য্যগণের দ্বারা যে-সব অলঙ্কার **পরি**-কীর্ত্তিত হয়েছে অর্থাৎ যাদের মহিমা সম্যক্‌রূপে ('পরি') কীর্ত্তিত হয়েছে, তাদেরই নাম করেছেন ভরতমুনি। যাঁরা মন দিয়ে 'নাট্যশাস্ত্র' পড়েছেন, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন যে 'নাট্যশাস্ত্র' সম্পূর্ণরূপে মৌলিক গ্রন্থ নয়, বহু পূর্ব্বতন আচার্য্যের অভিমত, সংজ্ঞা, পরিভাষা ভরতমুনি উদ্ধৃত করেছেন।

উপমা, দীপক, রূপক—তিনটিই ব্যাপক অর্থে (যে অর্থে আমরা "উপমা কালিদাসস্য" বলি, সেই অর্থে) উপমা, কারণ তিনটিরই ভিত্তি সাদৃশ্য। দেখা যাচ্ছে যে ভরতমুনির সময় পর্য্যন্ত একমাত্র **যমকই** শব্দালঙ্কাররূপে সৃষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রয়েছে। 'নাট্যশাস্ত্রে'র শ্রেষ্ঠ দান **রস**। "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। অথ স্থায়িভাবং রসত্বম্ উপনেষ্যামঃ"—ভরতমুনির এই নাট্যরসসংজ্ঞাটিকে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় কাব্যক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে উত্তরকালীন প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিক রসকেই কাব্যের শ্রেষ্ঠতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রসতত্ত্ব, গুণতত্ত্ব ইত্যাদি বহু তত্ত্বের জন্য আমরা ভরতমুনির কাছে ঋণী।

ভরতের সময় থেকে খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাব্যচিন্তার ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষা নিষ্ক্রিয় ছিল না। দুচারজন মনীষীর নাম পাওয়া যায়; বিচিত্র অভিমত পাওয়া যায় অজ্ঞাতনামা অনেকেরই; কিন্তু তাঁদের রচিত গ্রন্থ এখনো অনাবিষ্কৃত।

আবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে **প্রাচীনতম**

আচার্য্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ'—ষষ্ঠ শতাব্দী :

দণ্ডী অলঙ্কারকে বলেছেন কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ক ধর্ম্ম (attribute)—"কাব্যশোভাকরান্ ধর্ম্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে"। তিনশো আটষট্টি শ্লোকে নানা প্রকারভেদ এবং উদাহরণ সহ ছত্রিশটি অর্থালঙ্কার আলোচনা করেছেন দণ্ডী। তাঁর সংজ্ঞার ভাষা প্রাঞ্জল; উদাহরণগুলি স্বরচিত এবং সুন্দর। তাঁর কোনো কোনো মত উত্তরকালের অনেক আলঙ্কারিক স্বীকার করেন নাই। তবু তাঁর 'কাব্যাদর্শ' আজও বহুমানিত।

কাব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন, 'বিচিত্ররূপা বাণীর বন্ধনকৌশল বিধিবদ্ধ ক'রে গেছেন পূর্ব্বসূরিগণ; দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁরা কাব্যশরীরের স্বরূপ; তাঁদেরই অনুসরণে আমি বলতে চাই যে **অভীষ্ট-অর্থ-সংবলিত পদাবলীই কাব্য'** :

["...সূরয়ঃ।
বাচাং বিচিত্রমার্গাণাং নিববন্ধুঃ ক্রিয়াবিধিম্॥
তৈঃ শরীরং চ বাক্যানাম্, অলঙ্কারাশ্চ দর্শিতাঃ।
শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী॥"—কাব্যাদর্শ, ১।৯-১০]

ভরত থেকে দণ্ডীর অব্যবহিত প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত বহু 'সূরি' কাব্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। উত্তরকালীনরা আপন গ্রন্থে কোথাও তাঁদের অনুসরণ

করেছেন, কোথাও বা তাঁদের মত খণ্ডন করেছেন; কিন্তু নাম-উল্লেখব্যাপারে অতীব কৃপণ তাঁরা। বামন বলেছেন, 'কবি' দুরকম—'আরোচকী' (বিবেকবান্) আর 'সতৃণাভ্যবহারী' (অবিবেকী); কিন্তু শব্দদুটি যে 'ভাবক' (কাব্যপাঠক)-সম্পর্কে ('কবি'-সম্পর্কে নয়) প্রথম সৃষ্টি করেন বামনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী এক সাহিত্যশাস্ত্রকার নাম **মঙ্গল আচার্য্য** এটুকু জানতে পারলাম রাজশেখরের 'কাব্য-মীমাংসা' প'ড়ে। এর বেশী মঙ্গলের আর কোনো পরিচয় আমরা জানি না। ভামহ উপমার সাতটি দোষের উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "ত এতে উপমাদোষাঃ সপ্ত **মেধাবি**নোদিতাঃ" (কাব্যালঙ্কার ২।৩৯-৪০)। **মেধাবী** সুপ্রাচীন আচার্য্য; তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম আমাদের অজ্ঞাত। রাজশেখরও মেধাবীর নাম করেছেন এইটুকু দেখাতে যে জন্মান্ধও প্রতিভাবান্ লেখক হ'তে পারেন—মেধাবী জন্মান্ধ ছিলেন। ভামহ মেধাবীর মতটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন; মেধাবীর মূল উক্তিটি তাঁর গ্রন্থ (নাম জানি না) থেকে উদ্ধৃত করলেন একাদশ শতাব্দীর নমিসাধু রুদ্রটের 'কাব্যালঙ্কারে'র উপর স্বরচিত টীকায়। মেধাবীর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ঐ পর্য্যন্ত।

এ অবস্থায় দণ্ডীর পূর্ব্বসূরি নির্ণয় করা সুকঠিন। শুধু একখানা গ্রন্থ রয়েছে, যার মতের সঙ্গে দণ্ডীর মতের অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর সাদৃশ্য দেখা যায়। গ্রন্থখানি **অগ্নিপুরাণ**। অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে (Kane) তাঁর 'History of Alamkar Literature'-এ বলেছেন, অগ্নিপুরাণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে রচিত এবং তার অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে নবম শতাব্দীতে অথবা কিছু পরে। কাণের উক্তিটি বিচারসহ কিনা দেখা যাক।

পুরাণমাত্রেই উত্তরকালীন প্রক্ষেপ প্রচুর আছে সত্য; কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থে উত্তরকালীন মত দেখতে পেলেই তাকে নির্বিচারে প্রক্ষিপ্ত বলা চলে না।

'কাব্যাদর্শে'র দ্বিতীয় (অর্থালঙ্কার) পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে আচার্য্য দণ্ডী বলেছেন, 'অলঙ্কার-বিকল্পের যে বীজরূপ পূর্ব্বাচার্য্যগণ দেখিয়ে গেছেন, তারই পরিসংস্করণের জন্য আমার এই পরিশ্রম':

"...বীজং বিকল্পানাং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ প্রদর্শিতম্।
তদেব পরিসংস্কর্ত্তুময়মস্মৎ-পরিশ্রমঃ॥" (২।২)

এই পূর্ব্বাচার্য্যগণের মধ্যে ভরতমুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' উপমা দীপক আর রূপক এই তিনটি অর্থালঙ্কারের নাম করেছেন; কিন্তু এদের প্রকারভেদ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। আচার্য্য দণ্ডী **উপমা** অলঙ্কারের দুটি মূল প্রকারভেদের নাম দিয়েছেন **'ধর্ম্মোপমা'** আর **'বস্তূপমা'**। বলেছেন তিনি,

তুল্যধর্ম্ম (সাধারণ ধর্ম্ম) **প্রদর্শিত** (ভাষায় প্রকাশিত) হ'লে হয় **ধর্ম্মোপমা** এবং **প্রতীয়মান** হ'লে হয় **বস্তূপমা** :

> "**ধর্ম্মোপমা** সাক্ষাৎ তুল্যধর্ম্মপ্রদর্শনাৎ"—কাব্যাদর্শ ২।১৫
>
> "প্রতীয়মানৈকধর্ম্মা বস্তূপমৈব সা"—কাব্যাদর্শ ২।১৬

অগ্নিপুরাণকার বলছেন :

> "যত্র সাধারণো ধর্ম্মঃ **কথ্যতে গম্যতেঽথবা**।
>
> তে ধর্ম্ম-বস্তু-প্রাধান্যাদ্ **ধর্ম্ম-বস্তূপমে** উভে ॥"—অগ্নিপুরাণ ৩৪৪।১০

এই নামে (কোনো নামেই) উপমার প্রকারভেদ সপ্তম শতাব্দীর ভামহ বা ভামহের পদাঙ্কচারী অষ্টম শতাব্দীর উদ্ভট করেন নাই। উদ্ভটের সমকালীন **বামন** এই ভেদদুটির নাম দিয়েছেন **পূর্ণোপমা** আর **লুপ্তোপমা** ; "সা পূর্ণা লুপ্তা চ"—কাব্যালঙ্কারসূত্র ৪।২।৪। 'লুপ্তোপমা' নামটি বামন সম্ভবতঃ যাস্কের 'নিরুক্ত' থেকে নিয়েছেন। যাস্ক যে 'লুপ্তোপমা' নামটি লক্ষণসহ পেয়েছিলেন তাঁর পূর্ব্বাচার্য্যদের কাছে, একথা যাস্ক-প্রসঙ্গে বলেছি। বামন শুধু নামটি নিয়েছেন, লক্ষণ করেছেন ব্যাপকতর। দণ্ডীর 'বস্তূপমা' নাম বামন গ্রহণ করতে পারেন নাই, কারণ তিনি দেখেছেন যে শুধু সাধারণ ধর্ম্ম নয়, তুলনাবাচক শব্দ অথবা তুলনাবাচক শব্দ আর সাধারণ ধর্ম্ম দুইই লুপ্ত থেকে উপমা অলঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর দণ্ডীর ধর্ম্মোপমা বস্তূপমা পারিভাষিক নামরূপে উত্তরকালের অলঙ্কারশাস্ত্রে চলে নাই, চলেছে অষ্টম শতাব্দীর বামন-প্রদত্ত নাম পূর্ণোপমা লুপ্তোপমা। যে ধর্ম্মোপমা বস্তূপমা আচার্য্য দণ্ডীর সঙ্গে সঙ্গেই অলঙ্কাররাজ্য থেকে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হ'য়ে গেল, নবম শতাব্দীর অর্থাৎ দণ্ডীর তিন শতাব্দী পরে কেউ অগ্নি-পুরাণের পৃষ্ঠায় তাদেরই ছন্দে গেঁথে বসিয়ে দিলে, এ কল্পনা অস্বাভাবিক। অগ্নিপুরাণ প্রক্ষেপমুক্ত নয় ; তাই ব'লে একথাও স্বীকার করতে পারি না যে সমগ্র কাব্যশাস্ত্রাংশটিই নবম শতাব্দীতে বা তার কিছু পরে অগ্নিপুরাণে যোজিত হয়েছে। অগ্নিপুরাণের রচনাকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তখনই কাব্যশাস্ত্রাংশ বীজরূপে ছিল তার অঙ্গীভূত।

ধ্বন্যালোকের (৩।৪২) বৃত্তিতে আনন্দবর্দ্ধনকর্ত্তৃক উদ্ধৃত—

> "অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
>
> যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে ॥
>
> শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।…"

এই অপূর্ব্ব চিরন্তনকবিস্বরূপপরিচয়টিকে বহু পাঠক জানেন আনন্দবর্দ্ধনের রচনা ব'লে; **কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি অগ্নিপুরাণের (৩৪৫।১০-১১) শ্লোক।** অধ্যাপক কাণে মশায় বোধ হয় আনন্দবর্দ্ধনের সম্মানহানির আশঙ্কায় অগ্নিপুরাণের অলঙ্কারাংশটিকে নবম শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলেছেন—আনন্দবর্দ্ধন নবম শতাব্দীর আলঙ্কারিক। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে শ্লোকদুটিতে 'ধ্বনি'র কথা নাই, শুধু রসের কথা। রসহীন রূপসর্ব্বস্ব কৃত্রিম কাব্যের নাম 'চিত্র'কাব্য আর সত্যকার কাব্য হ'ল রসাত্মক, যার সৃষ্টি-ব্যাপারে আপন মনের স্বাভাবিক প্রবণতার ('রুচি'র) অনুগত রসের যথাযোগ্য রূপদানই কবির একমাত্র কাজ—এইটুকু বলার পর আনন্দবর্দ্ধন স্বমতের পরিপোষক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন ("তথা চ ইদম্ উচ্যতে—অপারে কাব্যসংসারে" ইত্যাদি)।

আচার্য্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার'—সপ্তম শতাব্দী ঃ

ভামহ বলছেন, '(i) রূপকাদি অলঙ্কার অন্যের দ্বারা বহুভাবে বর্ণিত হয়েছে; প্রেয়সীর মুখ স্বভাবকান্ত হ'লেও বিনা অলঙ্কারে তার সৌন্দর্য্য ফোটে না॥ (ii) কেউ কেউ আবার রূপক ইত্যাদিকে বলেন বাহ্য; সত্যকার অলঙ্কৃতি হ'ল সুপ্রযুক্ত নামপদ আর ক্রিয়াপদ, যাকে বলে সৌশব্দ্য॥ (iii) আমার কিন্তু শব্দ আর অভিধেয় (বাচ্য অর্থ)-ভেদে দুরকম অলঙ্কার অভিপ্রেত॥'—

(i) "রূপকাদিরলঙ্কারস্তস্যান্যৈর্বহুধোদিতঃ।
ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্॥

(এই সূত্রে স্মরণীয়—"অর্থালঙ্কাররহিতা বিধবেব সরস্বতী" **অগ্নিপুরাণের** এই সুন্দর উক্তিটি।)

(ii) রূপকাদিমলঙ্কারং বাহ্যমাচক্ষতে পরে।
সুপাং তিঙাং চ ব্যুৎপত্তিং বাচাং বাঞ্ছন্ত্যলঙ্কৃতিম্।
তদেতদাহুঃ সৌশব্দ্যং নার্থব্যুৎপত্তিরীদৃশী॥

(iii) শব্দাভিধেয়ালঙ্কারভেদাদিষ্টং দ্বয়ং তু নঃ॥"

ভামহের কাব্যসংজ্ঞা : "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্"।

দণ্ডী ভরতমুনির অনুসরণে মাধুর্য্য প্রসাদ ইত্যাদি দশটি 'গুণে'র আলোচনা করেছেন; ভামহ মাধুর্য্য প্রসাদ ওজঃ এই তিনটির কথা বলেছেন অতি সংক্ষেপে, কিন্তু এদের নাম যে 'গুণ' একথা মোটেই বলেন নাই। দণ্ডী গুণভিত্তিতে বৈদর্ভ আর গৌড়ীয় 'মার্গ' (রীতি)-দ্বয়ের পরিচয় দিয়েছেন;

ভামহ বলেছেন, বৈদর্ভ গৌড়ীয় মূর্খদের দেওয়া নাম, গতানুগতিকতার ফল ("গতানুগতিকন্যায়াৎ নানাখ্যেয়মমেধসাম্"—কাব্যালঙ্কার ১।৩২)। দণ্ডী বললেন, 'হেতু' 'সূক্ষ্ম' আর 'লেশ' উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ("হেতুশ্চ সূক্ষ্মলেশৌ চ বাচাম্ উত্তমভূষণম্"—২।২৩৫); ভামহ বললেন, ওগুলো অলঙ্কারই নয় ("হেতুশ্চ সূক্ষ্মো লেশোঽথ নালঙ্কারতয়া মতঃ"—২।৮৬)। ভামহের অষ্টমশতাব্দীয় ব্যাখ্যাকার, সংশোধক ও সংস্কারক উদ্ভট ভামহকে মেনে নিয়ে হেতুসূক্ষ্মলেশ-সম্বন্ধে নীরব রইলেন; অথচ ওই শতাব্দীরই বামন **'ব্যাজোক্তি'** নাম দিয়ে দণ্ডীর **'লেশ'** অলঙ্কারকে স্বীকার করলেন (কাব্যালঙ্কারসূত্র ৪।৩।২৫)। একাদশ শতাব্দীর মম্মটভট্ট, দ্বাদশের রুয্যক দণ্ডিকৃত সংজ্ঞার ভাষাটি পর্য্যন্ত নিলেন—"নির্ভিন্নবস্তুরূপনিগূহনম্" (দণ্ডী), "উদ্ভিন্নবস্তুরূপনিগূহনম্" (মম্মট), "উদ্ভিন্নবস্তুনিগূহনম্" (রুয্যক) আর 'গূহন' কথাটির প্রতিশব্দ 'গোপন' বসিয়ে নিলেন চতুর্দ্দশের বিশ্বনাথ কবিরাজ—"গোপনম্ উদ্ভিন্নস্যাপি বস্তুনঃ"; এঁরা সকলেই বামনের অনুসরণে 'লেশ' না ব'লে বলেছেন ব্যাজোক্তি। ষোড়শ শতাব্দীর অপ্পয়দীক্ষিত 'লেশ' নাম বজায় রেখে "দণ্ডী অত্র উদাজহার" ব'লে দণ্ডিদত্ত উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে তার ব্যাখ্যা করেছেন। দণ্ডীর 'সূক্ষ্ম' অলঙ্কার বামন ছাড়া উত্তরকালের সকল আলঙ্কারিকই গ্রহণ করেছেন, উদাহরণও বাদ যায় নাই (ভাষা একটু পরিবর্ত্তিত হয়েছে মাত্র)। দণ্ডীর 'হেতু' অলঙ্কার উত্তরকালে 'কাব্যলিঙ্গ' হয়েছে। 'অতিশয়োক্তি' অলঙ্কারসম্বন্ধে দণ্ডী বলেছেন, "লোকসীমাতিবর্ত্তিনী" "অলঙ্কারোত্তমা" "অলঙ্কারান্তরাণাম্ অপি একং পরায়ণম্" (সকল অলঙ্কারেরই এক পরমাশ্রয়); ভামহ এরই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন, "বচো লোকাতিক্রান্তগোচরম্" "সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিঃ—কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা" (অতিশয়োক্তিই সর্ব্বালঙ্কার···এ ছাড়া আর অলঙ্কার কি আছে?)।

যে-কোনো শাস্ত্রে প্রাথমিক অবস্থায় বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা এবং তাত্ত্বিক জটিলতা সম্ভবপর নয়। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' এই ব্যাপকতা জটিলতা হ'তে অনেকটা মুক্ত; ভামহের 'কাব্যালঙ্কার'-এ এর প্রাচুর্য্য। এও একটা কারণ যাতে দণ্ডীকে ভামহের পূর্ব্ববর্ত্তী বলতে হয়। এ ছাড়া, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি-রচিত—'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের "দূষণানি ন্যূনতাদ্যুক্তিঃ" ভামহের কাব্যালঙ্কারে ("দূষণং ন্যূনতাদ্যুক্তির্ন্যূনং হেত্বাদিনাঽথ চ") দেখে জার্ম্মানির মনীষী অধ্যাপক জাকোবি (Jacobi) ভামহকে মধ্যসপ্তম শতাব্দীর আলঙ্কারিক ব'লে স্থির করেছেন। রুদ্রটকৃত 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের টীকায়

নমিসাধু বলেছেন, "**দণ্ডি-মেধাবিরুদ্র-ভামহা**দিকৃতানি সন্তি এব অলঙ্কার-শাস্ত্রাণি"—স্থূলাক্ষর অংশে নামগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য কালক্রমিক ব'লেই মনে হয়। এই মেধাবীর কোনো বই আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। ভামহ "মেধাবিনা উদিতাঃ" ইত্যাদি ব'লে তাঁর মতামতের কথা বলায় মেধাবী যে ভামহের পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিক তা বোঝা যায়। এই মেধাবী যে রাজশেখর-উক্ত জন্মান্ধ কবি মেধাবী, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

আচার্য্য বামন ও উদ্ভট—অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হ'তে নবমের প্রথম ঃ

কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন বামন এবং উদ্ভট ছিলেন তাঁর রাজসভার সভাপতি। জয়াপীড়ের রাজত্বকাল ৭৭৯—৮১৩ খৃষ্টাব্দ। উদ্ভটের প্রাত্যহিক বেতন ছিল নাকি একলক্ষ দীনার (স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ) ঃ

"বিদ্বান্ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ।
ভট্টোঽভূৎ **উদ্ভট**স্তস্য ভূমিভর্ত্তুঃ **সভাপতিঃ** ॥"—রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৫
"**মনোরথঃ** শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়ঃ তস্য, **বামনা**দ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ ॥"—ঐ ৪।৪৯৭

শ্লোকদুটি উদ্ধৃত না করলেও চলত ; কিন্তু উদ্ধৃত করলাম নিজের গরজে—বামন-উদ্ভটের খাতিরে নয়, আমার লক্ষ্য **মনোরথ** ; একটু পরেই মনোরথের কথা আমাকে বলতে হবে।

বামন ঃ আচার্য্য বামনই প্রথম সূত্রাকারে অলঙ্কারশাস্ত্র রচনা করেন এবং নিজেই সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ('বৃত্তি') ক'রে সূত্রার্থ পরিস্ফুট করেন। এই কারণে তাঁর গ্রন্থের নাম 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'। তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান্ দুটি সূত্র ঃ "**কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ**" (১।১।১) আর "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" (১।২।৬)। অতুল গুপ্ত মশায় তাঁর **'কাব্য-জিজ্ঞাসা'**-য় 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ' সূত্রটির ভুল ব্যাখ্যা ক'রে আচার্য্য বামনকে আধুনিক অসংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত সমাজের কাছে হেয় ক'রে তুলেছেন—বহু বৎসর ধ'রে সাহিত্যতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের মধ্যে চ'লে আসায় এই গুরুতর ভ্রান্তি সত্যের রূপে বহুল প্রচার লাভ করেছে। অতুলবাবু লিখেছেন, "শব্দকে অলঙ্কারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায় ; অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলঙ্কারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয় সে এই অলঙ্কারের জন্য—'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'—(বামন)। এ মতকে

বালকোচিত ব'লে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্র"। কিন্তু সত্য এর বিপরীত। "কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ"-এর অলঙ্কারকে অনুপ্রাস উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা ব'লে পাছে কেউ ভুল করে এই আশঙ্কায় বামন এর অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূত্রে জানিয়ে দিলেন "**সৌন্দর্য্যম্** অলঙ্কারঃ" (১।১।২)। এ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার জন্য কবিকে চলতে হয় দোষ-পরিহার, গুণ-গ্রহণ এবং (অনুপ্রাস উপমাদি) অলঙ্কার-গ্রহণ এই ত্রয়ীর পথ ধ'রে ("স খলু অলঙ্কারঃ দোষহানাৎ গুণালঙ্কারাদানাৎ চ সম্পাদ্যঃ কবেঃ"—১।১।৩ বামনকৃত বৃত্তি)। ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম: **অলঙ্কার (সৌন্দর্য্য) = অশ্লীলত্বাদি দোষ-বর্জ্জন + মাধুর্য্যাদি গুণ-যোগ + অনুপ্রাস-উপমাদি-যোগ**। অন্যভাবের দৃষ্টিতে, 'কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ'-এর **অলঙ্কার** Beauty এবং **উপমাদি** হ'ল অন্যতম Beautifying Instrument ("করণব্যুৎপত্ত্যা"—বামন)। যতটুকু দেখলাম তাতে মনে হ'তে পারে যে বামনের মতে উপমাদি অলঙ্কার কাব্যে থাকতেই হবে। কিন্তু এমনতর মনে হওয়ার পথই রাখেন নাই তিনি; বলেছেন, কাব্যের নিত্যধর্ম্ম হচ্ছে 'গুণ' (৩।১।৩), অলঙ্কার অনিত্য। **"রীতিরাত্মা কাব্যস্য"** (১।২।৬)—কাব্যের আত্মা রীতি। রীতি মানে "বিশিষ্টা পদরচনা" (১।২।৭)। পদরচনার বৈশিষ্ট্য কোথায়? মাধুর্য্যাদি 'গুণে'। যার নাম রীতি, সেই পদরচনার আত্মা হ'ল গুণ—"বিশেষো গুণাত্মা" (১।২।৮)। সহজ কথায়—কাব্যের আত্মা রীতি, রীতিব আত্মা গুণ; অতএব প্রকারান্তরে কাব্যের আত্মা গুণ অর্থাৎ রীত্যাত্মক কাব্য গুণময়—গুণেই তার শোভা। উপমাদি পারিভাষিক তথাকথিত অলঙ্কার এই শোভা বাড়িয়ে দেয় মাত্র। এই কারণে কাব্যে গুণ নিত্য, উপমাদি অনিত্য। **যেখানে গুণ নাই, উপমাদি অলঙ্কার আছে, সেখানে কাব্যই নাই। একা পারিভাষিক অনুপ্রাস উপমাদি অলঙ্কারের কাব্যসৃষ্টির ক্ষমতাও নাই অধিকারও নাই।** একটি চমৎকার কবিতার সাহায্যে বামন এই তত্ত্বটি বুঝিয়েছেন। তার সারার্থ এই: যুবতীর রূপলাবণ্যই আস্বাদন করেন রসিক; বাছাই-করা দুচারখানা অলঙ্কারের রচনায় সে রূপ আরও উপাদেয় হয়। কিন্তু রূপলাবণ্য যখন খ'সে পড়ে, তখন লোকের লোচনরোচন নানা অলঙ্কার অঙ্গে চড়ালেও অঙ্গনাটির পানে কেউ ফিরেও চায় না। বলা বাহুল্য, তরুণীর রূপলাবণ্য কাব্যের প্রসাদ-মাধুর্য্যাদি গুণ; তার অলঙ্কার কাব্যের অনুপ্রাস উপমা ইত্যাদি।

এই হ'ল 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ' সূত্ররশ্মির সত্যালোকে বামনদর্শন।

আর একটা কথা। অনুপ্রাস উপমা রূপক ইত্যাদির আলোচনা থাকার জন্যই "কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম অলঙ্কারশাস্ত্র" হয় নাই। সাধারণ-ভাবে সর্ব্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য্যের অর্থাৎ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন অলঙ্কারের তত্ত্বকথা আলোচিত হওয়ায় কাব্যজিজ্ঞাসাশাস্ত্রের নাম হয়েছে অলঙ্কারশাস্ত্র। বামনের "সৌন্দর্য্যম্ অলঙ্কারঃ" সূত্রটির 'কামধেনু'-নামক ব্যাখ্যায় গোপেন্দ্র ত্রিপুরহর-ভূপাল বলেছেন, এই যে সৌন্দর্য্যার্থক অলঙ্কার, যা কাব্যকে গ্রাহ্য অর্থাৎ উপাদেয় ক'রে তোলে, এরই স্বরূপনির্ণয় আর বৈচিত্র্যব্যাখ্যান কাব্য-শাস্ত্রে করা হয় ব'লে কাব্যশাস্ত্রও অলঙ্কারশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—("যোঽয়মলঙ্কারঃ কাব্যগ্রহণহেতুত্বেন উপন্যস্যতে তদ্‌ব্যুৎপাদকত্বাৎ কাব্যশাস্ত্র-মপি অলঙ্কারনাম্না ব্যপদিশ্যতে ইতি শাস্ত্রস্য অলঙ্কারত্বেন প্রসিদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা")।

'কাব্যজিজ্ঞাসা'-র বিরূপ সমালোচনা করতে আমি দুঃখ অনুভব করেছি, কারণ অতুলবাবুর কাছে বাঙালীর ঋণ রয়েছে। 'সবুজপত্রে' ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে 'কাব্যজিজ্ঞাসা' যখন প্রকাশিত হয়, প্রাচীন ভারতের 'ধ্বনিবাদ' পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত অসংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী সাহিত্যরসিকদের চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে জয় ক'রে নেয়। অতুলবাবু খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু প্রথম প্রয়াসে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক; তার সংশোধন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র তত্ত্বগত, তথ্যগত, উদাহরণগত, অনুবাদগত ত্রুটিগুলি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে সংশোধিত হয় নাই। পরিতাপের বিষয়।

বামন উপমাকে প্রধান অলঙ্কার ধ'রে তারই উপবিভাগরূপে অন্যান্য অর্থালঙ্কার বিচার করেছেন। তাঁর কল্পিত **বক্রোক্তি**-নামক অর্থালঙ্কারটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ (বর্ত্তমান গ্রন্থের 'Figure, বক্রোক্তি ও অলঙ্কার' দ্রষ্টব্য)। কাশ্মীরবাসী হ'য়েও বামন আপন মৌলিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য দণ্ডীর পদাঙ্ক-অনুসরণের বহু নিদর্শন রেখেছেন তাঁর গ্রন্থে। দণ্ডীর প্রসাদ ওজঃ প্রভৃতি দশ গুণকে ইনি করেছেন মূর্দ্ধাভিষিক্ত। ভামহকে উপেক্ষা ক'রে বামন দণ্ডীর বৈদর্ভী রীতি এবং গৌড়ী রীতিকে স্বীকার করেছেন, বৈদর্ভীর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছেন ("সমগ্রগুণা বৈদর্ভী"—১।২।১১) এবং এদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তৃতীয় রীতি পাঞ্চালী। রীতি-আলোচনার শেষে বলেছেন—এই তিন রীতিতে কাব্যের প্রতিষ্ঠা, যেমন রেখায় প্রতিষ্ঠা চিত্রের ("এতাসু তিসৃষু রীতিষু, রেখাস্বিব চিত্রং, কাব্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি"—১।২।১৩ বৃত্তি)। "রীতিরাত্মা কাব্যস্য" ভামহমতের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং কাব্যশাস্ত্রে বামনের নূতন তত্ত্ব।

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে রীতিবাদ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার, গভীর গবেষণার বিষয়; ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে উন্নাসিক হ'য়ে ওঠা নির্বুদ্ধিতা।

উদ্ভট: ভামহের 'কাব্যালঙ্কার'-এর প্রথম ব্যাখ্যাকার ভট্ট-উদ্ভট; ব্যাখ্যার নাম 'ভামহবিবরণ'। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের নাম করেছেন প্রতীহারেন্দুরাজ—"ভামহবিবরণে ভট্টোদ্ভটেন···ব্যাখ্যাতঃ"। উদ্ভট-রচিত একখানি কাব্য ছিল, নাম 'কুমারসম্ভব'। দুখানি গ্রন্থই আজও অনাবিষ্কৃত। তাঁর যে গ্রন্থখানি ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে জার্মান মনীষী ডক্টর বুহ্লার (Dr. G. Buhler)-কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং প্রকাশিত হয়, তার নাম 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ'। এখানি ভামহরচিত কাব্যালঙ্কারের অলঙ্কার অংশ; উদ্ভট এতে নূতন অনেক তত্ত্ব (স্বকৃত) যোগ দিয়েছেন, সংশোধনও করেছেন অনেক। বইখানিতে উদাহরণ আছে পঁচানব্বইটি; তার মধ্যে চুরানব্বইটি উদ্ভট নিয়েছেন স্বরচিত 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে। বলা বাহুল্য, কাব্যখানি মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুকরণ; উদাহরণগুলি থেকে দেখা গেল এদের কাব্যমূল্য সামান্যই। উদ্ভটের এই অলঙ্কারগ্রন্থখানির অশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেছেন অভিনবগুপ্ত-গুরু প্রতীহারেন্দুরাজ। একটু আগে যে উদ্ধৃতিটুকু দিয়েছি, তা এই টীকা থেকে নেওয়া। ভট্ট-উদ্ভট আলঙ্কারিকরূপে বহুমানিত ব্যক্তি। আনন্দবর্দ্ধন, অভিনবগুপ্ত, রুয্যক প্রভৃতি আচার্য্যগণ উদ্ভটের এমন সব অভিমত শ্রদ্ধাসহকারে আলোচনা করেছেন, যার অস্তিত্ব তাঁর কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহে নাই। দুঃখের বিষয় এই সব অভিমতের উৎস-গ্রন্থের নাম কোনো আচার্য্যই করেন নাই। মনে করা অসঙ্গত নয় যে এই সব অভিমত উদ্ভট লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর আজও অনাবিষ্কৃত ভামহবিবরণে।

আচার্য্য উদ্ভট কাব্যতত্ত্বে রসবাদী ছিলেন ব'লেই বিশ্বাস। উদ্ভটের কথা একটু পরেই আবার উঠবে। এখন প্রসঙ্গতঃ বলতে হচ্ছে

ধ্বন্যালোকের কথা:

ধ্বন্যালোক ছন্দে রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র; পদ্যসংখ্যা সবশুদ্ধ ১১৬। **রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। আনন্দবর্দ্ধন এই গ্রন্থিকার 'বৃত্তি' লিখেছেন** এবং **অভিনবগুপ্ত লিখেছেন এই 'বৃত্তি'-র ব্যাখ্যা, নাম 'লোচন'।** মনে হয় মূল বইখানির নাম ধ্বনিকারিকা, বৃত্তির নাম 'আলোক', টীকার নাম 'লোচন'। মনে অনেক কিছুই হয়; কিন্তু থাক সে-সব। **প্রশ্ন: মূল পদ্যে-লেখা বইখানি রচিত হয়েছিল কখন?**

কাশ্মীরের অধিপতি অবন্তিবর্মার রাজত্বকাল ৮৫৭—৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। এই সময় কবি ব'লে প্রসিদ্ধ ছিলেন আনন্দবর্দ্ধন—

"মুক্তাকণঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্দ্ধনঃ।
প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽবন্তিবর্ম্মণঃ॥"

—রাজতরঙ্গিণী ৫।৩৪

('প্রথাম্'=প্রসিদ্ধি; 'অগাৎ'=পেয়েছিলেন: √ই+লুঙ্ 'দ্')

নবম শতাব্দীর শেষের দিকেই আনন্দবর্দ্ধন যে ধ্বনিকারিকার বৃত্তি রচনা করেছিলেন তার প্রমাণ এই যে বৃত্তির মধ্যে তিনি স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ থেকে অনেক কবিতা উদ্ধৃত করেছেন।

ধ্বনিবাদের মূল গ্রন্থখানির প্রথম শ্লোকটির প্রচুর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। গ্রন্থকার বলছেন, (১) একদল ধ্বনির অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই ("তস্য অভাবং জগদুঃ অপরে"); (২) একদলের মতে ধ্বনি লক্ষ্যার্থমাত্র ("ভাক্তম্ আহুঃ তম অন্যে"); (৩) অন্য একদলের মতে ধ্বনি বাক্যের অধিকারসীমার বাইরে স্থিত বাক্যেরই একটা তত্ত্বমাত্র ("কেচিৎ বাচাং স্থিতম্ অবিষয়ে তত্ত্বম্ উচুঃ তদীয়ম্")।

লক্ষণীয় যে গ্রন্থকার প্রথম অর্থাৎ ধ্বনির অভাববাদী দলটির সম্পর্কে প্রয়োগ করছেন পরোক্ষ অতীতকালের ক্রিয়াপদ ("জগদুঃ"= √গদ্+লিট্ 'উস্'—'গদ্' ধাতুর মানে 'বলা')। টীকাকার অভিনবগুপ্ত মশায় গভীর পাণ্ডিত্যসত্ত্বেও পরমতসম্বন্ধে কিছু উগ্রভাবে অসহিষ্ণু। ধ্বনির অস্তিত্ব যাঁরা স্বীকার করলেন না, গুপ্তমশায় প্রথমেই তাঁদের সম্বন্ধে ব'লে বসলেন, 'সীমাহীন মূর্খতা ওই অভাববাদীগুলোর'—("অপারং মৌর্খ্যম্ অভাববাদিনাম্")। পরক্ষণেই বললেন, 'ওরা কি বলেছে না বলেছে তা অবশ্য আমাদের শোনা নাই, তাই কি বলা ওদের পক্ষে সম্ভব সেই সব কল্পনা ক'রে নিয়ে তার দোষ দেখিয়ে দেব; এই কারণেই ক্রিয়াপদটা পরোক্ষ অতীত করা হয়েছে' ("ন চ অস্মাভিঃ অভাববাদিনাং বিকল্পাঃ শ্রুতাঃ, কিন্তু সম্ভাব্য দূষয়িষ্যন্তে, অতঃ পরোক্ষত্বম্")। অভিনবগুপ্তের এই ব্যাখ্যাটি শুধু দুর্ব্বল নয়, **ইতিহাসবিরোধী**ও বটে। এই শ্লোকেরই বৃত্তিতে একটু পরেই আনন্দবর্দ্ধন অভাববাদীদের একজনের বিদ্রূপাত্মক একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন।—

"যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃ-প্রহ্লাদি সালঙ্কৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসন্ জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥"

অভিনবগুপ্ত এর ব্যাখ্যা করেছেন আপন খেয়ালখুসিমতো। সে পথে না গিয়ে আমি এর, যাকে বলে 'আক্ষরিক' **অনুবাদ**, তাই ক'রে দিলাম—

'রসময় সালঙ্কার বস্তু কিছু নাহি যার মাঝে,
নাহি শুদ্ধা পদাবলী, নাহি বক্র বাচন-ভঙ্গিমা,
ধ্বনিবাক্য বলি তার জড়বুদ্ধি করে স্তুতিবাদ
প্রীতিভরে গদগদ ; সুমতি শুধায় যদি তারে,
'ধ্বনি কারে বলে, বন্ধু ?' জানি না সে কি দিবে উত্তর !'

—শ. চ.

এই কবিতাটির লেখকসম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত 'লোচন'টীকায় বলছেন, এটি রচিত হয়েছে গ্রন্থকারের সমকালীন **মনোরথ**-নামা কবির দ্বারা ("গ্রন্থকৃৎ-সমান-কালভাবিনা মনোরথনাম্না কবিনা")। এখন 'গ্রন্থকার' বলতে আমরা কাকে বুঝব ? মূল কারিকারচয়িতাকে ? না, 'বৃত্তি'-রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধনকে ? কারিকাও গ্রন্থ, বৃত্তিও গ্রন্থ—বাক্যপরম্পরার গ্রন্থনফল দুটিই। প্রথম কারিকার 'বৃত্তি'র শেষে আনন্দবর্দ্ধন বলছেন, 'সহৃদয়গণের মনে আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক' ("সহৃদয়ানাম্ **আনন্দঃ** মনসি লভতাং প্রতিষ্ঠাম্)। এই 'আনন্দ' কথাটিকে শ্লিষ্ট ক'রে (শব্দশ্লেষ অলঙ্কার ক'রে) অভিনবগুপ্ত বলছেন, **'আনন্দ'** =(১) **রসধ্বনি**, (২) **গ্রন্থকারের নাম** (**আনন্দ**বর্দ্ধন)। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন যে কারিকারচয়িতা নন, বৃত্তিরচয়িতা মাত্র একথা স্পষ্ট বোঝা যায় ধ্বন্যালোকের তৃতীয় উদ্দ্যোতের তৃতীয়-চতুর্থ কারিকার ওই অভিনবগুপ্তকৃত ব্যাখ্যা থেকেই—'**কারিকাকার** আগে বলেছেন ব্যতিরেক, পরে অন্বয় ; **কিন্তু বৃত্তিকার** আগে বলেছেন অন্বয়, পরে ব্যতিরেক' ("**কারিকাকারেণ** পূর্ব্বং ব্যতিরেকঃ উক্তঃ। **বৃত্তিকারেণ তু** অন্বয়পূর্ব্বকঃ ব্যতিরেকঃ…")। এইভাবের কথা রয়েছে ধ্বন্যালোকের আরও সাত-আট জায়গায়। **মনোরথ** আনন্দবর্দ্ধনের সমকালীন কবি নন ; কারণ, একটু আগে বামন-উদ্ভট-প্রসঙ্গে যে শ্লোকটি 'রাজতরঙ্গিণী' থেকে উদ্ধৃত করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে **মনোরথ**, শঙ্খদত্ত, চটক আর সন্ধিমান্ **কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সভাকবি** ছিলেন : 'বভূবুঃ **কবয়ঃ** তস্য'—'তস্য' মানে জয়াপীড়স্য। জয়াপীড়ের রাজত্বকাল ৭৭৯—৮১৩ খৃষ্টাব্দ। এর চুয়াল্লিশ বৎসর পরে (৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) অবন্তিবর্ম্মা কাশ্মীরের রাজা হন এবং রাজত্ব করেন ৮৮৪ পর্য্যন্ত ; এই সময়ে খ্যাতি লাভ করেন কবি আনন্দবর্দ্ধন ('**কবিঃ** আনন্দবর্দ্ধনঃ **প্রথাম্ অগাৎ** সাম্রাজ্যে অবন্তিবর্ম্মণঃ')। জয়াপীড়ের সভাকবি **মনোরথ**, মন্ত্রী **বামন** আর সভাপতি **উদ্ভট**। **এই**

মনোরথ কবি ধ্বনিবাদবিরোধী এবং আনন্দবর্দ্ধনকর্ত্তৃক উদ্ধৃত "যস্মিন্নস্তি ন বস্তু" ইত্যাদি কবিতাটির রচয়িতা।

এখন প্রশ্ন—ধ্বনিবাদবিরোধী মনোরথ কবির এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল কখন? মূল ধ্বনিকারিকায় যখন ধ্বনির অভাববাদীদের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং আনন্দবর্দ্ধন যখন ওঁদেরই একজনের কবিতা প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করছেন, তখন এ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হবে না যে মনোরথ মূল ধ্বনিকারিকা-রচনার আগেই লিখেছিলেন তাঁর এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি। আজ ধ্বন্যালোক বলতে আমরা বুঝি পদ্যাত্মক ধ্বনিগ্রন্থ+আনন্দবর্দ্ধনের 'বৃত্তি'+অভিনবগুপ্তের 'লোচন' অর্থাৎ ধ্বনিবাদের শৈশব, কৈশোর আর পূর্ণযৌবন। এই শৈশবের আগে আছে জন্মপর্ব্ব। চারটি উদ্দ্যোতে একশো ষোলোটি পদ্যে বিধিবদ্ধ গ্রন্থাকার লাভ করার আগে কিছুদিন (খুব বেশী দিন নয়) চলছিল জল্পনা-কল্পনা, আলাপ-আলোচনা এবং প্রচারণা। লাভ করল সুধীসমাজের কিয়দংশের অনুমোদন, বৃহদংশের অননুমোদন। এই দ্বিতীয় অংশের একদল হ'লেন বিরোধিতায় মুখর, একদল রইলেন নীরব। মুখরদের প্রতিনিধিস্থানীয় হ'লেন কবি মনোরথ, নীরব রইলেন আচার্য্য বামন, ভট্ট-উদ্ভট। রাজা জয়াপীড়ের যিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সেই সুপ্রসিদ্ধ 'কুট্টনীমতম্'-কাব্যের কবি দামোদরগুপ্তও* তাঁর কাব্যে ছন্দতত্ত্ব অলঙ্কারতত্ত্ব বিশেষতঃ শৃঙ্গার-রসতত্ত্ব, 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় উপলক্ষ ক'রে সবিস্তার নাট্যতত্ত্ব ইত্যাদি-সম্পর্কে বহু সুন্দর কথা বলা সত্ত্বেও 'ধ্বনি'-র নামগন্ধ করলেন না। বামন 'অর্থগুণ' অধিকারে (৩।২।৯-১০) অর্থ-সম্পর্কে বললেন 'ব্যক্ত' আর 'সূক্ষ্ম'-ভেদে অর্থ দুরকম এবং 'সূক্ষ্ম' আবার দ্বিধাবিভক্ত—**ভাব্য** আর **বাসনীয়**। **বাসনীয়** মানে একাগ্রতাপ্রকর্ষ**গম্য**। বাসনীয় অর্থের যে উদাহরণটি ইনি দিলেন সেটিতে প্রকৃতপক্ষে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার (পূর্ব্বরাগ)-রসধ্বনি। ধ্বনি তো দূরের কথা, 'ব্যঙ্গ্য' কথাটি পর্য্যন্ত বামন প্রয়োগ করলেন না, যদিও তাঁর 'গম্য'=suggested=ব্যঙ্গ্য; এর একমাত্র কারণ এই যে কাব্যতত্ত্বে ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে এঁরা স্বীকৃতি দেন নাই।

এইখানে আরও **দুইএকটা বিশেষ প্রসঙ্গ** উত্থাপন করতে চাই, যাদের আমি অত্যন্ত মূল্যবান্ ব'লে মনে করেছি।

(i) ধ্বনিকারিকা ১।১৩-র বৃত্তিতে আনন্দবর্দ্ধন বলছেন—'পর্য্যায়োক্ত'-তে

* "স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্।
কবিং কবিং বলিরিব ধুর্য্যাধিসচিবং ব্যধাৎ॥"—রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৬
'সঃ'—রাজা জয়াপীড়।

ব্যঙ্গ্যই যদি প্রধান হয়, বলতেই হবে যে ধ্বনির মধ্যেই তার অন্তর্ভাব। পর্য্যায়োক্তের ভামহদত্ত উদাহরণের মতন উদাহরণে ব্যঙ্গ্য-প্রাধান্য একেবারেই নাই। এই উক্তিটির ব্যাখ্যায় **অভিনবগুপ্ত** বলছেন—ভামহের উদাহরণ অগ্রাহ্য ক'রে যদি 'ভম ধম্মিঅ' ইত্যাদি উদাহরণ নেওয়া হয়, তাহ'লে সে তো আমাদেরই শিষ্যত্ব। **কিন্তু গুরুর চরণতলে ব'সে গুরুর মুখ হ'তে শাস্ত্রার্থ গ্রহণ না ক'রে অপশ্রবণের দ্বারা আত্মসংস্কার বর্ব্বরতার পরিচায়ক। শাস্ত্রে আছে, গুরু আর শাস্ত্র দুয়েরই প্রতি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা নিয়ে শিষ্য হয় যে, সে নরকে যায়** ("কেবলং তু নয়ম্ অনবলম্ব্য অপশ্রবণেন আত্মসংস্কারঃ ইতি অনার্য্যচেষ্টিতম্। যদাহুঃ ঐতিহাসিকাঃ, 'অবজ্ঞয়া অপি অবচ্ছাদ্য শৃণ্বন্ নরকম্ ঋচ্ছতি'।"—সন্ধি ভেঙে দিলাম)।

কার শির লক্ষ্য ক'রে উদ্যত হয়েছে আচার্য্য অভিনবের এই খড়্গ? দেখা যাচ্ছে যে আচার্য্যের লক্ষ্য এমন কেউ, যিনি ধ্বনিবাদীদের দলভুক্ত হ'য়েও মাঝে মাঝে ধ্বনিবাদের বা তার আনুষঙ্গিক বিষয়বিশেষের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন।

(ii) ধ্বনিকারিকার তৃতীয় উদ্দ্যোতের প্রথমেই ভূমিকারূপে আনন্দবর্দ্ধন বলছেন—ব্যঙ্গ্যমুখে ধ্বনির প্রকারভেদ দেখানোর পর, এখন তা আবার ব্যঞ্জক-মুখে দেখানো হচ্ছে। অভিনবগুপ্ত, এর ব্যাখ্যা ক'রে বলছেন—**'ব্যঙ্গ্যমুখে অর্থাৎ বস্তু-অলঙ্কার-রসমুখে' ব'লে যিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিঃ এই প্রকারভেদতিনটি কারিকাকার করেন নাই, করেছেন বৃত্তিকার** (লক্ষণীয় যে এখানেও মূল কারিকারচয়িতা আর বৃত্তিকার আনন্দবর্দ্ধন বিভিন্ন ব্যক্তি—শ. চ.)……**নিজের পূজ্যজনের যাঁরা সগোত্র তাঁদের সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয়** ("যঃ তু ব্যাচষ্টে—'ব্যঙ্গ্যানাং বস্ত্বলঙ্কাররসানাং মুখেন' ইতি, সঃ এবং প্রষ্টব্যঃ—এতৎ তাবৎ ত্রিভেদত্বং ন কারিকাকারেণ কৃতম্, বৃত্তিকারেণ তু দর্শিতম্।…**অলং নিজপূজ্যজনসগোত্রৈঃ সাকং বিবাদেন।**")।

(iii) আর এক জায়গায় (ধ্বন্যালোক-'লোচন' ৩।৪০) **অভিনবগুপ্ত** বলছেন,—**যিনি তিনটি শ্লোকেই প্রতীয়মানকে রসের অঙ্গ ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনি দেববিগ্রহ বিক্রয় ক'রে তার যাত্রা-উৎসব করেছেন…সগোত্রদের সঙ্গে বিবাদ করা সঙ্গত নয়** ("যঃ তু ত্রিষু অপি শ্লোকেষু প্রতীয়মানস্য এব রসাঙ্গত্বম্ ব্যাচষ্টে স্ম, সঃ দেবং বিক্রীয় তদ্‌যাত্রোৎসবম্ **অকার্ষীৎ।…অলং পূর্ব্ববংশ্যৈঃ সহ বিবাদেন।**")।

অভিনবগুপ্তের প্রথম (i) উক্তিটি একটু উগ্র, দ্বিতীয় তৃতীয় (ii, iii) কিঞ্চিৎ কোমল। **আমার বিশ্বাস তিনটির লক্ষ্য একজন এবং তিনি হচ্ছেন** অভিনবের পূর্ব্বকালীন এবং **ধ্বন্যালোকের (সম্ভবতঃ) প্রথম টীকাকার —তাঁর নাম জানি না,** কিন্তু **তাঁর টীকার নাম** জানি: **'চন্দ্রিকা'। এর উপর কটাক্ষ করেছেন অভিনবগুপ্ত** ধ্বন্যালোকের প্রথম উদ্দ্যোতের ব্যাখ্যার শেষে একটি শ্লোকে—**চন্দ্রিকার সাধ্য কি যে কাব্যালোকের দ্যুতি দেখায়?** চাই লোচন; সেই লোচন দিলাম আমি শ্রীঅভিনবগুপ্ত:

"কিং লোচনৈর্বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াঽপি হি।
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ ॥"

'চন্দ্রিকা'কে রাহুগ্রস্ত ক'রে অভিনবগুপ্ত ভালো করেন নাই। Shelley-র কঠোর সমালোচনা করেছেন স্টপফোর্ড ব্রুক, রবার্ট ব্রাউনিংএর আলোচনায় আছে প্রশস্তির সঙ্গে কটাক্ষ, ব্র্যাডলি মাঝে মাঝে 'but I am not criticising' বলেছেন ঈষৎ criticising-এর পর কিন্তু চলেছেন appreciation-এর পথে। আমরা সবরকমই চাই।

অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণের মতে মূল ধ্বনিকারিকা যিনি রচনা করেছিলেন, তাঁর **নাম 'সহৃদয়'**, যেহেতু 'সহৃদয়' কথাটা আনন্দবর্দ্ধন এবং অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকে অসংখ্যবার প্রয়োগ করেছেন। এ মতটি অমূলক। কারিকাকার স্বয়ং গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বলেছেন, 'ধ্বনির স্বরূপ ব্যাখ্যা করছি সহৃদয়মনের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে'—"তেন ব্রূমঃ **সহৃদয়-মনঃ-প্রীতয়ে** তৎস্বরূপম্"; আপন মনের প্রীতিসাধন নিশ্চয়ই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নয়। কারিকাকার, বৃত্তিকার, লোচনকার তিনজনেই 'সহৃদয়' কথাটির প্রয়োগ করছেন 'মার্জ্জিতরুচি রসজ্ঞ পাঠক' অর্থে—'সহৃদয়-সংবেদ্য' কথাটার ব্যাখ্যায় আনন্দবর্দ্ধন বলছেন "রসজ্ঞতা এব সহৃদয়ত্বম্; তথাবিধৈঃ সহৃদয়ৈঃ সংবেদ্যঃ…" (ধ্বন্যালোক ৩।১৬); অভিনবগুপ্ত তো প্রথমদিকেই ব'লে দিলেন, "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, তে স্বহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ" (ধ্বন্যালোক ১।১)।

কাব্যে রীত্যাত্মবাদ যেমন একা বামনের কীর্ত্তি, বক্রোক্তি-জীবিতবাদ যেমন একা কুন্তকের কীর্ত্তি, তেমনিধারা ধ্বন্যাত্মবাদ কোনো ব্যক্তিবিশেষের কীর্ত্তি নয়—একটা সংসদ্ হ'তে এর জন্ম। কেউ কেউ মনে করেন এই সংসদের নাম ছিল **সহৃদয়**সংসদ্ বা সঙ্ঘ বা সমিতি বা এমনি একটা কিছু এবং কাব্যের রসজ্ঞ বোদ্ধা অর্থে 'সহৃদয়' কথাটা নাকি ঐ সময়েই প্রযুক্ত হয়। সংসদ্ যে

একটা ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ; কিন্তু ওর বিশেষণ ছিল 'সহৃদয়' একথা যদি মেনেও নিই তবু কাব্যের রসজ্ঞ বোদ্ধা অর্থে 'সহৃদয়' কথাটির ওই সময়ে প্রয়োগ হয়, এ মত মানতে পারি না—এই অর্থে 'সহৃদয়' শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীনতর : বামন বৈদর্ভী রীতিপ্রসঙ্গে তাঁর পূর্ব্বকালীন কোনো আচার্য্যের একটি মত উদ্ধৃত করেছেন, যার শেষ চরণটি হ'ল "**সহৃদয়হৃদয়ানাং** রঞ্জকঃ কোঽপি পাকঃ" (কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি ১।২।২১)।

জয়াপীড়ের পর কাশ্মীরের রাজা হন তাঁর পুত্র ললিতাপীড। এই পর্ব্বটিকে তামসপর্ব্ব বলা যেতে পারে—ললিতাপীড় ছিলেন সুরাসক্ত, উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন, অত্যাচারী। এই সময়ে ধ্বনিবাদ কারিকাকারে লিপিবদ্ধ হ'য়ে থাকবে। **'রাজতরঙ্গিণী'তে ধ্বনির কথা নাই।**

ওতপ্রোতভাবে জড়িত ধ্বনির জন্মকথা এবং মনোরথ-প্রসঙ্গ এইখানে শেষ করলাম। **ফিরে আসা যাক আচার্য্য উদ্ভট-প্রসঙ্গে :**

অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে ভট্ট-উদ্ভটের দুটি মূল্যবান্ দান 'দৃষ্টান্ত' আর 'কাব্যহেতু' বা 'কাব্যলিঙ্গ'। কাব্যে অলঙ্কারকে তিনি উচ্চ আসন দিয়েছেন সত্য, কিন্তু এর থেকে কাব্যের স্বরূপসম্বন্ধে তাঁর অভিমত বোঝা যায় না। ধ্বনির নাম তিনি কোথাও করেন নাই। তাঁর এই 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ'-নামক অলঙ্কারগ্রন্থখানির ব্যাখ্যাকার মাঝে মাঝে তাঁর (উদ্ভটের) এমন সব মতের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যার থেকে বেশ বোঝা যায় যে ভাব রস ইত্যাদি সম্বন্ধে উদ্ভট অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছেন—"যৎ উক্তং ভট্টোদ্ভটেন চতূরূপা ভাবাঃ", "যৎ উক্তং ভট্টোদ্ভটেন পঞ্চরূপা রসাঃ" বলেছেন ব্যাখ্যাকার প্রতীহারেন্দুরাজ ; কিন্তু ভাবের চার রূপ বা রসের পাঁচ রূপের কথা উদ্ভট তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ' পুস্তকে কোথাও বলেন নাই। স্বকৃত ব্যাখ্যায় ইন্দুরাজ 'ভাবিক' আর 'কাব্যলিঙ্গ' অলঙ্কারপ্রসঙ্গে "তদাহুঃ" (তাই বলছেন) ব'লে দুটি পদ্য উদ্ধৃত করেছেন। এদের একটির দ্বিতীয় চরণ—

"কথ্যতে তদ্‌রসাদীনাং কাব্যাত্মত্বং ব্যবস্থিতম্"

এবং অপরটি—

"রসোল্লাসী কবেরাত্মা স্বচ্ছে শব্দার্থদর্পণে।
মাধুর্যৌজোগুণপ্রৌঢ়ে প্রতিবিম্ব্য প্রকাশতে ॥"

(কাব্যের আত্মার রূপে ব্যবস্থিত হয়েছে রস ও ভাব, এই কথাই বলা হচ্ছে। কবির রসোল্লাসী আত্মা মাধুর্য্য ও ওজোগুণে'ঋদ্ধ নির্ম্মল শব্দার্থমুকুরে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়।) উদ্ভটের পূর্ব্বকালীন বা উত্তরকালীন অর্থাৎ

দশম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ইন্দুরাজের সময় পর্য্যন্ত কোনো আলঙ্কারিকের গ্রন্থে এই শ্লোক নাই। মনে হয় এদুটি উদ্ভটরচিত এবং ছিল তাঁর আজও অনাবিষ্কৃত 'ভামহবিবরণে'। অভিনবগুপ্ত তাঁর ধ্বন্যালোক'লোচনে' (ধ্ব. ১।১) উদ্ভটের একটি মত উদ্ধৃত করেছেন—"ভট্টোদ্ভটো বভাষে 'শব্দানাম্ অভিধানম্ অভিধাব্যাপারঃ মুখ্যঃ গুণবৃত্তিঃ চ'" (ভট্টোদ্ভট বলেছেন শব্দের অভিধান বা অর্থপ্রকাশনী বৃত্তি দুটি, একটি মুখ্য অভিধাবৃত্তি এবং অপরটি গুণবৃত্তি বা লক্ষণা)। উদ্ভটের এই মতটি অভিনবগুপ্ত যে 'ভামহবিবরণ' থেকে উদ্ধৃত করেছেন একথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

আনন্দবর্দ্ধন—নবম শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধ:

আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন পদ্যে রচিত **মূল 'ধ্বনি'গ্রন্থের লেখক নন**; তিনি **শুধু** এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা অর্থাৎ **'বৃত্তি'-র রচয়িতা**। কবি আনন্দবর্দ্ধনের পরিচিত সৃষ্টি 'বিষমবাণলীলা' আর 'দেবীশতক'। স্বরচিত কাব্য থেকে কবিতা উদ্ধৃত করায় বোঝা যায় ধ্বনিবৃত্তি তাঁর পরিণত জীবনের, হয়তো বা শেষ, রচনা। ৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকালের অন্ত্যসীমা, আনন্দবর্দ্ধনের জীবনের নয়। আমার বিশ্বাস, বৃত্তিরচনার আগে ধ্বনিবাদের উপর বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি শ্লোক তিনি রচনা করেছিলেন; সেই সব শ্লোক 'পরিকর', 'সংগ্রহ' ইত্যাদি নানা নামে এবং কোথাও কোথাও 'অত্র অয়ম্ উচ্যতে' ইত্যাদিভাবে ধ্বনিবৃত্তিতে তিনি উদ্ধৃত করেছেন। এই সব উদ্ধৃতির কোনো আকরগ্রন্থের নাম তিনি করেন নাই ব'লে বা তেমন কোনো গ্রন্থের সন্ধান আজও পাই নাই ব'লেই যে আনন্দবর্দ্ধনের উপর ওদের কর্তৃত্ব আরোপ করছি, তা নয়; আচার্য্য অভিনবগুপ্ত এক জায়গায় এমনি দুটি উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আনন্দবর্দ্ধনকেই ওদের রচয়িতা ব'লে ফেলেছেন ('ধ্বন্যালোক' ৩.৪২-এর 'লোচন' টীকা দ্রষ্টব্য)। আনন্দবর্দ্ধনের সমকালীন খ্যাতিমান্ কাশ্মীরী কবি রত্নাকর ধ্বনিবাদের প্রতিবাদরূপেই যেন 'বক্রোক্তি-পঞ্চাশিকা' কাব্য রচনা করেন। শ্লেষবক্রোক্তির পথে হরপার্ব্বতীর উক্তি-প্রত্যুক্তি 'বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা'র বিষয়বস্তু—আদ্যন্ত দুর্ঘট সভঙ্গ শব্দশ্লেষ, টীকার সাহায্য ছাড়া কার সাধ্য তাতে দন্তস্ফুট করে! দশম শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রসিদ্ধ কালিদাসকাব্যব্যাখ্যাতা কাশ্মীরী শ্রীবল্লভদেব আনন্দবর্দ্ধনের 'দেবীশতক' আর রত্নাকরের 'বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা' দুখানিরই টিপ্পনী রচনা করেন।

রুদ্রট—নবমের চতুর্থ পাদ থেকে দশমের প্রথম দশক :

আচার্য্য রুদ্রটকে আনন্দবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ সমকালীন বলতে পারি। ইনিও কাশ্মীরী। রাজশেখর তাঁর প্রসিদ্ধ 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে রুদ্রটের নামসমেত মত উদ্ধৃত করেছেন—"'কাকুবক্রোক্তির্নাম শব্দালঙ্কারোঽয়ম্' ইতি রুদ্রটঃ" (কাব্যমীমাংসা, সপ্তম অধ্যায়)। 'কাব্যমীমাংসা'র রচনা-কাল ৯৩০-এর কাছাকাছি। পাণ্ডুলিপির যুগে ভারতের এক প্রদেশে রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও দূরবর্ত্তী অন্য প্রদেশে পৌঁছুতে প্রচুর সময় লাগত; সুতরাং **রুদ্রটরচিত 'কাব্যালঙ্কার'**-এর পক্ষে রচনা-কালের দশকদুই পরে রাজশেখরের হাতে পড়া অস্বাভাবিক নয়।

রুদ্রটের 'কাব্যালঙ্কার' ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে নানান দিক্ থেকে মূল্যবান্। ধ্বনিকারিকা বহু পূর্ব্বেই রচিত হয়েছে, আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বনিবৃত্তিও দশক-দুয়েক আগে সমাপ্ত হ'য়ে গেছে, এমন সময় 'কাব্যালঙ্কার'-এর আবির্ভাব; অথচ ধ্বনিবাদ, আনন্দবর্দ্ধন ইত্যাদি সম্পর্কে রুদ্রট একেবারে নীরব। দশম শতাব্দীর শেষ অর্থাৎ অভিনবগুপ্তের 'লোচন'-রচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশ্মীরে ধ্বনিবাদের অবস্থা এইরকমই ছিল। অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোক'লোচনে'র প্রথম উদ্দ্যোতের শেষে আনন্দবর্দ্ধনকৃত ধ্বনিবৃত্তির (অভিনবগুপ্তের ভাষায় 'আলোক' বা 'কাব্যালোক') 'চন্দ্রিকা' নামে যে টীকাটির কথা আভাসে জানিয়েছেন, 'লোচন'-রচনার পর সে টীকা ধ্বনিবাদিসমাজে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে নাই; তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এই অনুক্তনামা টীকাকার কোথাও কোথাও আনন্দবর্দ্ধনের অসঙ্গতি দেখিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন।

রুদ্রটের স্বকীয়তা প্রচুর। দণ্ডীর বৈদর্ভী আর গৌড়ী রীতির সঙ্গে বামন যুক্ত করলেন তৃতীয় রীতি পাঞ্চালী এবং বামনের এই ত্রয়ীর সঙ্গে রুদ্রট আনলেন 'লাটীয়া'। বৈদর্ভীকে ইনিও স্বীকার করলেন শ্রেষ্ঠ ব'লে। কিন্তু রুদ্রটের রীতি দণ্ডি-বামনের মতন গুণভিত্তিক নয়, মুখ্যতঃ সমাসভিত্তিক—দুটি-তিনটি পদের সমাসে পাঞ্চালী, পাঁচ-সাতটির সমাসে লাটীয়া, খুব বেশীসংখ্যক পদের সমাসে গৌড়ী আর "বৃত্তেরসমাসায়া বৈদর্ভী রীতিরেকৈব" (কাব্যালঙ্কার ২।৬) অর্থাৎ সমাসহীনা বৈদর্ভী, উৎকৃষ্ট রীতি বলতে বৈদর্ভীই হ'ল অদ্বিতীয়া—সমাসের দৃষ্টিতে এটি বামনের শুদ্ধা বৈদর্ভীর লক্ষণাক্রান্ত। 'কাকুবক্রোক্তি'-নামক শব্দালঙ্কারটির প্রবর্ত্তয়িতা রুদ্রট। 'শ্লেষ' অলঙ্কারকে 'শব্দশ্লেষ' এবং

'অর্থশ্লেষ'রূপে দুভাগে ভাগ ইনিই করেন। রুদ্রট সর্ব্বপ্রকার অর্থালঙ্কারকে বিন্যস্ত করেন **চারটি** শ্রেণীতে—'বাস্তব', 'ঔপম্য', 'অতিশয়' আর 'অর্থশ্লেষ'; এদের অলঙ্কারসংখ্যা যথাক্রমে ২৩, ২১, ১২, ১০। ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায় (১।১৩) অভিনবগুপ্ত রুদ্রটের 'ভাব' অলঙ্কারের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ দুটিই উদ্ধৃত করেছেন।

রসতত্ত্বের বিশদ আলোচনা রুদ্রটই বোধ করি প্রথম করলেন। "শব্দার্থৌ কাব্যম্" (২।১) তাঁর কাব্যসংজ্ঞা। এর থেকে কেউ কেউ মনে করেন রস রুদ্রটের কাছে গৌণমাত্র। এ ধারণা ঠিক নয়। গ্রন্থের প্রথমেই তিনি বলেছেন ভাস্বর ও নির্ম্মল যাঁর বাক্‌প্রবাহ সেই মহাকবি **সরস কাব্য** রচনা ক'রে শাশ্বত খ্যাতি লাভ করেন ("জ্বলদুজ্জ্বলবাক্‌প্রসরঃ সরসং কুর্ব্বন্ মহাকবিঃ কাব্যম্। ...আকল্পমনল্পং প্রতনোতি যশঃ...॥" ১।৪)। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ চারটি অধ্যায়ে রসের আলোচনা। এর আরম্ভেই তিনি বলেছেন, রসিক পাঠক নীরস শাস্ত্রকে ভয় করেন, তাই পরম যত্নে রসযোগে কাব্যরচনা করতে হবে (১২।১, ২)। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের সমাপ্তিশ্লোক—এই যে-সব রসের কথা বলা হ'ল, তাদের যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ ক'রে কবি সুন্দরভাবে কাব্য রচনা করলে, এই রস রসিক পুরুষকে আনন্দ দান করবে—

("এতে রসা রসবতো রময়ন্তি পুংসঃ
সম্যগ্ বিভজ্য রচিতাশ্চতুরেণ চারু।")

মহাকাব্য থেকে 'লঘু'কাব্য পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কাব্যেই যথাযোগ্য রসযোগ অবশ্য কর্ত্তব্য। **'লঘু'কাব্য** মানে একটিমাত্র শ্লোকের 'মুক্তক', দুই শ্লোকের 'সন্দানিতক', তিনের 'বিশেষক', চারের 'কলাপক', পাঁচ থেকে চৌদ্দ পর্য্যন্ত শ্লোকের 'কুলক' হ'তে 'মেঘদূত'-এর মতন খণ্ডকাব্য পর্য্যন্ত হালকা কাব্য।

রুদ্রট প্রেয়ান্ নামে যে দশম রসটির প্রবর্ত্তন করেছেন, আমাদের বৈষ্ণব 'সখ্য' রসের সঙ্গে তার পার্থক্য নাই। সকল রসেরই আলোচনা তিনি করেছেন, কিন্তু শৃঙ্গারকেই দিয়েছেন শীর্ষাসন (কারণ, শৃঙ্গারই নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত—"সকলমিদমনেন ব্যাপ্তম্", ১৪।৩৮)। ধ্বনিকারও তাই করেছেন; অভিনবগুপ্তের শৃঙ্গারপ্রশস্তি যেমন উচ্ছ্বসিত তেমনি কাব্যময়। রুদ্রটের 'কাব্যালঙ্কার'-এ চারটি রসাধ্যায়ের (১২—১৫) মধ্যে তিনটির বিষয়বস্তু শৃঙ্গার। তাঁর আলোচিত বিষয় সংক্ষেপে এই: শৃঙ্গারের দুই ভেদ—**সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ।** বিপ্রলম্ভ চাররকম—**প্রথম অনুরাগ** (পূর্ব্বরাগ), **মান, প্রবাস, করুণ।** তিনরকম **মান—সুখসাধ্য, দুঃখসাধ্য, অসাধ্য।** মানের অন্যতম

কারণ **গোত্রস্খলন**। **প্রবাস** তিনরকম—'**যাস্যতি**', '**যাতি**', '**গত**' (যথাক্রমে বৈষ্ণবের **ভাবী, ভবন্, ভূত**)। পূর্ব্বরাগের **দশ দশা**—অভিলাষ, চিন্তা, স্মরণ, গুণসংকীর্ত্তন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, মরণ। **অভিসার** তিন-রকম—**বর্ষাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার**। ইত্যাদি। রস-ব্যাখ্যায় রুদ্রট অধ্বনিবাদী ভরতপন্থী। শৃঙ্গার ইত্যাদিকে যে **রস** বলা হয় তার কারণ আস্বাদনই ('রসন') এদের সর্ব্বস্ব—"রসনাৎ রসত্বম্ এতেষাম্" (১২।৪)।

রাজশেখর—৮৮০ থেকে ৯২০ খৃষ্টাব্দ :

প্রসিদ্ধ প্রাকৃত নাটক 'কর্পূরমঞ্জরী', সংস্কৃত নাটক 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা', 'বালরামায়ণ' প্রভৃতি প্রণেতা কবিরাজ রাজশেখর। গুর্জরপ্রতীহারবংশীয় রাজা মহেন্দ্রপালের (৮৯০—৯০৮ খৃঃ) তিনি ছিলেন আচার্য্য এবং সভাকবি। মহেন্দ্রপুত্র মহীপালের অভিষেকের (৯১০ খৃঃ) পর প্রথম কয়েক বৎসর তাঁরও সভাকবি ছিলেন রাজশেখর। তাঁর বিপুল মনীষার অন্যতম উৎকৃষ্ট দান সাহিত্য-তত্ত্বের বিচারগ্রন্থ '**কাব্যমীমাংসা**'। গ্রন্থখানি আঠারোটি অধিকরণে বিভক্ত। এদের মধ্যে 'কবিরহস্য'-নামক ভূমিকা-অধিকরণটি মাত্র আবিষ্কৃত এবং মুদ্রিত হয়েছে। 'কবিরহস্য' প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গ্রন্থের সূচী ; কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিচায়ন এই অংশে এত বিশদভাবে করা হয়েছে যে এইটিই একখানি পূর্ণ গ্রন্থের মর্য্যাদা লাভ করেছে। 'কবিরহস্য'ও আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

রাজশেখর কাব্যতত্ত্বে রসবাদী এবং এ বিষয়ে রুদ্রটের মতন ভরতপন্থী। আনন্দবর্দ্ধনের দুইএকটি মত উদ্ধৃত (যেমন, 'প্রতিভাব্যুৎপত্ত্যোঃ প্রতিভা শ্রেয়সী ইতি আনন্দঃ'—পঞ্চম অধ্যায়) করলেও কাব্যে ধ্বন্যাত্মবাদ রাজশেখর স্বীকার করেন নাই। তাঁর মতে রীতি তিনটি—বৈদর্ভী, গৌড়ী আর পাঞ্চালী। কতকটা বায়ুপুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির অনুসরণে এবং অনেকখানি স্বকীয় কল্পনার যোগে রাজশেখর কাব্যের জন্ম, বিকাশ প্রভৃতির এক সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন। সরস্বতীতনয় 'কাব্যপুরুষ' ; 'সাহিত্যবিদ্যা' তাঁর বধূ। শব্দার্থ কাব্যপুরুষের শরীর, সংস্কৃত মুখ, প্রাকৃত বাহু…, সমতা-প্রসাদ-মাধুর্য্য-উদারতা-ওজস্বিতা তাঁর গুণ,…রস আত্মা, অনুপ্রাস-উপমাদি অলঙ্কার। "গুণবৎ অলঙ্কৃতং বাক্যং কাব্যম্"—এই হ'ল রাজশেখরের স্থূল কাব্যসংজ্ঞা। দশম অধ্যায়ে 'কবিচর্য্যা' অংশে তিনি কবির জীবনযাত্রা, পেয়, আহার্য্য, ভোগবিলাস, ভবন, উদ্যানবাটিকা, ছয় ঋতুতে বাসের উপযোগী ছয়ভাবের ঘর, দীঘি পুষ্করিণী, সারসচক্রবাককলহংস চকোর ক্রৌঞ্চকুররী, শুকশারী, ময়ূর হরিণ,

স্নানের ধারাযন্ত্র, পরিচারক-পরিচারিকা এবং কবিবর্ণিত কাব্যের অনুলেখক প্রভৃতির পোষাকপরিচ্ছদ শিক্ষা ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার কাছে পরিম্লান হ'য়ে যায় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। বস্তুতঃ এইভাবেই জীবন যাপন করতেন কবিরাজ রাজশেখর। বিদ্যায় মনীষায় বৈদগ্ধ্যে কবি-প্রতিভায় মহীয়সী অবন্তীসুন্দরীর বহু মতামত উদ্ধৃত করেছেন রাজশেখর— এই অসামান্যা নারী ছিলেন রাজশেখরের "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"। রাজশেখর তাঁর এই গ্রন্থে একটি মূল্যবান্ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করেছেন। বিষয়টি হ'ল সাহিত্যক্ষেত্রে চৌর্য্য (plagiarism)। পরের ভাবভাষা চুরি ক'রে তাদের নিজের ব'লে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সকল দেশেই আছে ; বর্ত্তমান শতাব্দীতে আরো বেড়ে গেছে।

দশম শতাব্দী (৯৩০—৯৮০ খৃঃ) ঃ

এই যুগের কাব্যশাস্ত্ররচয়িতা **মুকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, ধনঞ্জয়, ধনিক, ভট্টতৌত।**

মুকুল ইন্দুরাজের গুরু এবং 'অভিধাবৃত্তিমাতৃকা'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। আনন্দবর্দ্ধনের কিঞ্চিৎ পরকালীন এবং কাশ্মীরবাসী হ'য়েও মুকুল ধ্বনিবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

মুকুলশিষ্য **ইন্দুরাজ অভিনবগুপ্তের সাহিত্যগুরু।** ইন্দুরাজের কাব্যতত্ত্বসম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোনো গ্রন্থ নাই। উদ্ভটের 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহে'র 'লঘুবৃত্তি'-রচয়িতা ইন্দুরাজ। এই বৃত্তিতে প্রসঙ্গক্রমে ইনি স্বকীয় মতের বহু আভাস দিয়েছেন এবং বৃত্তির শেষভাগে কাব্যতত্ত্বসম্পর্কে আপন দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ পরিচয় দান করেছেন। ইন্দুরাজ ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা ব'লে স্বীকার করেন নাই। ধ্বনিসম্পর্কে একটি পূর্ব্বপক্ষ কল্পনা ক'রে তার উত্তরে জানিয়েছেন স্বকীয় অভিমত। **পূর্ব্বপক্ষ ঃ** কোনো কোনো সহৃদয় কাব্যের প্রাণস্বরূপ 'ধ্বনি'-নামক কাব্যধর্ম্মের কথা বলেছেন, এখানে তার সম্বন্ধে কোনো উপদেশ দেওয়া হ'ল না কেন? ("কাব্যজীবিতভূতঃ কৈশ্চিৎ সহৃদয়ৈঃ ধ্বনির্নাম কাব্যধর্ম্মঃ অভিহিতঃ, স কস্মাৎ ইহ ন উপদিষ্টঃ ?")। **ইন্দুরাজের উত্তর ঃ** এই সব অলঙ্কারের মধ্যেই যে সে অন্তর্ভাবিত, তাই ("উচ্যতে। এষু এব অলঙ্কারেষু অন্তর্ভাবাৎ")। 'এই সব অলঙ্কার' মানে পর্য্যায়োক্ত, অপ্রস্তুত-প্রশংসা ইত্যাদি ("পর্য্যায়োক্তাদিষু অন্তর্ভাবিতম্")। ইনি কাব্যতত্ত্বে রসবাদী ; কিন্তু কাব্যের শরীর (Form)-সম্পর্কে বামনপন্থী। আচার্য্য বামনের মতকে মেনে নিয়ে ("যৎ অবোচৎ ভট্টবামনঃ") ইনি বলেছেন,

"অলঙ্কারাণাম্ অনিত্যতা। গুণরহিতং হি কাব্যম্ অকাব্যম্ এব ভবতি, ন তু অলঙ্কাররহিতম্"। ইন্দুরাজের কাব্যসংজ্ঞা—"গুণসংস্কৃতশব্দার্থশরীরত্বাৎ সরসম্ এব কাব্যম্"। সহজবোধ্য ব'লে সংস্কৃত উদ্ধৃতিগুলিকে বাঙলায় অনুবাদ করলাম না।

ভট্টনায়ক ধ্বনিবাদের বিরোধিতা করেছেন তাঁর 'হৃদয়দর্পণ'-নামক গ্রন্থে। গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট, কিন্তু এখনও অনাবিষ্কৃত। অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায় এই বই থেকে ভট্টনায়কের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন; কোনো কোনোটির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু অনেকগুলি সর্ব্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছেন। ভট্টনায়ক কাব্যসম্পর্কে রসাত্মবাদী ("**কাব্যে রসয়িতা সর্ব্বো**, ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্" ইত্যাদি)। ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে'র ইনি অন্যতম ভাষ্যকার; রসতত্ত্বে ইনি **ভুক্তিবাদী** (ভুক্তি=ভোগ)। লোচনটীকায় অভিনবগুপ্ত এই মতের সমালোচনা করেছেন; কিন্তু মতটি যে কিয়দংশে ধ্বনিবাদের অনুকূল, তাও দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কৌতূহলী পাঠকপাঠিকা অধ্যাপক শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যের 'সাহিত্যমীমাংসা' পুস্তিকা (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত, আট আনা সংস্করণ) হ'তে ভুক্তিবাদের সুন্দর আলোচনাটি প'ড়ে নিতে পারেন। পুস্তিকাখানিতে রসতত্ত্বে ভট্টলোল্লটের 'উৎপত্তিবাদ', ভট্ট-শঙ্কুকের 'অনুমিতিবাদ', ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ' এবং অভিনবগুপ্তের 'অভিব্যক্তিবাদ' অল্প পরিসরে সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে।

ধনঞ্জয়-রচিত গ্রন্থ 'দশরূপক'। এই গ্রন্থের বৃত্তিকার **ধনিক**, বৃত্তির নাম 'অবলোক'। দুটিরই রচনাকাল দশম শতাব্দীর শেষ পাদ। মুঞ্জ তখন মালবা-ধিপতি; ধনঞ্জয় ছিলেন তাঁর সভাসদ্। ধনঞ্জয় এবং ধনিক সহোদর ভাই, পিতার নাম বিষ্ণু। (মনে হয়, ধনঞ্জয় আর ধনিক একই ব্যক্তি—ধনঞ্জয় মূলগ্রন্থ রচনা ক'রে, ধনিক ছদ্মনামে তার বৃত্তি লেখেন।) **'দশরূপক'** নাট্যশাস্ত্র; কিন্তু রস-পরিচ্ছেদে ('চতুর্থ প্রকাশ') গ্রন্থকার আদ্যন্ত দৃষ্টি রেখেছেন কাব্য আর নাট্য দুয়েরই উপর। কাব্যতত্ত্বে এঁরা ব্যঞ্জনাবাদ স্বীকার করেন না। ধনঞ্জয় বলেন—কাব্যের অলৌকিক বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিকভাব সঞ্চারিভাব সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যের দ্বারা সহৃদয় পাঠকচিত্তের স্থায়ীকে আপন ভাবে ভাবিত ক'রে আস্বাদযোগ্য ক'রে তোলে; পাঠককর্ত্তৃক আস্বাদ্যমান এই স্থায়ী ভাবই রস। ধনিক বলেন,—**'তাৎপর্য্য'ই** সব, এর অতিরিক্ত **'ধ্বনি' ব'লে কিছু নাই**। 'কাব্যনির্ণয়' নামে ধনিকরচিত একখানি গ্রন্থ আছে; সেখানে ধ্বনিবাদকে ইনি তন্ন তন্ন ক'রে বিচার এবং খণ্ডন করেছেন।

'দশরূপকে'র 'অবলোকে' 'কাব্যনির্ণয়' হ'তে অনেক অংশ ধনিক উদ্ধৃত করেছেন। ইনি সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়েছেন—"ন রসাদীনাং কাব্যেন সহ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবঃ। কাব্যং হি ভাবকম্, ভাব্যা রসাদয়ঃ"। ভট্টনায়কের সঙ্গে এঁদের চিন্তার কিঞ্চিৎ মিল আছে। তাৎপর্য্যবাদ অভিনবগুপ্ত খণ্ডন করেছেন ধ্বন্যালোকলোচনে। ধ্বনিরই জয় হয়েছে। তবু বহু প্রণিধানযোগ্য কথা আছে সাবলোক দশরূপকে ; গ্রন্থখানি মূল্যবান্।

ভট্টতৌত অভিনবগুপ্তের অন্যতম উপাধ্যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'কাব্যকৌতুক'। এ গ্রন্থ এখনও অনাবিষ্কৃত। কাব্যের নায়ক, স্বয়ং কবি এবং সহৃদয় পাঠক (কাব্য পড়বার সময়) যে সমান অনুভবসম্পন্ন ভট্টতৌতের এই মতটি অভিনবগুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন 'ধ্বন্যালোকলোচনে' ("যদুক্তম্ অস্মদুপাধ্যায়-ভট্টতৌতেন—'নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবঃ'"—ধ্বন্যালোক ১।৬)।

কুন্তক প্রসিদ্ধ 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি আগে, না অভিনবগুপ্ত আগে নিশ্চিতভাবে তা বলা কঠিন। ভামহ সকল অলঙ্কারকেই এক কথায় বক্রোক্তি বলেছেন এবং অতিশয়োক্তিকে বলেছেন একমাত্র বক্রোক্তি। আনন্দবর্দ্ধন এই মতটি উদ্ধৃত করেছেন ধ্বন্যালোকের বৃত্তিতে। অভিনবগুপ্ত এই বৃত্ত্যংশটির 'লোচন'টীকায় অন্যান্য কথার পরে বলছেন—"অথ সা **কাব্যজীবিতত্বেন**" ইত্যাদি। এই 'কাব্যজীবিত' কথাটি পড়লেই মনে পড়ে কুন্তককে—**'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'** (বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ)। অলঙ্কারও সহৃদয়ের প্রতীতিসাক্ষিক বাগ্‌বৈচিত্রী, কুন্তকের 'বক্রোক্তি'ও তাঁরই ভাষায় 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি'। অভিনবগুপ্তের কথাটির ইঙ্গিত কুন্তকের উক্তির প্রতি কি না কে জানে? কুন্তকের মতে—সবরকম অলঙ্কার বক্রোক্তির অন্তর্ভূত ; রস কাব্যের আত্মা নয়, কাব্যাত্মা বক্রোক্তিকেই অধিকতর উপভোগ্য ক'রে তোলে রস ; কাব্যের প্রতীয়মান অর্থ (ধ্বন্যালোকের 'ধ্বনি') কাব্যের আত্মা হ'তে পারে না, আত্মা বক্রোক্তি এবং প্রতীয়মান অর্থ বহুবিচিত্র বক্রোক্তিরই একটি বিচিত্র অঙ্গমাত্র। রীতিকে কুন্তক নূতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—কবির স্বভাবে রীতির জন্ম, তাই নামরূপের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে একে বাঁধা যায় না। কুন্তকের মত নানা কারণে মূল্যবান্। ইনিও কাশ্মীরী।

অভিনবগুপ্ত (দশম শতকের শেষ বিংশক—একাদশের প্রথম বিংশক) ঃ

কাব্যে রসধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল ধ্বনিগ্রন্থ-রচয়িতার একমাত্র উদ্দেশ্য। আনন্দবর্দ্ধন তাঁর 'আলোক'-এর সাহায্যে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার

প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু সিদ্ধি লাভ করতে পারেন নাই। রসধ্বনিবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতীক্ষা করছিল এক মহামনীষার, এক অসামান্য প্রতিভার। সেই মনীষা, সেই প্রতিভা আচার্য্য অভিনবগুপ্ত। প্রাচীন ভারতীয় কাব্যচিন্তা-লোকের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক ইনি। প্রথম জীবনে গুরুগৃহে ইনি ছিলেন "বালবলভীভুজঙ্গ"; উত্তরকালে ধ্বন্যালোকের 'লোচন'-রচনার সমাপ্তিতে ইনি বলেছেন—মীমাংসান্যায়ব্যাকরণতত্ত্বজ্ঞদের গুরু আমি প্রবন্ধসেবারস অভিনবগুপ্ত ধ্বনিতত্ত্বরচনা শেষ করলাম

("বাক্যপ্রমাণপদবেদিগুরুঃ প্রবন্ধ-
সেবারসো ব্যরচয়দ্ ধ্বনিবস্তুবৃত্তিম্ ॥"

সার্থক অহংকার—বাল্মীকির মতন, জয়দেবের মতন, রবীন্দ্রনাথের মতন!

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য অভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী'। রসতত্ত্বে ইনি 'অভিব্যক্তি'বাদী। বিভাব অনুভাব ব্যভিচারীর ব্যঞ্জনায় ক্ষণকালের জন্য নির্ম্মলীকৃত 'চিৎ'-এ অভিব্যক্ত সহৃদয় পাঠকের স্বানন্দই রস—এই হ'ল অভিব্যক্তিবাদের স্থূল এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ধ্বন্যালোক-'লোচনে' রসকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন অভিনবগুপ্ত। আগে 'অভিনবভারতী', পরে 'লোচন'। মূল ধ্বনি-কারিকায় কিছু কিছু ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কিছু সংশোধন করেছেন মনীষী আনন্দবর্দ্ধন; বাকীটুকু যথাসম্ভব সেরে নিয়েছেন অভিনবগুপ্ত। আবার আনন্দবর্দ্ধনও মাঝে মাঝে অজ্ঞাতসারে যেটুকু অসামঞ্জস্য ঘটিয়ে ফেলেছিলেন, অসামান্য প্রজ্ঞাবান্ অভিনবগুপ্ত সাধ্যমতো তারও সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।

আনন্দবর্দ্ধনের 'আলোক'-রচনার একশো বছর পরে রচিত অভিনবগুপ্তের 'লোচন'। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে, ভারতের অন্যত্র তো দূরের কথা, 'ধ্বনির' জন্মভূমি কাশ্মীরেই কাব্যে ধ্বন্যাত্মবাদ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। ধ্বনিবাদের জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করলেন অভিনবগুপ্ত। এ জয় অবশ্য সর্ব্বাঙ্গীণও নয়, সর্ব্বভারতীয়ও নয়, তবু বহুব্যাপক। ধ্বনির এই নবীন যাত্রাপথে প্রথম বাধা সৃষ্টি করলেন কাশ্মীরেরই একজন আচার্য্য, নাম মহিমভট্ট।

মহিমভট্ট :

মহিমভট্ট মধ্য-একাদশ শতকে রচনা করলেন 'ব্যক্তিবিবেক'। রসতত্ত্বে অনুমিতিবাদী ('নাট্যশাস্ত্র'-ব্যাখ্যাকার) কাশ্মীরবাসী প্রাচীন আচার্য্য শ্রীশঙ্কুকের পদাঙ্ক-অনুসরণে তিনি ধরলেন ন্যায়দর্শনের পথ। গ্রন্থারম্ভেই 'পরা বাক্'-কে প্রণাম ক'রে মহিমভট্ট জানিয়ে দিলেন—সকলরকম 'ধ্বনি'-ই

যে অনুমানের অন্তর্ভূত এই তত্ত্বটাই প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে লিখছেন তিনি 'ব্যক্তিবিবেক' ("অনুমানেঽন্তর্ভাবং সর্ব্বস্যৈব ধ্বনেঃ প্রকাশয়িতুম্। ব্যক্তি-বিবেকং কুরুতে প্রণম্য মহিমা পরাং বাচম্॥"—ব্যক্তিবিবেক ১।১)। রসকেই মহিমভট্ট কাব্যাত্মা বলেছেন ; রস তাঁর মতে ব্যঙ্গ্য নয়, সাধ্য অর্থাৎ অনুমেয়। ধ্বন্যালোকের তিনরকম 'প্রতীয়মান অর্থ' অর্থাৎ বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি এবং রসধ্বনি মহিমভট্ট স্বীকার করেন ; স্বীকার করেন না শব্দের ব্যঞ্জনাব্যাপার। তাঁর মতে শব্দের ব্যঙ্গ্য অর্থ ব'লে কিছু নাই, আছে শুধু বাচ্য আর অনুমেয় অর্থ। 'ব্যক্তি' মানে 'প্রকাশ'। কাব্যে বিভাব অনুভাব প্রভৃতি বাচ্যরূপে অনুমানব্যাপারের সাহায্যে অনুমেয়রূপে রসাদিকে ব্যক্ত করে—এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে ব'লে তাঁর গ্রন্থের নাম 'ব্যক্তিবিবেক'। কুন্তকের 'বক্রোক্তি'রও স্বতন্ত্র মহিমা ভট্টমহিমা স্বীকার করেন না ; বলেন, বক্রোক্তি অনুমানে অন্তর্ভাবিত।

ক্ষেমেন্দ্র, ভোজরাজ, মম্মটভট্ট, রুদ্রভট্ট :
(একাদশ শতকের উত্তরার্দ্ধ থেকে দ্বাদশের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত)

কাব্যতত্ত্বসম্পর্কে কাশ্মীরবাসী 'ব্যাসদাস' **ক্ষেমেন্দ্রের** দুখানি প্রধান গ্রন্থ 'কবিকণ্ঠাভরণ' আর 'ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা'। অনেক গ্রন্থের শেষে ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীররাজ অনন্তদেবের গুণকীর্ত্তন করেছেন ("শ্রীমদনন্তরাজনৃপতেঃ কালে কিলায়ং কৃতঃ"—ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা)। রাজতরঙ্গিণীর মতে অনন্তদেবের রাজত্বকাল ১০২৮—১০৮০ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে তাঁর গ্রন্থগুলি রচিত হয়। ক্ষেমেন্দ্র ধ্বন্যালোক থেকে কারিকা উদ্ধৃত করেছেন, আনন্দবর্দ্ধনের নাম করেছেন ; কিন্তু কাব্যে ধ্বন্যাত্মবাদ স্বীকার করেন নাই। তিনি সাধারণভাবে রসবাদী। ধ্বন্যালোকের অনুসরণে তিনি 'মাধুর্য্য' 'ওজঃ' আর 'প্রসাদ' এই তিনটির মধ্যেই কাব্যগুণকে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখেন নাই ; ভরতমুনির দশ গুণকেই গ্রহণ করেছেন।

তাঁর মতে কাব্যের আত্মা **ঔচিত্য** (Propriety)—"ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্"। পদ, বাক্য, গুণ, অলঙ্কার, রস সব-কিছুকেই বিচার করতে হবে ঔচিত্যের আলোকে অর্থাৎ দেখতে হবে এরা কবির বক্তব্যের একান্ত অনুকূল, অনুগত, সমুচিতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে কি না ; যদি হ'য়ে থাকে তবেই সে রচনা কাব্য, নচেৎ নয়।

ভোজরাজ বা ভোজদেব মালবাধিপতি এবং ক্ষেমেন্দ্রের সমসাময়িক। কহ্লণ বলেছেন (রাজতরঙ্গিণী, ৭।২৫৯), কাশ্মীররাজ অনন্তদেব আর মালবরাজ

ভোজদেব সমকালীন, দুজনেই দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ, স্বয়ং সূরি এবং কবি-বন্ধু। 'ভোজপ্রবন্ধ' গ্রন্থে বলা হয়েছে—ভোজরাজ পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস তিন দিন রাজত্ব করেছিলেন। ভোজরাজের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'। ভোজ-দেবের মতে কাব্যকে হ'তে হবে (গ্রাম্যতা ইত্যাদি) 'দোষ'হীন, (মাধুর্য্য ইত্যাদি) 'গুণ'যুক্ত, (অনুপ্রাস উপমা ইত্যাদি) অলঙ্কারে মণ্ডিত এবং (শৃঙ্গারাদি) রসের দ্বারা অন্বিত ("নির্দ্দোষং গুণবৎ কাব্যং অলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্। রসান্বিতং কবিঃ কুর্ব্বন্ কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি॥"—সরস্বতীকণ্ঠাভরণ)। ধ্বনিবাদকে ইনি স্বীকার করেন নাই। দণ্ডী, বামন, রুদ্রট প্রভৃতির অলঙ্কার, গুণ, রস-সংক্রান্ত মত প্রয়োজনমতো স্বকীয় মতের দ্বারা পরিশোধিত ক'রে গ্রহণ করেছেন। নানা কারণে 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' মূল্যবান্ গ্রন্থ।

মম্মটভট্ট ধ্বনিবাদীদের একনিষ্ঠ শিষ্য এবং ব্যাখ্যাতা। ধ্বনিবাদের প্রচারে এবং প্রতিষ্ঠাপনে মম্মটকে অভিনবগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত বলা যেতে পারে। ইনিও কাশ্মীরবাসী। মম্মটরচিত গ্রন্থের নাম 'কাব্যপ্রকাশ'। সুকঠিন গ্রন্থ 'কাব্যপ্রকাশ'। গ্রন্থকার 'উদাত্ত' অলঙ্কারের যে উদাহরণটি দিয়েছেন, তাতে ভোজরাজের নাম থাকায় ("ভোজনৃপতেস্তৎ ত্যাগলীলায়িতম্") একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তিনি ভোজরাজের পরবর্ত্তী। আবার দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাশ্মীরবাসী রুয্যক 'কাব্যপ্রকাশসঙ্কেত' নামে কাব্যপ্রকাশের টীকা রচনা করায় বলতে হয় যে মম্মট এর বেশ কিছুদিন আগেই স্বীয় গ্রন্থ শেষ করেছিলেন। সুতরাং কাব্যপ্রকাশের রচনাকাল একাদশ শতকের একেবারে শেষ অথবা (বেশী সম্ভাব্য) দ্বাদশের প্রথম। মম্মটের মতে,—দোষহীন, গুণযুক্ত, কোথাও বা অনলঙ্কার শব্দার্থের (শব্দ+অর্থ) নাম কাব্য: "অদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণৌ অনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি"। অনলঙ্কৃত মানে অলঙ্কার-হীন নয়—মম্মট বলছেন, অলঙ্কার ছাড়া কাব্য হয় না, তবে অলঙ্কার যদি কোথাও অস্ফুট হয় তাতে কাব্যের ক্ষতি হয় না ("সর্ব্বত্র সালঙ্কারৌ, ক্বচিৎ তু স্ফুটালঙ্কারবিরহে অপি ন কাব্যত্বহানিঃ")। ধ্বন্যালোকের অনুসরণে ইনি কাব্যের তিনটি শ্রেণী নির্দ্দেশ করেছেন—ধ্বনিকাব্য, গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য আর চিত্রকাব্য; বাচ্যাতিক্রান্ত ব্যঙ্গ্য অর্থ **ধ্বনি**, বাচ্য-অনতিক্রান্ত গৌণ ব্যঙ্গ্য হ'ল **গুণীভূতব্যঙ্গ্য** আর গুণালঙ্কারযুক্ত অব্যঙ্গ্যের নাম **চিত্র**।

রুদ্রভট্ট একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচনা করেন 'শৃঙ্গারতিলক'। এখানি রসশাস্ত্র। প্রমাণস্বরূপে এর থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন শ্রীরূপগোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে।

রুয্যক, বাগ্‌ভট (১), হেমচন্দ্র—দ্বাদশ শতাব্দী :

রুয্যক প্রথমে রচনা করেন 'কাব্যপ্রকাশ'-এর টীকা, নাম 'কাব্যপ্রকাশ-সঙ্কেত'। তাঁর মৌলিক এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'অলঙ্কারসর্ব্বস্ব'। রুয্যক কাশ্মীর-বাসী এবং ধ্বনিবাদী। কেউ কেউ মনে করেন এই গ্রন্থের লক্ষণ-সূত্রগুলির রচয়িতা রুয্যক এবং এদের বৃত্তি রচনা করেন তাঁর প্রিয় শিষ্য 'শ্রীকণ্ঠচরিত'-নামক কাব্যের কবি মঙ্খুক। সূত্ররচনায় পরোক্ষভাবে 'ধ্বন্যালোক' এবং প্রত্যক্ষভাবে 'কাব্যপ্রকাশ' অনুসৃত হয়েছে। 'অলঙ্কারসর্ব্বস্ব' সর্ব্বাঙ্গীণ কাব্য-শাস্ত্র নয়; এর বিষয়বস্তু শব্দালঙ্কার আর অর্থালঙ্কার। অর্থালঙ্কার এখানে বিচারিত হয়েছে প্রধানতঃ লক্ষণামূলা ব্যঞ্জনার পথে, "স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থে স্বসমর্পণম্"—মম্মটভট্টের এই উক্তির আলোকে। অলঙ্কারের স্বরূপনির্ণয়ে রুয্যকের দৃষ্টি কাব্যমর্ম্মবিদ্ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি। গ্রন্থখানি কঠিন, কিন্তু মূল্যবান্।

বাগ্‌ভট (১)-রচিত 'বাগ্‌ভটালঙ্কার' গতানুগতিক কাব্যশাস্ত্র। ইনি গুণ, রীতি, অলঙ্কারের সঙ্গে রসকেও সাধারণভাবে কাব্যলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ ইনি 'ধ্বনি'-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন।

হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসন' প্রকৃতপক্ষে একখানি সংকলনগ্রন্থ। এটিকে কাব্যশাস্ত্রের অভিধান বলা যেতে পারে। কাব্যসংজ্ঞায় রসকে স্থান না দিলেও ইনি গুণ, অলঙ্কার ইত্যাদির সঙ্গে রসের সম্পর্কের কথা এবং কাব্যের নানানতর 'দোষে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে রস-দোষের কথাও বলেছেন। 'ধ্বনি'ও কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে। 'কাব্যানুশাসনে' উনত্রিশটি অর্থালঙ্কার স্থান পেয়েছে। মৌলিকতার অভাবসত্ত্বেও পূর্ব্বাচার্য্যদের মতসংগ্রহের গ্রন্থ হিসেবে 'কাব্যানুশাসন' মূল্যবান্।

বাগ্‌ভট (২), জয়দেব, বিদ্যাধর, বিদ্যানাথ —ত্রয়োদশ শতাব্দী :

বাগ্‌ভট (২)-রচিত কাব্যশাস্ত্রের নামও 'কাব্যানুশাসন'। ইনি বাষট্টিটি অর্থালঙ্কারের আলোচনা করেছেন।

জয়দেব কৃত কাব্যশাস্ত্রের নাম 'চন্দ্রালোক'; গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর এবং মূল্যবান্। জয়দেব প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, 'প্রসন্নরাঘব'-নামক উৎকৃষ্ট নাটকের নাট্যকার এবং 'পীযূষবর্ষ' জয়দেব নামে পরিচিত। 'প্রসন্নরাঘব' নাটক হ'তে উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে'। 'চন্দ্রালোক'-এর অলঙ্কারাংশ ব্যাখ্যা করেছেন দার্শনিক ও আলঙ্কারিক অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর 'কুবলয়ানন্দকারিকা'-য়।

বিদ্যাধর-রচিত গ্রন্থ 'একাবলী' এবং **বিদ্যানাথের** গ্রন্থ 'প্রতাপরুদ্র-যশোভূষণ'। এঁরা দুজনেই 'বক্রোক্তিজীবিত'বাদবিরোধী এবং ধ্বনিবাদ-সমর্থক। বিদ্যাধরের মতে কাব্যার্থের ভেদহেতু পাঠকের বিচিত্র আত্মানন্দ হ'তেই শৃঙ্গারাদি বিচিত্র স্বাদের উদ্ভব; বলা বাহুল্য, স্বাদ মানে রসাস্বাদ ("স্বাদঃ কাব্যার্থসম্ভেদাৎ আত্মানন্দসমুদ্ভবঃ")। বিদ্যানাথ বলেছেন, কাব্যের দেহ "শব্দার্থৌ" এবং তার জীবিত (প্রাণ) "ব্যঙ্গ্যবৈভবম্"।

সিংহভূপাল, ভানুদত্ত, বিশ্বনাথ কবিরাজ —চতুর্দ্দশ শতাব্দী:

ভানুদত্ত-রচিত 'রসতরঙ্গিণী' আর 'রসমঞ্জরী' এবং **সিংহভূপাল**কৃত 'রসার্ণবসুধাকর' প্রসিদ্ধ রসশাস্ত্র। **ষোড়শ** শতাব্দীর অতুলনীয় বৈষ্ণব রসগ্রন্থ **শ্রীরূপগোস্বামীর** 'উজ্জ্বলনীলমণি' বিশেষ ক'রে 'রসার্ণবসুধাকর'-এর আধারে গঠিত মনস্তত্ত্বসম্মত সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মবিশ্লেষণাত্মক পূর্ণাঙ্গ শৃঙ্গাররসদর্শন। **বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ'** একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। এতে শ্রব্যকাব্য এবং দৃশ্যকাব্য দুয়েরই তাত্ত্বিক আলোচনা আছে। সুদীর্ঘ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটিতে রয়েছে উদাহরণ সহ নাট্যতত্ত্বের বিশদ পরিচিতি। তিনি বলেছেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"; দোষ তার অপকর্ষক এবং উৎকর্ষের হেতু হচ্ছে গুণ রীতি অলঙ্কার। ধ্বনির এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যের তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, ধ্বনিকে উত্তম কাব্য বলেছেন ("বাচ্যাতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে ধ্বনিস্তৎকাব্যমুত্তমম্"); কিন্তু ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা ব'লে স্বীকার করেন নাই। অলঙ্কারসম্বন্ধে তাঁর মত এই যে এরা অত্যন্ত শোভাকর, রসভাবের উপকারী, শব্দার্থের **অস্থির** ধর্ম্ম, নারীদেহের ভূষণের মতন—"শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্ম্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ। রসাদীন্ উপকুর্ব্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদিবৎ॥" সাহিত্যদর্পণে বহু প্রকার-ভেদসহ ছয়টি শব্দ এবং প্রায় সত্তরটি অর্থ-অলঙ্কার আলোচিত হয়েছে।

কবিকর্ণপূর, অপ্পয়দীক্ষিত—ষোড়শ শতাব্দী:

মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ কাঁচড়াপাড়ানিবাসী শিবানন্দসেনের পুত্র পরমানন্দ-সেনই প্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার এবং আলঙ্কারিক **কবিকর্ণপূর**। তাঁর 'অলঙ্কার-কৌস্তুভ' রচিত হয় আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে। কাব্যশাস্ত্রের সাধারণ বিষয়বস্তু, কাব্যের দোষ, গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস অলঙ্কারকৌস্তুভে সবই বিশদ এবং সুন্দরভাবে আলোচিত হ'লেও মূলতঃ এখানি ভক্তিশাস্ত্র। জীবগোস্বামীর 'হরিনামামৃতব্যাকরণ' যেমন একাধারে সংস্কৃতভাষার পূর্ণাঙ্গ

ব্যাকরণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র, 'অলঙ্কারকৌস্তভ'ও তেমনি একাধারে পূর্ণাঙ্গ কাব্যতন্ত্র এবং গৌড়ীয় ভক্তিরসায়ন। কবিকর্ণপূর ধ্বনিবাদী—সাধারণভাবে রূপগোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং বিশেষভাবে জীবগোস্বামী (অমুদ্রিত কাব্যশাস্ত্র 'ভক্তিরসামৃতশেষ'), বলদেব বিদ্যাভূষণ ('কাব্যকৌস্তভ', 'সাহিত্য-মীমাংসা') ধ্বনিবাদী। **অপ্পয়দীক্ষিতের** অলঙ্কারগ্রন্থ 'কুবলয়ানন্দ' আর 'চিত্রমীমাংসা' রচিত হয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রান্তসীমায়। 'কুবলয়ানন্দে'র কথা একটু আগেই বলেছি জয়দেবপ্রসঙ্গে। 'চিত্রমীমাংসা'য় মাত্র কয়েকটি সাদৃশ্য-মূলক অলঙ্কারের বিশিষ্ট আলোচনা রয়েছে। ইনিও ধ্বনিবাদী। কাব্য তিনরকম : ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য আর **চিত্র**। **ব্যঙ্গ্য অর্থ** (i) বাচ্যাতিশয়ী হ'লে **ধ্বনি**, (ii) বাচ্য-অনতিশায়ী অর্থাৎ বাচ্যই প্রধান আর ব্যঙ্গ্য গৌণ হ'লে হয় **গুণীভূতব্যঙ্গ্য** ; (iii) বাচ্য ব্যঙ্গ্যহীন অথচ সুন্দর হ'লে তাকে বলে **চিত্র**। এই 'চিত্র'-দৃষ্টি দিয়ে কয়েকটি সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন অপ্পয়দীক্ষিত ; প্রধানতঃ এই কারণে গ্রন্থের নাম 'চিত্রমীমাংসা'। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি এবং রসধ্বনির দৃষ্টিতেও কোনো কোনো অলঙ্কারকে বিচার করতে হয়েছে। ইনি বৈদান্তিক, প্রসিদ্ধ 'সিদ্ধান্ত-লেশসংগ্রহ', 'ন্যায়মুক্তাবলী' (এবং আরও অনেক দর্শনগ্রন্থের) রচয়িতা ইনি। কাজেই খুব সহজবোধ্য না হওয়াই 'চিত্রমীমাংসা'-র পক্ষে স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে রাখি এই গ্রন্থের কতকগুলি সিদ্ধান্ত যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর 'চিত্রমীমাংসাখণ্ডনম্' গ্রন্থিকাটিতে।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ—সপ্তদশ শতাব্দী :

মদ্রদেশবাসী **জগন্নাথ** যে সম্রাট্ শাজাহানের পুত্র দারাসাকোর সভায় ছিলেন একথা বোঝা যায়, তৎকর্ত্তৃক রচিত দারার যশোবর্ণনাত্মক কাব্য 'জগদাভরণ' হ'তে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল যৌবন তিনি সেখানেই কাটিয়ে-ছিলেন—"দিল্লীবল্লভ-পাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ" (জগন্নাথকৃত 'ভামিনীবিলাস' কাব্যের শেষাংশ)। দারাসাকো জীবিত ছিলেন ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং বলা যায় যে পণ্ডিতরাজের জন্মকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের উপান্তভাগ। জগন্নাথরচিত কাব্যশাস্ত্রের নাম 'রসগঙ্গাধর'। সাহিত্যতন্ত্রাকাশের পরমোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এই 'রসগঙ্গাধর'।

জগন্নাথের কাব্যসংজ্ঞা—**"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"**। 'রমণীয়(তা)' তাঁর ভাষায় "লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচর(তা)"। সেই অর্থই রমণীয়, যা লোকোত্তর অর্থাৎ মাত্র সহৃদয় কবির এবং পাঠকের

স্বানুভবসিদ্ধ আনন্দের জনকস্বরূপ (চমৎকৃতিময়) জ্ঞানের বিষয়ীভূত। 'লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা'-রূপ 'রমণীয়তা'ময় অর্থের (বিষয়ের) প্রতিপাদন সকল সুকুমার কলারই (art) লক্ষ্য। সংজ্ঞাটিকে কাব্যৈকলক্ষ্য করতে জগন্নাথ 'শব্দঃ' পদটিকে প্রয়োগ করেছেন। মনে হয় পণ্ডিতরাজকৃত এই সংজ্ঞাই কাব্যের চরম সংজ্ঞা এবং এর আলোকে আধুনিক কাব্যেরও বিচার চলতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে জগন্নাথ ধ্বনিবাদী; কিন্তু গভীর অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে রসবাদ, ধ্বনিবাদ, বক্রোক্তিবাদ প্রভৃতি সব-কিছুকে আত্মসাৎ ক'রে সর্ব্বাতিক্রান্ত রূপে ভাস্বর হ'য়ে আছে তাঁর এই কাব্যসংজ্ঞাটি।

কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার প্রাক্তন দানগুলিকে নৈয়ায়িকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রে গ্রহণীয়কে গ্রহণ বর্জ্জনীয়কে বর্জ্জন করেছেন তিনি। ভরতমুনিনির্দ্দেশিত কাব্যের দশ গুণ দণ্ডী গ্রহণ করেছেন; বামন তার সঙ্গে দশ অর্থগুণ যুক্ত করেছেন। ভামহ মাধুর্য্য ওজঃ প্রসাদ মাত্র এই তিনটির নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এদের নাম যে গুণ সেকথা বলেন নাই। ধ্বন্যালোকে ভামহই অনুসৃত হয়েছেন। মম্মটও চলেছেন এই পথে। জগন্নাথ শেষোক্ত ত্রয়ীর মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন ক'রে দণ্ডী বামনের মতকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বকীয় দৃষ্টির অভিনব আলোকে বিচার ক'রে —বলেছেন তিনি, 'প্রাচীনেরা শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি, সমাধি "ইতি দশ শব্দগুণান্, দশ এব চ অর্থগুণান্ আমনন্তি"; (আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি) তাঁদেরই দেওয়া নামগুলি নিয়েছি, লক্ষণ কিন্তু (প্রয়োজনমতো) নূতন ক'রে রচনা করেছি ("নামানি পুনঃ তানি এব, লক্ষণং তু ভিন্নম্")'। **'রীতি'ও** জগন্নাথ অস্বীকার করেন নাই। 'গৃহীতপরিপাকা বৈদর্ভী'-র একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, 'বৈদর্ভী রত্তির রীতিনির্ম্মাণে কবিকে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হ'তে হবে, নইলে পরিপাকভঙ্গ হবে'। সব কথার বিশদ আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। মোটের উপর 'রসগঙ্গাধর' অনুপম কাব্যশাস্ত্র।

পূর্ব্বধারা

নির্ঘণ্ট (বর্ণানুক্রমিক)

উত্তরধারা

নির্ঘণ্ট (১) —শব্দার্থ, ধ্বনি :

নির্ঘণ্ট (২) —অলঙ্কারের ইতিকথা :